প্রথম অধ্যায়

সর্বস্ব ঈশ্বরে সমর্পণ দেবত্বের পূর্বাভাস

১

মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউসন। দোতলার পশ্চিমদিকের রাস্তার উপরের ঘর। শ্রীম মেঝেতে পূর্বাস্য বসিয়া আছেন। সম্মুখে ভক্তগণ বসা — বড় জিতেন, যোগেন, ছোট নলিনী, বড় অমূল্য, বড় নলিনী ও তাঁর দাদা, জগবন্ধু, একজন নবাগত ভদ্রলোক প্রভৃতি। দেখিতে দেখিতে মণি, সুধীর, অমৃত ও আর একটি ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের শেষে আসিলেন ডাক্তার ও বিনয়।

আজ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে ভাদ্র ১৩৩০ সাল, শনিবার। এখন রাত্রি আটটা। জগবন্ধু বেদান্ত সোসাইটি হইতে ফিরিয়াছেন কিছুক্ষণ আগে। ইটালীর* যুবক ভক্ত হরেন্দ্রও ইতিমধ্যে আসিয়াছেন। তিনি বি. এন রেলে কাজ করেন। শ্রীম তাহাকে স্নেহ করেন। তাঁহার সহিত শ্রীম-র কথা হইতেছে।

শ্রীম — হ্যাঁ, হরেনবাবু তোমরা শুনেছ কি অনেকে ট্রামের পয়সা ফাঁকি দেয় — ছ’ পয়সা কিম্বা আজ ট্র্যানস্ফার টিকিট করলো, তার অর্ধেকখানা আজ ব্যবহার করলো, বাকীটা আর একদিন।

হরেন — আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি। দেখেছিও করতে। আমি কখনও এরূপ করি নাই।

শ্রীম — এমন লোকও আছে সেধে গিয়ে টিকিট করবে। কনডাক্টর ভীড়ে আসতে পাচ্ছে না। তা গাড়ী থামলে নেমে গিয়ে টিকিট নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিবে। আবার এমনতরও কেউ আছে টিকিট কিছুতেই করতে পারলো না। তারপর পয়সা মনিঅর্ডার করে ট্রাফিক ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিবে।**

---

* কলিকাতার এন্টালী এলাকা   ** শ্রীম নিজেই এরূপ করেছিলেন।

“এই সব লোক যারা ফাঁকি দেয় তারা penny wise pound foolish (কড়ায় কড়া কাহনে কানা)। বুঝতে পারে না ছ’ পয়সার জন্য কত ক্ষতি হচ্ছে। বাইবেলে আছে 'How narrow is the gate , and strait is the way that leadeth to life, and broad is the way, that leadeth to destruction, (St.Matthew 7:14 and 13) ; ধর্মের পথ অতি সূক্ষ্ম — আর নরকের পথ অতি প্রশস্ত।

শ্রীম-র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসবাবু আজ বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি স্কুলের কাজ তদারক করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীমকে ঐ কাজ দেখিতে হইত। আজ শ্রীম-র অবসর। তাই আজ খুবই উন্মুক্ত প্রসন্নভাব।

হরেন্দ্র উঠিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীম বুঝিতে পারিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, “শোন, শোন বেদান্ত সোসাইটির কথা। Questions and answers (প্রশ্নোত্তর) ক্লাস ছিল আজ। এই সব প্রণালী দিয়ে একই জল বের হচ্ছে — ঠাকুরের ভাব। সব শুনতে হয়। (জগবন্ধুর প্রতি) এদিকে আসুন আপনি। আপনার নোট পড়ে শোনান।”

জগবন্ধু পড়িতেছেন। কথোপকথন। প্রশ্নকর্তা সভ্যগণ, উত্তরদাতা স্বামী অভেদানন্দ। ১৫ই সেপ্টেম্বর, বেলা সাড়ে পাঁচটা। সভ্য সংখ্যা পঞ্চাশ।

প্রশ্ন — শঙ্কর বলেছেন সংসার মিথ্যা। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) বলেছেন কাজ কর। সংসার মিথ্যা হলে কাজের দরকার কি?

উত্তর — শঙ্কর কি অর্থে বলেছেন সংসার মিথ্যা সেটা দেখতে হবে প্রথম। তারপর এগুতে হবে। ‘সংসার মিথ্যা’ মানে name and form (নামরূপ) অর্থে মিথ্যা। চেয়ারটা পুড়ে গেল। চেয়ারটা মিথ্যা হয়ে গেল। জাপান ধ্বংস হয়ে গেল। বস্তুতঃ, in reality, কিছু ধ্বংস হলো কি, in matter (পরমাণুরূপে)? তবু নামমাত্রের change (পরিবর্তন) হলো। সত্য অর্থ, যা তিনকালে থাকে — past, present and future (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান); যার change (পরিবর্তন)

নাই। আর মিথ্যা মানে যা বদলায়, যা তিনকালে থাকে না। নাম-রূপই থাকে না। Substance (মূলতত্ত্ব) থাকে, — এটি সত্য।

"স্বামীজী বলেছেন, কাজ কর। মানে, ভগবানের সেবা কর — দরিদ্র নারায়ণের সেবা কর। দরিদ্রের, দুঃখীর সেবা করতে বলেন নাই। 'দরিদ্র' এটা নাম মাত্র। কিন্তু তার ভিতর যিনি আছেন, পরমব্রহ্ম, চলতি কথায় যাকে নারায়ণ বলে, তাঁর সেবা করতে বলেছেন।

'সেবা' অর্থ শুধু খাওয়ান নয় — ভালবাসা। তুমি নিজেকে যতটুকু ভালবাস, তোমার প্রতিবেশীকেও ঠিক ততটুকু ভালবাস। তোমার মধ্যে যিনি আছেন, ঐ দরিদ্রনারায়ণ যাকে বল তার মধ্যেও তিনিই আছেন। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেমন যত্ন কর ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও তেমনি যত্ন কর। এতে চিত্তশুদ্ধি হবে, 'আমার, আমার' কমে যাবে।

"নিষ্কাম কর্মের মানেই ঐ চিত্তশুদ্ধি। এখন একেবারে ভুলে রয়েছ — 'আমার বাড়ি, আমার ছেলে, আমার দেহ' এসব নিয়ে দিনরাত এদের আরাম খুঁজছো। আরে বাবা, শরীরটা তোর কিসের? এইসব হীনভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই নিষ্কাম কর্ম করা প্রয়োজন।

'মোহমুদ্গারে' শঙ্কর বলেছেন, 'ব্রহ্মপদং ত্বম্ প্রবিশা বিদিত্বা'। তা হলে দেখা যাচ্ছে ইনি যা বলেছেন স্বামীজীও তাই বলেছেন। ব্রহ্মকে পূজা করতে বলেছেন, যে ব্রহ্ম দরিদ্রের ভিতর নারায়ণরূপে রয়েছেন। দুটো কথারই ভাব এক।

"এখন দুটো কথা naturally (স্বভাবতঃ) উঠে — জগৎ মিথ্যা, কিংবা জগৎ সত্য। ভগবানের লীলাটিও সত্য কি না একথা এসে যায়। মিথ্যা কি অর্থে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই যে লীলা তাও সত্য। 'কথামৃতে' আছে ঠাকুর বলছেন, নিত্য ও লীলা দুই-ই সত্য। কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা। কারণ-অবস্থাতে সংসার গুটিয়ে নেন। লীলা অবস্থাতে খেলছেন। দুই-ই Absolute (অখণ্ড)। লীলা হয় কেন? — বললে এই মাত্র বলা যায়, ঠাকুর বলতেন, সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে আবার সাপ চলছে। পূর্বের অবস্থা, কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা —

ব্রহ্মাবস্থা, নিত্যাবস্থা। শেষের অবস্থা সাপ হেলে দুলে চলছে — লীলা। জগৎ সৃষ্টি, ব্রহ্মের manifestation (বিকাশ) কেন চলছে? তার উত্তর, ব্রহ্মের ইচ্ছা। এর বেশী কেউ বলতে পারে না।

"আর 'সংসার মিথ্যা' এটা কার চক্ষে প্রতিভাত হয়? তোমার চক্ষে নয়। তোমার তো জ্ঞানচক্ষু ফোটে নাই। জ্ঞান চক্ষুতে দেখা যায় জগৎ মায়া মরীচিকার মত। এই চক্ষুতে নয়। এ হলো চর্ম চক্ষু। জ্ঞানীদের কপালে একটি চক্ষু হয় আর ভিতরে একটি নাড়ী হয়। তার আলোতে সব দেখতে পান, যাহা যথার্থ। তার উত্তাপ নাই অথচ আভা আছে। দেবতার শরীরের আলোও ঐ অর্থে। উহা spiritual light (আধ্যাত্মিক প্রভা) এই physical sun-এর (ভৌতিক সূর্যের) light (আলো) নয়।

"তুমি ভাব, তুমি সূর্যেতে রয়েছ। আর সেখান থেকে পৃথিবী দেখছো। তখন সব আলো দেখবে। তেমনি ভিতরে জ্ঞানবাতি জ্বললে, সত্য যাহা কেবল তাহাই দেখতে পায়। অন্য কিছু দেখা যায় না।

"সংসারকে কেমন দেখছ জান? ঠিক মরুভূমিতে মরীচিকা যেমন। উহার অনুসরণ করে পথিক বিপদে পড়ে। সংসারের পিছনে গেলেও বিপদে পড়তে হয়।

"একটা vapour (বাষ্প) উঠে পৃথিবী থেকে। তাতে পড়ে সূর্যের আলো। এর উপর দূরের বৃক্ষ, জলাদি এসে reflected (প্রতিবিম্বিত) হয়। তখন মনে হয় ওখানে জল আছে, বাগান আছে। এর অনুসরণ করতে গিয়ে প্রাণ হারায়।

"সংসারও এইরূপ। মায়ার খেলাতে এই সব হয়েছে — স্ত্রী পুত্র পরিজন, সংসার। সত্যবস্তু এক ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে ছেড়ে যে শুধু সংসারকে সত্য বলে ধরে তারই বিনাশ হয়।

"আমরা একবার চিল্‌কা হ্রদ দেখতে গিছলুম। সঙ্গে ছিলেন সারদানন্দ আর প্রেমানন্দ। আমাদের মরীচিকার ভ্রম হয়েছিল। বলতে লাগলুম, আহা, কি সুন্দর স্থান, দেখ, দেখ। বস্তুতঃ ওটা ছিল ভ্রমজ্ঞান। তেমনি দেখছ তোমরা এই জগৎকে সত্য।

প্রশ্ন — পাপ পুণ্য কি?

উত্তর — Constructive and destructive forces (সংগঠনমূলক ও বিনাশমূলক শক্তিদ্বয়)। যেমন আলো ও আঁধার। আলোতে এলে আঁধার নাই। বস্তুতঃ পাপপুণ্য কিছু নাই। এসব মনের সৃষ্টি। যতক্ষণ অজ্ঞানে আছ সংসারে, বিষয়ে ডুবে আছ, ততক্ষণ পাপ। উঠে এলে পুণ্য। পাপ মানে অজ্ঞান — মিথ্যা জিনিষকে সত্য বলে নেওয়া। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, সংসারের ভোগ, বাড়ি-ঘর এসবকে সত্য বলে নেওয়াই পাপ। সংসারী লোক ভাবে, 'বেশ আছি, সুখে আছি', কিন্তু বস্তুতঃ তা তো নয়।

প্রশ্ন — কেন ম'শায়, একজন মদ খাচ্ছে তার তো আমোদ, সুখ আছে। একজন সংসারে নিজের ছেলেমেয়েকে উত্তম আহার বস্ত্রাদি সব দিচ্ছে, নিজের শরীরকে বেশ ভাল করে রাখছে, এতেও তো সুখ আছে।

উত্তর — না, এ প্রকৃত সুখ নয়। এ সুখ কতক্ষণ? যতক্ষণ না নূতন আর একটা বিষয়ে মন বসাতে পেরেছে। তারপর আর এ বিষয়ে সুখ থাকবে না। কিন্তু ভগবানের সুখ যা, তার ক্ষয় বা হ্রাস নাই। এক রস। বিষয়ের সুখ এই আছে এই নাই। মদ খেল একজন অমনি মাতলামি আরম্ভ করলো। এতে আর কি সুখ? আর কতক্ষণই বা থাকে? মদ খাওয়াটাই যে দুঃখ। ঈশ্বর হলেন সকল সুখের সাগর। সংসারের যা সুখ, বিষয়সুখ এ হলো এই অনন্ত ঈশ্বরীয় সুখ সাগরের এক কণা সুখ মাত্র। তুমি মিথ্যার পিছনে ঘুরে ঘুরে সুখ লাভ করতে চাও! তাও কি কখনও হয়! পরিণামে সার হবে দুঃখ।

"ঠাকুর একটি বেশ গল্প বলেছিলেন। এক কৃষকের একটি মাত্র ছেলে ছিল। সেটি মারা যায়। কৃষক ছিল জ্ঞানী। সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে জ্ঞান বিচার দিয়ে। তার স্ত্রীর কিন্তু তা সহ্য হচ্ছে না। সে কাঁদছে আছার পিছার খাচ্ছে। স্বামীকে স্থির দেখে বলছে তুমি কি নিষ্ঠুর! একবার একটি ফোঁটা চোখের জলও তোমার পড়লো না, একমাত্র সন্তানের মৃত্যু! আহা কি পাষাণ তোমার হৃদয়! কৃষক তখন বললে, তোমায় একটা কথা বলছি, শোন। কাল রাত্রিতে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম; আমি রাজা হয়েছি আর তুমি হয়েছ

রাণী। আর আমাদের সাতটি ছেলে হয়েছে। পরম সুখে আমরা রয়েছি। ওমা, যেই নিদ্রা ভেঙ্গে গেল দেখছি আমি যেই কৃষক সেই কৃষক! এখন ভাবছি তোমার এক ছেলের জন্য কাঁদবো কি সাতছেলের জন্য কাঁদবো।

"জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরই সত্য, জগৎ মিথ্যা এইরূপে।"

হরেন্দ্র একজন ভক্তের নিকট জানিয়া লইয়া পকেট নোটবুকে বেদান্ত সোসাইটির ঠিকানা লিখিতেছেন। শ্রীম অতিশয় আগ্রহে উহা লক্ষ্য করিতেছেন।

শ্রীম — (স্মিতনয়নে রহস্যচ্ছলে হরেন্দ্রের প্রতি) — ঐ কথাটাও kindly (দয়া করে) লিখে ন্যাও নিচে — 'কাল মঠে যাব'। (কল্পিত বিস্ময়ে বড় জিতেনের প্রতি) হু, অনেক তীর্থ করেছে। সে দিনও (জগবন্ধুকে চোখে দেখাইয়া) এরা জোর করে জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে মঠে নিয়ে গেল। (উচ্চহাস্যে) তা চলে আসতে চায়। তখন এরা জোর করে ধরে রেখে দিলে। (হরেন্দ্রের প্রতি) আচ্ছা, তুমি এসব কথাও লিখবে — প্রশ্নোত্তর ক্লাশের কথা, যা হ'লো, যা শুনলে?

হরেন্দ্র — এতে লিখি নাই। বড় ডায়েরী আছে তাতে লিখবো।

শ্রীম (পুনরায় আরো কল্পিত বিস্ময়ে) — বড় ডায়েরী আছে! দেখলেন জিতেনবাবু, তীর্থ করেছে বলে সব ঠিক।

অন্তেবাসী — কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) সব কথার শেষেই ঠাকুরের কথা দিয়ে উপসংহার করেন। আজও বললেন, নিত্য লীলা দুইই সত্য। যেমন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে আর হেলে দুলে চলে। জ্ঞানী কৃষকের গল্পও ঠাকুরের কথা।

হরেন্দ্র — ঠাকুরের কথার উপর আর কথা নাই। এর appeal (আবেদন) নেই।

শ্রীম (সবিস্ময়ে) — বটে? (ভক্তদের প্রতি) দেখ, কেমন সার বুঝেছে। তীর্থ করেছে কি না তাই ধরতে পেরেছে।

হরেন্দ্র — ঠাকুর কেমন সরল ভাবে সব বলে গেছেন। পাঁচ বছরের শিশুও বুঝতে পারে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — দেখছেন, আসলে সব ঠিক

আছে।

এইবার অন্য প্রসঙ্গ হইতেছে।

বড় অমূল্য — কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বেদান্তের বই লিখেছেন — শঙ্করের মত।

শ্রীম — হাঁ, পণ্ডিতদের কথা ছেড়ে দিন। পণ্ডিতরা যা বলেন তাই আমরা সাধুর মুখে শুনতে চাই। পণ্ডিতদের কথা তো বরাবরই রয়েছে। কিন্তু যিনি তাঁর জন্য সর্বস্ব ছেড়েছেন তাঁর মুখে শুনতে চাই।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — সে দিন ভাগবত থেকে সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য পড়া হয়েছিল। সেটা আবার পড়ুন তো এখন।

ভাগবত। একাদশ স্কন্ধ। ষড়বিংশ অধ্যায়। উর্বশী পুরুরবা সংবাদ।

পাঠক (পড়িতেছেন) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন — যিনি বুদ্ধিমান হইবেন তিনি কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন এবং সাধুসঙ্গ করিতে থাকিবেন। সাধুগণের উপদেশগুণে মনের আসক্তি ছিন্ন হইয়া যায়। যাহারা নিরপেক্ষ, মদ্গতচিত্ত, প্রশান্ত সমদর্শী, মমতা বর্জিত, নিরহংকার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ তাহারা সাধুপদ বাচ্য।

শ্রীম — গুণগুলি আবার পড়ুন, যা থাকলে সাধু হওয়া যায় (ভক্তদের প্রতি) মুখস্থ করুন।

পাঠক — নিরপেক্ষ, মদ্গতচিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাবর্জিত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের নিজের জীবন ও কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এই সবগুলি পূর্ণভাবে তাঁ'তে প্রকাশিত হয়েছিল। বলেছিলেন, যাঁর কাছে বসলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়, ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য এ জ্ঞান হয়, তিনি সাধু। আত্মজ্ঞ পুরুষে এইগুলি পূর্ণ প্রকাশিত হয়। সাধকের ষোল আনা না হলেও চৌদ্দ পনর আনা হয়ে যায় ঠিক ঠিক ব্যাকুল হলে ঈশ্বরের জন্য।

পাঠ চলিতেছে।

পাঠক (পড়িতেছেন) শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন — হে মহাভাগ উদ্ধব, সাধুগণ নিত্য হিতজননী মদীয় কথারই আলোচনা করেন। ঐ সকল

কথা শ্রোতাদিগের কলুষনাশিনী। যাহারা সাদরে সেই সাধু কথা শ্রবণ, গান ও অনুমোদন করেন তাঁহারা মদেক তৎপর ও শ্রদ্ধাবান হইয়া আমারই ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মদ্ভক্তি অনন্ত গুণ ও আনন্দানুভবাত্মক। যে সাধু ঈদৃশ ভক্তিসম্পন্ন তাহার আর কি অবশিষ্ট থাকে?

"ভগবান অগ্নিদেবের উপাসনায় মনুষ্যের যেরূপ শীত-ভয়, ও অন্ধকার দূরীভূত হয় সাধুগণের সেবা করিলেও নিখিল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। জলে নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তিগণের যেমন নৌকাই পরম অবলম্বন, ঘোর সংসারসাগরে উন্মজ্জন-নিমজ্জনশীল জীবগণের পক্ষে ব্রহ্মবাদী সাধুগণ তেমনি পরম আশ্রয়।

"অন্ন যেমন প্রাণীগণের প্রাণ, আমি যেমন দীনগণের শরণ, এবং ধর্ম যেমন মানবের পারলৌকিক ধন, সাধুগণ তেমনি সংসারে পতিত ও ভীত পুরুষের পরিত্রাণকর্তা। সূর্য সম্যক প্রকাশিত হইয়া একটি মাত্র বহিশ্চক্ষু প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণের বহু চক্ষু। তাঁহারা সগুণ নির্গুণ বহুজ্ঞান প্রদান করেন। সাধুগণই দেবতা, তাঁহারাই বান্ধব এবং তাঁহারাই আমি।

শ্রীম — আহা, কি সব অমৃত কথা — সাধুগণই 'আমি'। গীতায়ও এই প্রতিজ্ঞা রয়েছে। 'জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্', (গীতা ৭/১৮); জ্ঞানী আমার আত্মা, আমার স্বজন।

শ্রীম (বড় অমূল্যর প্রতি) — সেই সাধুদের মুখের কথামৃত আমরা শুনতে চাই। নইলে প্রাণ শীতল হবে কি করে? যারা বাজনার বোল হাতে এনেছেন তারাই সাধু।

"পণ্ডিতদের কথায় ঠাকুর বলেছিলেন, 'খড়কুটোর মত মনে হয়।' কিন্তু পণ্ডিত যদি বিবেক বৈরাগ্যবান হতেন তবে খুব মান্য দিতেন। বলেছিলেন,

'কে জানে বাপু তোর গাঁই গুই।
বীরভূমের বামুন মুঁই॥'

'গাঁইগুই' মানে non-essential part (অসার অংশ)। আর 'বীরভূমের বামন মুঁই' মানে আমি জগদম্বার ছেলে। 'মদ্গত-চিত্ত,

মদেক-তৎপর’। পণ্ডিতদের কথা মুখের কথা। সাধুর কথা অন্তরের গাথা॥ তাইতো আমরা রোজ মঠের সাধুদের কথা শুনতে চাই। তবে তো প্রাণ শীতল হয়।

কিছু দিন হইতে শ্রীম মাঝে মাঝে কথামৃত হইতে এক একটি ‘সীন’ পড়িয়া ভক্তদের শুনাইতেছেন। বলেন, ‘চব্বিশ ঘন্টার খোরাক এটি। সর্বদা এটি ধ্যান করতে করতে চিত্ত ঐ রং-এ রঙ্গিয়ে যায়। মনের বদরস বেরিয়ে যায় এই করে। অন্য চিন্তা চাপা পড়ে ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়।” আজ পঞ্চম ‘সীন’ পড়িতেছেন। ‘কথামৃত’ চতুর্থ ভাগ। সপ্তদশ খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর অধরের বাড়িতে বৈঠকখানায় নৃত্য করিতেছেন। সেই অপরূপ নৃত্যের আকর্ষণে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তরাও ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। নৃত্যরত ঠাকুর হঠাৎ সমাধিস্থ — অন্তর্দশা — নির্বাক। ভক্তগণ নৃত্যানন্দে তাঁহাকে পরিক্রমা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের অর্ধবাহ্যদশা চৈতন্যদেবের ন্যায়। তখন সিংহবিক্রমে ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। তখনও নির্বাক। আহা কি প্রাণস্পর্শী সে দৃশ্য! প্রেমে উন্মত্ত। প্রতি অঙ্গ বিন্যাসে পীযূষ প্রেম বর্ষিত হইতেছে।

বাহ্য দশায় আখর দিতেছেন। অধরভবন আজ শ্রীবাসঅঙ্গন। নিম্নে রাজপথে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে সেই দৈবী নৃত্যলীলা দর্শন করিতেছে।

শ্রীম কিছুকাল মৌন হইয়া বসিয়া আছেন। তাহার পর গান গাহিতেছেন। অধরের বৈঠকখানায় যতগুলি গান হইয়াছিল সবগুলি গাহিলেন। ভক্তগণও গাহিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে। ‘আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।’ বার বার এই গানটি গাহিতে গাহিতে বুঝি সকলেই পাগল হইয়া গিয়াছেন কারও বাহ্য হুঁশ নাই — উন্মাদ হইয়া গাহিতেছেন।

রাত্রি দশটা। ভক্তগণ বিদায় লইতেছেন। শ্রীম-র ইচ্ছায় একজন ভক্ত আবৃত্তি করিতেছেন।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো

ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতি কথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতাস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্॥

(আদি শঙ্করাচার্য-কৃত দেব্যাপরাধ ক্ষমাপণস্তোত্র — দুর্গামন্ত্র)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই শুনুন, তাঁর কথা শুনে চললে দুঃখ হরণ হয়। না শুনলে বেড়ে যাবে। সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম মানুষ হয়ে এসেছেন। ভক্তদের দুঃখ হরণের সহজ পথ দেখিয়ে গেছেন। এখনও তাঁর কথা বাজছে 'সাধু সঙ্গ কর, সাধু সেবা কর'। পরমানন্দ লাভের এই পথ। আবার নূতন করে সাধু তৈরী করে গেছেন। সেই সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা।

২

মর্টন স্কুলের দ্বিতল। রাস্তার উপরের ঘরের মেঝেতে শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। পাশে সুধীর ও যোগেন। অন্তেবাসী প্রবেশ করিয়া ধ্যানে যোগদান করিলেন। এখন সন্ধ্যা সোওয়া সাতটা। কিছুক্ষণ ধ্যানের পর শ্রীম গান গাহিতেছেন।

গান। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণ ধারা॥
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কুল কিনারা॥
কখনও বিপথে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমেতে হই সারা॥

গান। আছি মা তারিণী ঋণী তব পায়। ইত্যাদি।

গান। হরি জগতজীবন জগবন্ধু।
শুনেছি পুরাণে কয় পুনর্জন্ম নাহি হয়;
হেরিলে তব মুখইন্দু॥

গান। হরি কাণ্ডারী যেমন এমন কি আর আছে নেয়ে।

পার করেন দীনজনে অভয় চরণ-তরী দিয়ে॥
তরণীর এমনি গুণ নাইকো হাল নাইকো গুণ।
চলে সে আপনি তরী অধম তারণ চরণ পেয়ে॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পৃঃ ৩৯০)

বড় জিতেনের প্রবেশ। পর পর আসিলেন অমৃত, চাটার্জী, শুকলাল ও মণি। শ্রীম-র শরীর আজ অসুস্থ। পিঠে বাতের ব্যথা হইয়াছে। ভক্তগণ একথা সেকথা কহিতেছেন। শ্রীম বুঝি কথার স্রোত ফিরাইবার জন্য ঐ ব্যথা লইয়াই পুনরায় গান ধরিলেন। এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। ডাক্তার, বিনয় ও ছোট নলিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গান। গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড-দলন এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥
মনে করি ডুবে তলিয়ে রই;
গৌরচাঁদের প্রেমকুমীরে গিলেছে গো সই।
এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে
হাত ধরে টেনে তোলায়॥

(কথামৃত ২য় ভাগ/১৬শ খন্ড/ ১ম পরিচ্ছেদ)

গান শেষ হইল। একটু পরে শ্রীম-র ইচ্ছায় ভাগবত পাঠ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ বর্ণন — অন্তেবাসী পড়িতেছেন।

পাঠক পড়িলেন (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) — হে পুরুষবর উদ্ধব... সত্ত্বগুণের বৃত্তি এইগুলি — শম দম তিতিক্ষা বিবেক ও স্বধর্ম নিষ্ঠা, সত্য ও দয়া, পূর্বাপর স্মৃতি আর যথালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ। দান বৈরাগ্য ও আস্তিক্য। অনুচিত কার্যে লজ্জা। সারল্য বিনয় ও আত্মরতি প্রভৃতি।

রজগুণের বৃত্তি এইগুলি — ইচ্ছা, চেষ্টা, দর্প, লব্ধবস্তুতে অসন্তোষ। গর্ব আর ধনাদি কামনায় দেবতার নিকট প্রার্থনা। ভেদবুদ্ধি ও বিষয়ভোগ। মত্ততাপ্রযুক্ত যুদ্ধাভিনিবেশ। স্তুতিপ্রিয়তা ও উপহাস। প্রভাব বিস্তার ও বধচেষ্টা প্রভৃতি।

আর তমোগুণের এইগুলি বৃত্তি — অসহিষ্ণুতা, ব্যয়বিমুখতা আর অশাস্ত্রীয় কথা। হিংসা, প্রার্থনা আর ধর্মধ্বজিতা। শ্রমবিমুখতা,

কলহ ও অনুশোচনা। ভয় দুঃখ দৈন্য তন্দ্রা ও আশা। ভয় আর উদ্যমহীনতা প্রভৃতি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — খুব চমৎকার সব কথা। এগুলি মুখস্থ করে রাখা উচিত। তবে নিজের সঙ্গে মিলান যায়। তখন বোঝা যাবে কোথায় আছি — where do I stand. লম্বা লম্বা কথা বলে যাবে — এর সঙ্গে মিলিয়ে নিলে দেখতে পাবে সব ফাঁকা। লম্বা লম্বা কথা সব মূল্যহীন। হাতে না আনলে সব মিছে।

“এই তিন গুণেই মানুষ বদ্ধ। তমো থেকে রজঃ ভাল। রজঃ থেকে সত্ত্ব ভাল। ভগবান বলছেন, ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে, ‘মৎপরায়ণ’ (গীতা ৯/৩৪) হলে এই গুণত্রয়কে জয় করা যায়। তখন শুদ্ধসত্ত্ব হয়, ত্রিগুণাতীত অবস্থা। উহাই মুক্তি।

বড় জিতেন — পিঠের ব্যথাটা হচ্ছে কেন?

শ্রীম (সহাস্যে) — এ আর কি ব্যথা! Old age-এ, (বার্ধক্যে) এসব হয়। কত বিঘ্ন। কিন্তু তার বাড়া ব্যথাও সামনে আছে।

শুকলাল এক শিশি অয়েল গলথরিয়া আনিয়াছেন। উহা মালিশ করিলে ব্যথা কমে। শ্রীমকে উহা দিলেন। কিছুকাল উহার উপকারিতার কথা চলিতে লাগিল। শ্রীম পুনরায় হাত টানিয়া যেন কথার প্রবাহ পরিবর্তন করিয়া দিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একবার একটা miracle (অদ্ভুত ব্যাপার) হয়েছিল।* সাদা বাড়িতে ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিলাম। একটা বিচ্ছুতে কামড়িয়ে দিল। উঃ সে কি যন্ত্রণা! চোখ জলে জলময়। কতজনে কতকিছু করলে। একজন তামাকপাতা বেঁধে দিলে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। যেন আগুন জ্বলছে সহস্র জিহ্বায়, এমনি যাতনা। প্রাণ যায় যায়। সেই সময় ঠাকুরের রোগক্লিষ্ট মূর্তিটি মনে পড়লো। আমি ইচ্ছা করে মনে করি নাই, কিন্তু কে যেন ভিতর থেকে ঠেলে দিলে — যেমন বায়স্কোপের ছবি হঠাৎ বেরিয়ে আসে তেমনি। কি

*সাদা বাড়ি — শ্রীম-র স্কুল বাড়ির অপরাংশ, অধুনা ৫৪/২নং পঞ্চানন ঘোষ লেন এই গৃহে তিনি উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে সৎ কথা আলোচনা করিতেন। রাত্রে শয়নও করিতেন। (শ্রীম সমীপে- উদ্বোধন কার্যালয় পৃঃ ২৪৯)

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে সেই যমযন্ত্রণা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! যেন কিছু হয় নাই। কি বিচিত্র ঘটনা।

“ক্যানসারের কি দারুণ যন্ত্রণা! ছট্‌ফট্‌ করছেন ঠাকুর। কেঁদে কেঁদে মাকে বলছেন, ‘মা বড় লাগছে। তারপর ভক্তরা বললে, ‘মাকে বলুন সারিয়ে দিতে’, ঐ যন্ত্রণার ভিতরই উত্তর করলেন, ‘না বাপু; সারিয়ে দাও মা, তা আমি বলতে পারবো না।’ বলছেন, ‘মা আমাকে বালকের অবস্থায় রেখেছেন। মা জানেন কিসে ভাল হবে। আমায় তো জ্ঞানীর অবস্থায় রাখেন নাই যে এমন করে (আড়ষ্ট হয়ে) থাকবো। বালক মা ছাড়া থাকতে পারে না। তাই সে কাঁদে কষ্ট হলে। মা সর্বমঙ্গলা।

“এদিকে তো এই যন্ত্রণা। যেই একটু ঈশ্বরীয় কথা হ’ল, কি গান হ’ল অমনি আর সে মুখ নাই। অরুণরাগে রঞ্জিত কমল যেন মুখে ফুটে গেল।’ কে তখন বলবে এঁর ক্যান্‌সার! ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার দেখে অবাক্‌। কি করে হয় এমন অবস্থা — তাঁর সায়েন্সে নাই।

“সুখ দুঃখের পারের অবস্থা কেবল তাঁতেই দেখেছি। এই মাত্র যা পড়া হলো ভাগবত থেকে — ত্রিগুণাতীত অবস্থা। ‘যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।’ (গীতা ৬/২২)।

“সংসারী লোক যাকে সুখ বলে, বিষয় সুখ তা দুঃখের গুপ্ত রূপ, চমকদার রূপ। সংসারে সুখ কোথায়? আজ সুখ কাল দুঃখ। ছিঃ একে সুখ বলে? এর উপরে যে সুখ, একটানা সুখ তা ভগবানের চরণকমলে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ। ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীম (যুবক ভক্তের প্রতি) — একদিন মা’র সঙ্গে ঠাকুর কথা কইছেন। বলছেন মিনতি করে, মা, তুই ইচ্ছাময়ী; তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এতো করে বললুম তোর ভুবনমোহিনী রূপ ওকে একটিবার দেখাতে, যে রূপ দেখলে সব শোক দুঃখ দূর হয় — সংসার-জ্বালা দূর হয়। তা তুই তো দেখাবি না।’

“তাঁকে দেখলে সব ভুল হয়ে যায়। তখন মুহূর্তের বিরহ সহ্য হয় না। আহা, ঠাকুর কি কান্না কেঁদেছিলেন ঐ-রূপ দেখবার জন্য

— যাকে বলে এক ঘটী কান্না। পঞ্চবটীতে কান্না শুনে লোক জমে যেতো। নৌকোর লোক নেমে এসে প্রবোধ দিত। বলত, হ্যাঁ, তোমার হবে, তোমায় দর্শন দিবেন। দর্শনের পর বিরহ অসহ্য হতো, সর্বদা মায়ের কোলে রয়েছেন, যেন শিশু।

চৈতন্যদেবও সর্বদা কাঁদতেন বিরহে। কোন সময় তিলেকের জন্যও বিরহ সহ্য হচ্ছে না। কাঁদছেন আর বলছেন, কৃষ্ণরে, বাবারে তুই কোথায় লুকালি। তাঁর সংসার ভুল হয়ে গিছলো। তাঁকে ভাবতে ভাবতে একেবারে মহাভাব। সে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে একদিন জগন্নাথ মন্দিরের wall-এর (দেওয়ালের) কাছে পড়ে রইলেন। ভক্তরা খুঁজছেন কোথায় গেলেন প্রভু, পাচ্ছে না। আর একবার ঐ মহাভাবে সমুদ্রের জলে ভাসছিলেন। ধীবররা তুলে নিয়ে এলো। জল জমি — সব ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত। আবার কোথায় গেলেন কেউ জানে না। একেবারে অদৃশ্য হলেন। কেউ বলে টোটা গোপীনাথে মিশে গেছেন। কেউ বলে জগন্নাথে। থার্ড থিওরী (তৃতীয় মত) বলে সমুদ্রে ডুবে গেছেন।[১]

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভক্তদের জন্য কত plead (প্রার্থনা) করতেন। রাত দুপুরে বিছানায় বসে বলছেন, “মা অমুককে[২] ডুবাস নে”। একটি ভক্তকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাছে স্ত্রীসঙ্গ হয় তাই এখানে বসে কল টিপছেন।

আর একটি ভক্তের[৩] জন্য বলছেন, “মা এতো করে বলছি তোকে। এ বড় সরল, চুপটি করে বসে থাকে। টেনে নে মা একে।” ভক্তদের কল্যাণের জন্য এতো ভাবনা — যেন বাপ-মার ভাবনা সন্তানদের জন্য। বাপ মা তবুও এ জন্মের ভাবনা করেন। যিনি গুরু তিনি অনন্ত কালের কল্যাণের চিন্তা করেন।

---

১. ‘বৃহৎবঙ্গে’ ডক্টর দীনেশ সেন বলেন, গুণ্ডিচা মন্দিরে রথের সময় বিষজ্বরে দেহত্যাগ করেন। রাজ আদেশে পাণ্ডা ঐ মন্দিরেই সমাহিত করেন গোপনে। বাইরে প্রচার হয় জগন্নাথে মিশে গেছেন।

২. রাখাল মহারাজ।

৩. শ্রীম।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — অসুখের সময় ঠাকুর ভক্তদের জন্য ভাবনা করছেন। চলে গেলে নিরাশ্রয় হবে তাই ভাবনা। একজনকে বলছেন, কোমর বাঁধ। অমন হলে চলবে কেন, শোকে মুহ্যমান?

একদিন নিজে নিজেই বলছেন, "আচ্ছা, অসুখ হ'ল কেন?" আবার নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, "অসুখ হওয়ায় একটা খুব ভাল হ'ল। কে অন্তরঙ্গ, কে আপন, কে পর, সব তার বাছাই হয়ে যাবে"। অন্তরঙ্গরা তো আর ছেড়ে দিতে পারে না অসুখই হউক কি ভালই থাকুক। বাড়ির লোকের অসুখ হলে কে ছেড়ে দেয়? অন্তরঙ্গ যে অসুখ হওয়ায় থাকবে, অন্য লোক সরে পড়বে। অন্য লোক বলে, ইনি নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে পারছেন না, আর অপরকে রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব? এই বলে সরে পড়ে! সকাম ভক্ত কিনা। সংসারের ঐশ্বর্যের জন্য এসেছে।

ঠাকুর বলেছিলেন, "আর একটি ভাল হ'ল অসুখ হওয়ায়। এখানে (আমাকে) হাসপাতাল ডিসপেন্সারীর হাত থেকে বাঁচালে। সিদ্ধাই দেখালে লোক আসতো রোগ সারাতে, মোকদ্দমা জিতাতে।" অনেকেই এই সব ভাব নিয়ে, কামনা নিয়ে আসে কিনা সাধুর কাছে।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — ঠাকুরের অসুখের সময় সব ভক্ত সর্বদা সেবা করতে পারে নাই। তাদের বাড়িতে কত কাজ। মাকে তাই বলছেন, 'মা কি করে ওরা আসে। এদের অতো কাজ। সংসার দেখতে হয়। সময় কই মা!' পাছে ভক্তদের অপরাধ মা ধরেন তাই আগে থেকেই তাদের রক্ষা করছেন। তাদের জন্য নিজে ক্ষমা চাইছেন।

আবার টাকাকড়ি বেশী চাইলে ভক্তরা ভয়ে পাছে না আসে, তাই ভক্তদের শুনিয়ে বলছেন, "এখানে পেলা নাই"। কখনও বলতেন, "আহা, টাকা এদের এতো প্রিয়, তা ওদেরই থাক। আমায় তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।" কিন্তু তাঁর কাছে এলে হাতে করে কিছু নিয়ে আসতে বলতেন। তাও দু' এক পয়সার এলাচ-টেলাচ, অতি সামান্য জিনিষ। তাঁর জন্য কিছু নিয়ে আসা, তাদের কল্যাণ। দেবতা ও সাধুর কাছে গেলে কিছু দিতে হয়। সেটিও বলা হতো। আবার

বেশী বললে না আসে, তাই বলে দিতেন এখানে আসবার সময় একটা হরতকী হলেও হাতে করে নিয়ে আসবে। কেন বলতেন, তাঁর কি দরকার হরতকীর, কিম্বা অন্য জিনিষের? ভক্তদের ওটা নিয়ে আসতে হলে অনেক চিন্তা হবে, ধ্যান হবে ঠাকুরের, ঐ জিনিষের সঙ্গে, তাই বলতেন। এটা একটা নীতি। গুরুকে ভগবানকে সব দিতে হবে কি না শেষ জন্মে। তাই তার অভ্যাস করাচ্ছেন এই সামান্য দ্রব্য নিয়ে। দ্রব্যে কিছু নাই — আছে মনের ভাবনাতে। দেওয়ার ভাবনাটা, সর্বত্যাগের ভাবনাটা, জাগ্রত করে রাখছেন। এটা একটা অতি বড় principle-এর (নীতির) অভ্যাসের জন্য কিছু হাতে করে আনতে বলতেন। বেশী নিয়ে এলে অমনি ধমক্ দিতেন।

যাদের পয়সা নেই তাদের আবার গাড়ী ভাড়ার পয়সা দেওয়াতেন। পয়সাওয়ালা ভক্ত বলরামবাবুটাবুকে বলে দিতেন, ওদের গাড়ী ভাড়া দিতে। বলতেন, হাঁ, তুমি এর গাড়ী ভাড়াটা দিও। কাউকে বলতেন, তুমি গাড়ী ভাড়া করে নরেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। কিংবা কখনও বলতেন, গাড়ী করে তাতে নরেন্দ্রকে বসিয়ে দিবে। তারপর তুমি কাজে চলে যেও। ভক্ত ছাড়া থাকতে পারেন না কি না, তাই তাদের জন্য অতো ব্যাকুল হতেন। কিন্তু চাইতেন না কিছু, কোনও জোর নাই। অজ্ঞানাবস্থায় মানুষ দিতে নারাজ, কেবল নিতে চায়। হদ্দ হয়তো, 'give and take', দাও নাও — অতটা বোঝে মানুষ। এর উপর বোঝে না। শুধু দেওয়া কিছু না নিয়ে — এ হয় যখন মানুষ দেবভাবে উঠে পড়ে। জ্ঞান হলেও সংস্কারের কাজ সংস্কার করে, কিছু দিতে চায় না! নীচের মানুষটা যে পশু। বিচার করে তখন দেয়! এটি দিয়ে মহামায়া সংসার রচনা করেছেন — এই সঞ্চয়ে প্রীতি, কেবল নিয়ে প্রীতি। সর্বস্ব দিবার প্রীতি, সে যখন তাঁর কৃপায় মানুষ দেবতা হয়, তখন হয়।

(সহাস্যে) ঠাকুর মাঝে মাঝে একটা গল্প করতেন। একস্থানে যাত্রা হয়েছিল। সেখান পেলা নাই। তাই লোকে লোকারণ্য। আর একখানেও হচ্ছিল গান। সেখানে পেলা দিতে হতো। তাই সেখানে কেউ নাই, খালি আসর। পশুভাবে মানুষ খালি নেয়, দেবভাবে সর্বস্ব

দেয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একবার পঞ্চবটীতে একজন হঠযোগী এসেছিল। আফিং খায়। রোজ তাঁর দেড় সের না কত দুধ লাগে। রাখালকে বলেছিল, দুধ, আফিং এসবের জন্য টাকা জোগাড় করে দিতে। রাখাল বললে, ভক্তরা এলে বলবো। ভক্তরা যখন এলো হঠযোগীও এসে উপস্থিত, পায়ে খড়ম চটর চটর করে। রাখালকে যেই টাকার কথা জিজ্ঞাসা করলো হঠযোগী, ঠাকুর তক্ষুনি বলতে লাগলেন ভক্তদের — তোমরা কিছু দিবে টিবে একে। একটু পরে আবার বললেন, তোমরা বুঝি দাও না। কই, কেউ তো কিছু বলে না। ভক্তদের উপর press (পীড়ন) না হয়, তাই কি সুন্দরভাবে কথাটি গুছিয়ে বললেন। অল্প কথা, আবার মোলায়েম কথা অথচ কাজের কথা সব।

আর. মিত্র আমাদের পাড়ার লোক প্রয়াগে গিছলেন কুম্ভমেলা দেখতে। ফিরে এসে দক্ষিণেশ্বর গেছেন ঠাকুরকে দর্শন করতে। ঠাকুর বললেন, কেমন দেখলে সব? উনি উত্তর করলেন, 'বেশ, কিন্তু অনেক সাধু পয়সা নেয়।' তৎক্ষণাৎ ঠাকুর প্রতিবাদ করে বললেন, 'তুমি শুধু এটাই দেখলে, পয়সা নেয়! ভাল গুণ কিছু দেখতে পেলে না? আমি বলি, পয়সা না দিলে খায় কি বল?'

শ্রীম এবার মিহিজাম হইতে আসিয়াছেন গরমের সময়। সেখানে আহার নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইত। খুব ঝঞ্ঝাট। তীর্থে থাকিলে এসব হাঙ্গামা করিতে হয় না, এই সব কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তীর্থে থাকলে বেশ। আগুন সর্বদা জ্বলছে, পোহালেই হ'ল। অন্যখানে করে নিতে হয়। বৈদ্যনাথ, পুরী কাছের মধ্যে এসব স্থান ভাল। পুরীতে এর উপরও আর একটা সুবিধা আছে রাঁধতে হয় না। কিনে খাও। প্রসাদ কিনতে পাওয়া যায়। রান্নাবান্না থাকলে সব সময় এতেই চলে যায়। ঈশ্বর চিন্তার সময় কম হয়ে যায়। পুরী থেকে সখীচরণ দুবার ডেকেছেন। উনি জগন্নাথের ম্যানেজার। তা'হলে জগন্নাথই ডেকেছেন।

অবস্থা বিপর্যয়ে যোগেন ও মণি বিষণ্ণ। সামনে ঝুঁকিয়া বসিয়া

আছেন। শ্রীম তাহা দেখিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের তখন অসুখ। কাশীপুরে রয়েছেন। শরীরটা শুকিয়ে ধনুকের মত হয়ে গেছে বেঁকে। হাঁড় কয়খানা মাত্র সার। একটি ভক্ত বিষণ্ণ হয়ে শয্যার পাশে বসে আছে। তাকে দেখে বলছেন, 'এ কি রকম হয়ে বসা? এমন হলে চলবে কেন? কোমরে জোর আন, বিষণ্ণ ভাব পরিত্যাগ কর।'

শ্রীম (যোগেন ও মণির প্রতি) — সংসার যুদ্ধক্ষেত্রে অনবরত যুদ্ধ চলছে। খাপখোলা তরোয়াল হয়ে থাকতে হয়। সর্বদা জাগ্রত সশস্ত্র সৈনিকের মত। কখন কি বিপদ হয়। 'ক্যাম্পেনবেল' (Campenbell) অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তবুও ডুবে গেল। হঠাৎ কোত্থেকে একটা গোলা এসে গেল। তেমনি সংসার, অনেক ছিটাগুলি এসে পড়ে অহরহ। চারদিকে বিপদ। তাই সর্বদা তরোয়াল খোলা রাখতে হয়। মহা যুদ্ধক্ষেত্র সংসার, অলস, অমনোযোগী হলেই ধ্বংস। যোদ্ধার মত কোমর টান করে দাঁড়াও। আর অন্তরে বিশ্বাস, ভগবান সহায়। তাইতো ক্রাইষ্ট বলেছিলেন ঃ

'...In the world ye shall have tribulation : but be of good cheer; I have overcome the world.' (St. John 16 : 33) আমি সংসার জয় করেছি, এই বিশ্বাস করে আমায় ধরে থাক। তবে ভয় নাই। আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত হতে দিতে নাই — 'নাত্মানমবসাদয়েৎ' (গীতা ৬/৫)। অবিরাম যুদ্ধক্ষেত্র সংসার। সর্বদা সশস্ত্র জাগ্রত থাক।

রাত্রি সাড়ে নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা,
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল।
সোমবার। বিশ্বকর্মা পূজা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৎসকে ধরে থাকলে গাভী আপনি আসে

১

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম দোতলার পশ্চিমদিকের বড় ঘরে বসিয়া আছেন মাদুরে পূর্বাস্য। সুধীর, শচী ও জগবন্ধু স্বামী অভেদানন্দজীর বক্তৃতা শুনিয়া ফিরিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, শ্রীম-র পাশে স্বামী সদ্ভাবানন্দ উপবিষ্ট। ইনি বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। যোগেন আর অমৃতও বসিয়া আছেন। শচী প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। একটু পর আসিলেন বড় জিতেন ও বিরিঞ্চি কবিরাজ। তারপর মনোরঞ্জন ও রমণী, আর ডাক্তার কার্তিক বক্সী ও বিনয়। সকলের শেষে প্রবেশ করিলেন এটর্নি বীরেন। স্বামী সদ্ভাবানন্দ শ্রীম-র সঙ্গে বিদ্যাপীঠের পরিচালনা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া মিষ্টিমুখ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমও আহার সারিয়া আসিলেন উপর হইতে। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা। শ্রীম আহার সারিয়া তিনতলা হইতে নামিবার সময় যেন শ্রীশ্রীমায়ের ভাবে পরিপূর্ণ। আসন গ্রহণ করিয়াই ঐ ভাবের কতক বাহিরে প্রকাশ করিতেছেন।

আজ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ, ২রা আশ্বিন ১৩৩০ সাল, বুধবার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি আবেগভরে) — মা চারটে কথা বলেছিলেন। প্রথম, 'পূর্ণকাম যারা তাদের ভক্তি অহৈতুকী।' তাদেরই বলে ঈশ্বরকোটি।

দ্বিতীয়, 'যার আছে মাপো যার নাই জপো।' অর্থাৎ যার দান করিবার শক্তি আছে সে দান করবে। 'মাপো' মানে দেও, দান কর। দান করা মানে পূজা করা, সেবা করা ভগবদ্‌বুদ্ধিতে। সে শক্তি না থাকলে

জপ কর বসে বসে।

তৃতীয়, 'জিনিষ এতো পড়েছে যে উপচে পড়ছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় কৈ?' এর মানে ঈশ্বরীয় কথা এতো শুনেছে যে তবুও কিচ্ছু হচ্ছে না। কেন, প্রকৃতি যে টানছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন এই কথা, 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি' (গীতা ১৮/৫৯)। (বড় জিতেনের প্রতি) ঠাকুর বলতেন, 'জল নিচের দিকে যায়' তার স্বভাবই এই। কিন্তু এও বলেছেন, "সূর্যের টান পড়লে উপরেও যায়।" ঈশ্বরের কৃপা হলে এই দুর্দমনীয় প্রকৃতিও বদলায়।

চতুর্থ, বাহ্যচেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এরূপ অজ্ঞানাবস্থায় মৃত্যু হলে তার কি ফল হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন, মৃত্যুর সময় অজ্ঞান হলে দোষ নাই। যদি অজ্ঞান হবার পূর্বে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে থাকে তা হলেই হলো। উত্তম ফল হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই চারিটি মহাবাক্য আপনারা একটু ধ্যান করুন।

ভক্তগণ ধ্যান করিতেছেন। শ্রীমও ধ্যান করিতেছেন। মিনিট দশেক পর শ্রীম একজন ভক্তকে বলিলেন, "এইবার ভাগবত পাঠ হউক।" একাদশ স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায় পাঠ হইতেছে — ভাগবত ধর্ম।

পাঠক (পড়িলেন) — সর্ব প্রথমে মনকে সর্ব বিষয় হইতে সঙ্গহীন করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে থাকিবে। তাহার পর এইরূপ হইবে।

প্রথম, সর্বভূতে সমুচিত দয়া, মৈত্রী ও নম্রতা, শুচিতা, স্বধর্মসেবা, ক্ষমা ও বৃথা বাক্যালাপে পরাঙ্মুখতা।

দ্বিতীয়, বেদপাঠ, সারল্য, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বে সমভাব, সর্বত্র আত্মদর্শন, ঈশ্বর দৃষ্টি, সর্বত্র সম ব্যবহার, নির্জন বাস, গৃহাদিতে নিরভিমানতা, পবিত্র চীরবসন পরিধান, সর্ববিষয়ে সন্তোষ, ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রান্তরের অনিন্দা।

তৃতীয়, মন বাক্য ও কর্ম সংযম। সত্য নিষ্ঠা, সম ও দম। অদ্ভুতকর্মা শ্রীভগবানের নরলীলায় জন্ম, কর্ম ও গুণসমূহের কীর্তন, শ্রবণ ও চিন্তন। আর ভগবানের উদ্দেশ্যে সর্বকর্মের অনুষ্ঠান।

আর চতুর্থ, যোগাচার, দান, তপস্যা। জপ, সদাচার, স্ত্রীপুত্র-পরিজন, গৃহাদি আর মন প্রাণ সর্বস্ব শ্রীভগবানে নিবেদন। এইসবই ভাগবত ধর্মের ঐশ্বর্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কিন্তু সাধুসঙ্গ সকলের মূল। এটি ধরে থাকলে যা পড়া হলো আপনি প্রকাশ পায়। এই সবই উত্তম জিনিষ — সৎসঙ্গের ঐশ্বর্য। ঠিক ঠিক ভক্তের ভিতর এইগুলি আপনি এসে যায়। যেমন একজনকে আফিং খাইয়ে দিলে আফিংয়ের প্রতিক্রিয়া এসে যায় তেমনি ঠিক ঠিক সৎসঙ্গ হলে, এই সব সৎ গুণাবলী আপনি আসে। এক একটা করে পালন করতে গেলে একজন্মে কিছু হবে না। এ সবই একই জিনিষের বিভূতি — যথার্থ ভগবদ্-ভক্তির। সাধুসঙ্গ ঠিক হলে ভগবানে ভক্তি হয়। তখন সংসারের ভোগের বিভূতি খসে পড়ে যায়। আর ঈশ্বরীয় বিভূতি এই যা শোনা গেল তা এসে যায়।

ঠাকুরের যত উপদেশ আছে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, আদিতে সাধুসঙ্গ, মধ্যে সাধুসঙ্গ আর অন্তে সাধুসঙ্গ। অত মনে থাকবে না বলে, ঠাকুর সহজ করে একালের উপযোগী তিনটি কথায় সব বলে দিয়ে গেছেন। নিত্য সাধুসঙ্গ, নিত্যনিয়মিত ভজন আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস।

একজন ভক্ত — সকলের জন্যই কি এই ভাগবত ধর্মের ব্যবস্থা কিংবা অধিকারী বিশেষের জন্য এর প্রয়োজন।

শ্রীম — সকলের জন্য নয়। যারা জ্ঞানযোগ, রাজযোগ এসব সাধনে অসমর্থ তাদের জন্য এই পথ। কলিকাল কিনা, সকলে এই সব কঠিন পথ নিতে পারে না। তাই সহজ পন্থা। এটি ভক্তিযোগ। যে পথেই যাও গন্তব্যস্থল এক। যার পক্ষে যা সহজ তাই করা উচিত।

নিমি ছিলেন মিথিলার রাজা। তাঁর একটা যজ্ঞে নয়জন সিদ্ধ ঋষি উপস্থিত ছিলেন। ভাগবত ধর্মের স্বরূপ কি আর অধিকারী কে — নিমির এ প্রশ্নের উত্তরে প্রবুদ্ধ ঋষি ঐ সব কথা বলেছিলেন যা শোনা গেল। আর বলেছিলেন, যারা স্থূলবুদ্ধি লোক, মন জয় করতে

অসমর্থ তাদের জন্য এই ভাগবত ধর্মের ব্যবস্থা। এরই সাহায্যে তারা মায়াপাশ ছিন্ন করবে। একে শরণাগতি যোগও বলা হয়। কলিকালে এর প্রয়োজন খুব।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — অপর আটজন ঋষির নাম কি পড়তো?

পাঠক — কবি, হবির, অন্তরীক্ষ (প্রবুদ্ধ), পিপ্পলায়ণ, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন।

শ্রীম — সাধুসঙ্গের অত প্রয়োজন। তাই ঠাকুর, চৈতন্যদেব, গুরু নানক এঁরা সকলেই এর উপর অত জোর দিয়েছেন। কলিতে অন্নগত প্রাণ, আবার আয়ু কম — সময়ও নাই, সামর্থ্যও নাই। তাই শরণাগতিযোগের ব্যবস্থা। শরণাগতিযোগের হৃদয়কেন্দ্র সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা। কত সহজ করে দিয়েছেন পথ। সাধুসঙ্গ ধরে থাক অন্য সব আপনি আসবে। বাছুরকে ধরে রাখলে গাভী আপনি আসবে হাম্বা হাম্বা করে। 'গাভী' মানে ঈশ্বর। তিনি এলে তাঁর সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য সঙ্গে এসে যায়।

২

পরদিন বৃহস্পতিবার। শ্রীম-র শরীর তত ভাল নয়, পিঠে ব্যথা। ছোট জিতেন, যোগেন, জগবন্ধু, শচী, সুধীর, বিনয়, সুরপতি প্রভৃতি বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা। শ্রীম ভক্ত সঙ্গে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন — দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরে। আটটা পর্যন্ত ধ্যান হইল। এবার আসিলেন বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী, ছোট নলিনী ও 'স্বদেশী'। 'স্বদেশী' নূতন আসিতেছেন। মৌখিক রাজনীতিতে উচ্চকণ্ঠ। তাই ভক্তরা তাকে 'স্বদেশী' বলিয়া ডাকেন।

শ্রীম-র শরীর অসুস্থ থাকিলে বেশীর ভাগ সময়ই গান ও পাঠে কাটান হয়। আজও শ্রীম জগবন্ধুকে স্বামী অভেদানন্দজীর ক্লাশের ঈশ্বরীয় কথা শুনাইতে বলিলেন। জগবন্ধু গত কালের রাজযোগ ক্লাশের নোট পড়িয়া শুনাইতেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন ঃ রাজযোগের প্রধান জিনিষ concentration and meditation (একাগ্রতা ও ধ্যান)। মনকে

বাইরের জিনিষ থেকে তুলে নেওয়া চাই। প্রথমে অনেক চেষ্টা করতে হয় যত্ন করে। পরে সুফল ফলে। এইটিন-নাইনটিসিক্সে (1896) আমি লণ্ডনে ছিলাম। স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) আমাকে ওখানে রেখে চলে এলেন। তখন আমি বেদান্ত ক্লাশ নিতাম ভিক্টোরিয়া রোডের একটা বাড়ির তিনতলায়। একদিন বক্তৃতা দিচ্ছি তখন রাস্তা দিয়ে একটা প্যারেড যাচ্ছে ব্রাসব্যাণ্ড বাজিয়ে। খুব বড় রাস্তা আর ভীড়ও তেমনি। আমি কিন্তু কোনও শব্দ শুনতে পাই নাই। মিটিং-এর শেষে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ও-দেশের লোকেরা হ্যাণ্ডশেক করে। আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। রেভারেণ্ড হোয়াস, এ্যাপিস্কোপাল চার্চের বড় মিনিষ্টার। ইনি আমায় বললেন, আপনার বড়ই disturbance (অশান্তি) হল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম কিসের disturbance (অশান্তি)? তারপর তিনি সব কথা বলেন। তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, কৈ আমি তো কোনও কিছুই শুনতে পাই নাই। তখন তিনি উত্তর করলেন, "Then you yourself are an instance of concentration itself. (তাহ'লে আপনি নিজেই একাগ্রতার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত)।

আর একবার এলাহাবাদ রয়েছি, গঙ্গার পাড়ে ঝুপড়িতে। ওখানে সাধুরা গঙ্গার তীর কেটে গুহা বানিয়ে তাতে থাকেন আর তপস্যা করেন। আমিও একটা গুহাতে রয়েছি। ওখানে কোর্ট থেকে তোপ পড়তো। দিনে তোপের শব্দ শুনতে পেতাম। রাত্রে ধ্যানে বসলে আর শুনতে পেতাম না।

"Concentration-এর (একাগ্রতার) বলে ওয়েষ্টে মেসমেরিজম, হিপ্‌নটিজম্, স্পিরিট ইনভোকেশান এ সব হচ্ছে। শ্লেটে স্পিরিটের মিডিয়মকে কাগজে লেখা পাঁচশ প্রশ্নের জবাব দিতে দেখেছি।

ইংলন্ড ও আমেরিকায় মনের study (বিচার) খুব চলছে। একাগ্রতা সব কাজেই অত্যাবশ্যক, এটা তারা বুঝতে পেরেছে। Discovery আর Invention (প্রাকৃতিক কিংবা যান্ত্রিক আবিষ্কার) যা সব হচ্ছে, তাতে কত গভীর concentration-এর (একাগ্রতার) দরকার। একেবারে তন্ময় হতে হয়। যে জিনিষ আবিষ্কার করবে

সেইটের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তবে হয়।

সায়েন্সের সত্যগুলি ঈশ্বরের তুলনায় নিম্নস্তরের সত্য বটে, কিন্তু এও সত্য। এ ছাড়া যায় না। আমরা তাই এখন সব সায়েন্সের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছি। পূর্বে এ সব ছিল না। তখন আমাদের শাস্ত্র দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতেন nature (প্রকৃতি) থেকে — যেমন ঘটাকাশ, পটাকাশ। আমরা নূতন করে বোঝাতে আরম্ভ করেছি সায়েন্সের ভিতর দিয়ে। দোষ কি এতে?

ঈশ্বরকে জানতে হলে সব চাইতে বেশী concentration-এর (একাগ্রতার) দরকার। জাগতিক বিষয় জানার জন্য যদি অত একাগ্রতার দরকার তবে ঈশ্বরকে জানতে হলে যে এর আরো বেশী প্রয়োজন, একথা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধদেব concentration-এর (একাগ্রতার) বলে 'কিছু নাই', 'কিছু নাই' করে করে negative side (নেতির দিকটা) দেখিয়ে nothing-এ (শূন্যে) গিয়ে পৌঁছেছেন। বুদ্ধদেবের তত্ত্বটি তাই নির্বাণ। শঙ্করাচার্য positive side (ইতির দিক) দেখিয়ে চলেছেন। বলছেন, 'ব্রহ্ম সত্য' আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' — I am Brahman বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য একই কথা বলেছেন। ঢং ভিন্ন। বুদ্ধদেব গিয়েছেন বাইরের দিক থেকে আর শঙ্করাচার্য ভিতর দিক দিয়ে। এঁদের বিরোধ নাই — আপাতঃ বিরোধ। তাই এঁদের দুজনকেই মিলিয়ে দিয়েছেন পরমহংসদেব। তিনি বলেছেন, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেযে কিছু থাকে না — 'সর্বং শূন্যং' (বুদ্ধদেব)। আবার বলছেন, যেখানে কিছুই থাকে না সেখানেই তিনি — পরব্রহ্ম (শঙ্করাচার্য)। সেখানে সব শূন্য। জগৎ, চন্দ্র, সূর্য, জীব, তুমি আমি কিছুই নাই সেখানে। কেবল অদ্বিতীয় এক অখণ্ড সত্ত্বা মাত্র থাকে।

স্বামী অভেদানন্দ (সভ্যদের প্রতি) — তোমরা নিজেরা চেষ্টা কর। তোমরাও বড় হতে পারবে। খালি দোহাই দিও না — অমুকে অমুক বলেছেন বলে। চেষ্টা কর ঋষি হতে পারবে। বিবেকানন্দ এই বলেছেন, কপিল, বুদ্ধ এই বলেছেন, একথা বল্লে কি লাভ হবে? নিজের জীবনে দেখাও — যা বলছে তা করে, হাতে এনে। চেষ্টা দ্বারা তোমরাই একদিন কপিল হতে পারবে, শঙ্কর, বুদ্ধ হতে পারবে,

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ হতে পারবে। তবে তাঁদের ছেড়ে যেতে পারবে না। তাঁদের পথেই চল। দেখ আরও কিছু বাড়াতে পার কি না। তাঁদের সঙ্গে বিরোধ করে নয়, মেনে চল, চেষ্টা কর।

Concentration-এর (একাগ্রতার, ধ্যানের) শেষ অবস্থা সমাধি। ঠাকুর সর্বদাই সমাধিস্থ থাকতেন — তন্ময়। এ অবস্থায় কার মনে কি হচ্ছে জানতে পারা যায়। আমরা কাছে রয়েছি। কোনও কথা নাই, জিজ্ঞাসা নাই। কিন্তু আমাদের মনের সব কথা জানতে পারতেন। আর তার উত্তর দিতেন বিনা প্রশ্নে। একদিন তাই জিজ্ঞাসা করলুম, কি করে মনের কথা জানতে পারলেন। তিনি বললেন, 'তোদের চোখ যেন শার্শীর জানালা। ভিতরের সব দেখতে পাই ঐ চোখ দিয়ে।' ঠাকুর ছিলেন highest development of human mind (মনুষ্য মনের সর্বোচ্চ পরিণাম) — তিনি অবতার।

একদিন নৌকো করে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি, ঠাকুর আছেন আর আমরা তিন চারজন ভক্ত রয়েছি। তখন আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। বরানগরের ঘাটে নেবে বাজার থেকে কিছু মুড়ি আর বাতাসা কিনে আনা গেল। আমি নিয়ে এসেছি দেখেই ঠাকুর এই সব চেয়ে নিয়ে খেলেন আর অল্প অল্প করে সব খেয়ে ফেললেন। দেখে আমরা তো অবাক্! 'করছেন কি!' ওমা, এরই ভিতর আমরা অনুভব করছি আমাদের পেটে ক্ষিদে নাই — পরিপূর্ণ পেট আর ঢেকুর উঠছে। কি বুঝবে এ লীলার। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং' (ভাগবত ৪/২/৩৫)। তিনি তুষ্ট হলে সব সন্তুষ্ট। গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত গাছ সেই জল পায়। তিনি খেলে সকলের খাওয়া হলো। তিনি অন্তরাত্মা।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — তুমিও এসব লেকচারের নোট লিখো। এতে মনের খুব উন্নতি হবে। (ভক্তদের প্রতি) ঠাকুরের এক একটি কথা, মন্ত্রস্বরূপ। জপ করলে সিদ্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর প্রায়ই — 'গুরু গঙ্গা গীতা গায়ত্রী', এ মন্ত্রটি আবৃত্তি করতেন। এটি একশ'বার জপ করলে ভিতর বাহির এক হয়ে যায়।

বড় জিতেন — আমাদের ভাগ্নে নারাণ, নব যুবক, বিয়ে করে নাই; রেলে কাজ করে। সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে, সারাদিন ধরে

তা মনে রয়েছে। তিনচার দিন আগে।

শ্রীম — ওকে আমি দেখবো। একবার পাঠিয়ে দিবেন তো। তার জীবনের course (গতি) বদলে দিয়েছে ঐ একটি স্বপ্ন।

একটি ভক্ত মাঝে মাঝে আসেন, মুখে খালি 'স্বদেশী স্বদেশী' করেন। তাই ভক্তরা আমোদ করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছেন 'স্বদেশী'।

তিনি শ্রীম-র সম্মুখে বসিয়া আছেন পায়ের উপর পা তুলিয়া। শ্রীম তাঁকে বলিতেছেন 'এরকম বসতে নাই। প্রতাপ মুজমদারকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'এ কি রকম বসা। এ রজোগুণীর লক্ষণ। যোগাসনে বসতে হয় সর্বদা।' ভক্তদের চালচলন সবই ভিন্ন ধরণের।

এবার শ্রীম গান গাহিতেছেন —

গান। নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।। ইত্যাদি

গান (স্বামী বিবেকানন্দ)

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ অতীত আগামী কালহীন
দেশহীন সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।
যেথা হতে বহে কারণ-ধারা, ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, 'অহমহমিতি' সর্বক্ষণ।।
সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে, অযূত অনঙ্গ তরঙ্গ রাজে;
কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতি-স্থিতি কে করে গণন॥
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক্ জ্যোতিঃ মগন।।
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য, তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ।।

গান। দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে?

জয় করুণাময়, জয় করুণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্মসাধনে।

(কথামৃত-৩য় ভাগ/১৫শ খন্ড/৩য় পরিচ্ছেদ)

শ্রীম কিছুকাল মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া আছেন। তারপর 'কথামৃত' পাঠ করিতে বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-শশধর সংবাদ। প্রথমভাগ, একাদশ খণ্ড। পাঠান্তে পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — পণ্ডিতের উপর কৃপা হয়েছে। তাই নিজে গরজ করে গেলেন দেখা করতে। বললেন যে পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই সে পণ্ডিতই নয়। যে ভগবানের আদেশ পায় নাই তার লেকচারে হবে কি? আর যে আদেশ পায় তার জ্ঞানের শেষ নাই। মা'র একবার কটাক্ষ হলে আর জ্ঞানের অভাব থাকে না। তিনি 'রাশ ঠেলে' দেন জ্ঞানের। বাগ্‌বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণরেখা আসে, তা হলে এমনি শক্তি হয় যে বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

কেমন বললেন, 'আর একটু বল বাড়াও! আর কিছুদিন সাধন ভজন কর'। এটি আসল কথা। এটি বলবার জন্যই তাঁর আগমন। তপস্যা করা দরকার। তপস্যা না করলে অধ্যাত্মপথের কিছুই বোঝা যায় না।

পরদিন ২১শে সেপ্টেম্বর, ৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার। শ্রীম-র শয়ন ঘরে ভক্তগণ উপবিষ্ট, তিনতলার পশ্চিমের ঘর। বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী, মণি, অমৃত, যোগেন, শালিখার ভক্ত, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীম-র সম্মুখে বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা হয় হয়।

মায়ের সেবক স্বামী অরূপানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। সকলে মেঝেতে মাদুরে বসা। অরূপানন্দজীর হাতে একখানা খাতা। শ্রীমকে বলিলেন, 'মায়ের কথা সংকলন হয়েছে, এবার বাহির হবে। তাই আপনাকে একবার শোনাতে এলাম।' পরমানন্দে ভক্তসঙ্গে শ্রীম শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইতেছেন। মুখে কোনও কথা নাই। ছবির মত বসিয়া যেন সকলে মধুপান করিতেছেন। রাত্রি দশটায় আজের মত পাঠ

শেষ হইল। শ্রীম যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিতেছেন, 'রাসবিহারী, তুমি আজ কি অমৃতই পান করালে।'

৩

মর্টন স্কুল। চারতলায় শ্রীম-র ঘর। এখন অপরাহ্ন তিনটা। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিতেছেন, "আজ রামমোহন রায় লাইব্রেরীতে রাঁচির ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের সৎসঙ্গ সভা হবে। একবার দেখে আসুন। সাধুরা আসবেন।"

আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খৃঃ, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার। অন্তেবাসী রাঁচির ব্রহ্মচর্য আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব দেখিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকেশ, পীতবস্ত্র পরিহিত বিদ্যার্থীগণ অধ্যক্ষ সত্যানন্দ গিরি প্রমুখ সাধুগণের সহিত আসিয়াছেন। সৎসঙ্গের আচার্য বৃদ্ধ সাধু যুক্তেশ্বর গিরিজীও উপস্থিত আছেন। কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালী নূতন ছাঁচে গঠন প্রয়োজন। ভারতের অধ্যাত্ম ভিত্তির উপর নবীন শিক্ষা-সৌধ গঠন করিতে হইবে। প্রতীচীর নিকট হইতেও জড় বিজ্ঞানাদি আহরণ করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভিত্তি হইবে অধ্যাত্মজ্ঞানের। লৌকিক জ্ঞান দরকার কেন? অভ্যুদয়ের জন্য। কিন্তু নিশ্রেয়স্ চরম উদ্দেশ্য, মোক্ষ লাভ। ধর্ম অর্থ কাম অভ্যুদয়ের সহায়। তাই জাগতিক জ্ঞান আবশ্যক। এই জ্ঞান স্কুল কলেজে লাভ করিতে হইবে। উদ্দেশ্য রাখিয়া চোখের সম্মুখে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। সভায় এই সব কথার আলোচনা হয়।

এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে। পাশে জোড়া বেঞ্চিতে একজন সাধু বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তা হইতেছে। অন্তেবাসী সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাশে বসিয়া কথোপকথন শুনিতেছেন। চৈতন্যদেবের কথা উঠিল। তাঁহার নামে বহু সম্প্রদায় হইয়াছে। এই সব কথা।

সাধু (শ্রীম-র প্রতি) — ওঁদের (বৈষ্ণবদের) নিষ্ঠাভক্তি। কিন্তু পরমহংসদেব বলেছেন সব পথেই তাঁকে পাওয়া যায়।

শ্রীম — হাঁ। যে সময়ের যা দরকার। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। যখন যা দরকার তিনি করেন। এই যুগের যা দরকার তাই করেছেন পরমহংসদেব। এতে আমাদের হাত দেওয়া চলবে না।

নানা সম্প্রদায় হবেই — sects are inevitable. মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন। তাই ভিন্ন ভিন্ন পথ। তার জন্যই বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি। মানুষ কিছু করে নাই। বাইরের দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় অমুকে অমুক সম্প্রদায় করেছেন। বস্তুত তা নয়। সবের কর্তা ঈশ্বর।

অপরকে দেখে নাকশিঁটকালে চলবে না। আপন আপন পথ দিয়ে সকলে একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাচ্ছে। তুমি তোমার পথ বেছে নাও। তা ধরে চলতে থাক। অপরে অপর পথে চলুক।

এখন সকল মানুষ সকলকে জানতে আরম্ভ করেছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে যাতায়াত বেড়ে গেছে। সকল দেশের খবর সকলে পাচ্ছে। এ সময় স্বতন্ত্র থাকা চলে না। তাই ঠাকুর সকল মানুষের সম্মিলন সাধন করে গেছেন — গোড়ায়, আত্মায়। সকলেই অমৃতের সন্তান — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' এটি নূতন করে জগতে লোকের সামনে ধরে রেখে গেছেন। নরনারায়ণের পূজা তাই তিনি করে গেছেন।

আর বিভিন্ন ধর্মমতগুলির সাধন করে সব পথে একই ঈশ্বরে পৌঁছে, বলেছেন — মত পথ। এক দিকে সর্ব ধর্মের সমন্বয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও সমন্বয় নারায়ণে — এই মহাকার্যটি করে গেছেন পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য।

(সহাস্যে) সাগরে দল (আগাছা) নাই। দল হয় গেড়ে ডোবায়, ঠাকুর বলতেন। দেখুন না, বৈষ্ণব সমাজে কত দল (বিভাগ) হয়েছে এখন। চৈতন্যদেবের সময় দলটল ছিল না — সাগর। পরমহংসদেবের কাছেও দল ছিল না। সকল দলের সম্মিলনভূমি ছিলেন তিনি।

সাধুটি মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার নাম দ্বারকাদাস বাবাজী। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্বে ইনি শ্রীম-র স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।

সাড়ে সাতটায় শ্রীম দোতলায় নামিয়া আসিলেন। আজ ভক্তসভা বসিয়াছে পশ্চিমের বড় ঘরে। ভক্তগণ অনেকে আসিয়াছেন — বড়

জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, অমৃত, ডাক্তার, বিনয়, সুধীর, ছোট নলিনী, যোগেন, জগবন্ধু প্রভৃতি। শ্রীম ভক্তসঙ্গে বসিয়া সৎসঙ্গ সভার বিবরণ সব অন্তেবাসীর নিকট শুনিলেন। অধ্যাত্ম বিদ্যাকে পুরোভাগে রাখিয়া লৌকিক বিদ্যালাভ করিতে হইবে ইত্যাদি। ধ্যানস্থ হইয়া এই সব কথা শুনিতেছেন। শোনা শেষ হইলে কিছুকাল মৌন হইয়া রহিলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, এই সকল কথার সমালোচনা হইবে। কিন্তু শ্রীম তাহা না করিয়া ভক্তগণের মনকে হাতে ধরিয়া যেন নিম্ন বুদ্ধির ভূমি হইতে উঠাইয়া উপরে মহাকারণে লইয়া গেলেন, আদ্যা শক্তিতে, যেখান হইতে জগৎ আসিয়াছে।

বিভোর হইয়া শ্রীম গাহিতেছেন — মায়ের মহিমা।

গান। অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী।
কোলে করে আছ মোরে দিবস রজনী॥
অধম সূতের প্রতি কেন এত স্নেহ প্রীতি,
প্রেমে আহা, একেবারে যেন পাগলিনী॥
কখনও আদর করি' কখনো সবলে ধরি
পিয়াও অমৃত শুনাও মধুর কাহিনী;
নিরবধি অবিচারে কত ভালবাস মোরে,
উদ্ধারিছ বারে বারে পতিতোদ্ধারিণী॥
বুঝেছি এবার সার মা আমার আমি মার
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী;
করি মাতৃস্তন্য পান, হব বীর বলবান্,
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মসনাতনী॥

গান। মা, ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্ব ঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা॥

(কথামৃত ৫ম ভাগ/৫ম খন্ড/৪র্থ পরিচ্ছেদ)

গান শেষ হইয়াছে। শ্রীম এখন কথা কহিবেন না। তাই এরূপ সময় পাঠ হইয়া থাকে। জগবন্ধুকে বেদান্ত সোসাইটির রবিবারের ক্লাশ-নোট পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। উহাই পড়া হইতেছে। বিষয় ঃ কর্মযোগ।

স্বামী অভেদানন্দজী বলিতেছেন — মানুষ কতকগুলি ঋণ নিয়ে জন্মায় — দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ এই সব। হিন্দুরা এই সব ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করে। এগুলি নিত্য আচরণ করতে হয়। ইহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম। কতকগুলি কর্ম আছে সেগুলি স্বাভাবিক — আহার, বিহার, শয়ন ইত্যাদি। কি বিহিত, কি স্বাভাবিক সকল কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। আর ফলেতেই বন্ধন। তাতেই জন্ম মরণ, তাতেই দুঃখ কষ্ট, শোক তাপ। জীব এর হাত থেকে মুক্ত হতে চায়। সে অন্ধের মত চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক পথ জানে না। বেদান্ত চারটি পথের আবিষ্কার করেছেন — জ্ঞান-পথ, যোগ-পথ, ভক্তি-পথ ও কর্ম-পথ।

কর্মযোগ বা কর্মপথেরই আলোচনা আজ হইবে। যে কোনও কর্ম ক'রে ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করার নামই কর্মযোগ। কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হওয়া। যা সব করা যায় তা সব তাঁর জন্য করা হচ্ছে — এ ভাবলে আর বন্ধন হয় না, কর্মযোগ হয়। জীবন ধারণের জন্য নিত্য যা করা যায় — রান্না, খাওয়া, ঘর ধোয়া, বাসন মাজা, এই সব সামান্য কাজও তাঁর জন্য করা হচ্ছে, এইরূপ ভাবতে পারলেই কর্মযোগ হয়।

আর কোনও জীবকে ঘৃণা করবে না। ঘৃণার ভাব এলে মনে করবে এঁর ভিতর নারায়ণ আছেন। হাড়ী, ডোম এদের ঘৃণা করে তোমরা বড় হতে চাও! এ কখনও হবে না। যাঁরা জগতে বড় হয়েছেন তাঁরা এদের সব কোলে তুলে নিয়েছেন। বুদ্ধদেবকে দেখ। তাঁর ধর্মে সকলেরই স্থান আছে, হাড়ী ডোমকেও আশ্রয় দিয়েছেন। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন। আর ঠাকুর হাড়ীর বাড়ির নর্দমা নিজের মাথার চুল দিয়ে মার্জনা করেছেন, ঝাড়ু দিয়েছেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ — এঁরা, যাদের তোমরা নীচ বল, তাদের আপন করে গেছেন। তোমরা এদের পর করে দিয়েছ। এখন এদের উঠাও।

লেখাপড়া শেখাও, ভালবাস। মনে কর তোমাদের ইষ্ট ঐসব রূপ ধারণ করে রয়েছেন। নারায়ণ বুদ্ধিতে করলে তারা শীঘ্র উঠে যাবে। সঙ্গে তোমরাও উঠবে, দেশ উঠবে, জগৎ উঠবে।

তুমি নিজে যা পেতে চাও না অন্যকেও তা দিও না। তুমি কি নিজে ঘৃণা লজ্জা দুঃখ কষ্ট অপমান পেতে চাও? কখনই না। তা হলে অপরকেও এসব দিও না। মানুষকে যদি ভালবাসতে না পার তা হলে কি হবে তোমার বি-এ, এম-এ দিয়ে। এ বিদ্যায় যথার্থ মানুষ করতে পারে না। Morality-র (নীতির) জোর না থাকলে কিছুতেই কিছু হয় না। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সব কাজ তাঁর, এই ভেবে সব করতে চেষ্টা কর। দেখবে নৈতিক শক্তি বেড়ে যাবে। নৈতিক বল না থাকলে ধর্মপথে এগোনো যায় না। পরমহংসদেব এক রকম নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আজ জগৎপূজ্য।

বৈদিক ক্রিয়ার সময় এখন আর নাই — অশ্বমেধাদি। তাই বর্তমান সময়ের যুগাবতার পরমহংসদেব ঐ সব বাদ দিয়েছেন। তিনি বলে গেছেন, এখন সার ধর। কলির জীবের অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম। তাই ঐসব কর্মকাণ্ড করে উঠতে পারে না। জীব শিব বেদান্তের এই সার তিনি প্রচার করে গেছেন সোজা কথায়। তাঁর কথা পালন কর। মানুষ হয়ে যাবে, ক্রমে দেবতা হবে।

তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, মন মুখ এক করে প্রার্থনা করতে। মন মুখ যখন এক হবে, এই সাধনে যখন সিদ্ধ হতে পারবে, তখন যা চাইবে তাই পাবে। শুদ্ধ মনে আন্তরিক প্রার্থনা করলে উহা গিয়ে Universal mind-এ (বিশ্ব মনে, ভগবানের মনে) আঘাত করে। তখন সেখান থেকে response (উত্তর) আসে সুফল রূপে।

কর্মযোগের secret (কৌশল) হল ঐ গীতায় যা বলেছেন —

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। (গীতা ৯/২৭)

যখন খাবে তখন ভাব, ক্ষুধারূপে ঈশ্বর উদরে রয়েছেন। আমি তাঁতে আহুতি দিচ্ছি। রোজ কর্মফল ভগবানে দিতে চেষ্টা কর। আর মনে রাখবে সত্যবস্তু এক। যখন নির্গুণ তখন ব্রহ্ম বলা হয়। যখন

সগুণ তখন ঈশ্বর, নারায়ণ এই সব বলা হয়। বস্তু এক।

দেখ, আমেরিকায় বেশ ছিলুম। ওখানেও তাঁর কাজ করেছি। এখানেও তাঁর কাজ করছি। এখানে থাকবো বলে আমি আসি নাই, কিন্তু হয়ে গেল থাকা। এই সব কাজ তাঁরই। Sore-throat (গলায় ঘা) হয়েছিল আসার দেড় বছর আগে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে (San Francisco); বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেছেন warm climate-এ (গরম স্থানে) চলে যাও। আমি ভাবলুম তাহলে India-তে (ভারতে) যাই। রোগও সারবে আর মহাত্মা গান্ধীর movement (আন্দোলন) ও দেখে আসতে পারবো। থাকবো বলে আসি নাই। এখন সকলে ধরে এনে এই কাজে নামিয়েছে। মনে করছি এ তাঁরই ইচ্ছা। ঠাকুর যেন ঘাড়ে ধরে এনে কাজ করাচ্ছেন। আমিও ভাবছি মনপ্রাণ সবই যখন তাঁকে দিয়েছি তখন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার মনে যে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সংকল্প উঠেছে তা তিনিই উঠিয়েছেন। করে যাচ্ছি তাঁর কাজ। ফলাফল তিনি জানেন। তোমরাও সব তাঁ'তে সমর্পণ কর ... মনপ্রাণ শরীর সব, স্ত্রী পুত্র পরিজন সব। শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে। নিঃসংশয়।

রাত্রি নয়টা । শ্রীম আহার করিতে উপরে উঠিতেছেন।

৪

শ্রীম (ভক্তগণের প্রতি) — তিনি কত রকম লীলা করেছেন। এই আমরা যেমন এখানে বসে তাঁকে ডাকছি এমনি অনন্ত স্থানে অনন্ত লোক তাঁকে ডাকছে।

দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে আসর জমিয়াছে। শ্রীম ভক্ত সঙ্গে মাদুরে বসিয়া আছেন। ছোট জিতেন, মণি, মনোরঞ্জন, যোগেন প্রভৃতি পাশে বসা। এখন রাত্রি আটটা। দেখিতে দেখিতে বড় জিতেন ও অমৃত আসিলেন, তারপর ডাক্তার বক্সী, বিনয় ও ছোট নলিনী।

জগবন্ধু বেদান্ত সোসাইটি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীম উপরোক্ত কথা বলিলেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — আপনারা গিছলেন কি মিটিং-এ

গতকাল। কি কথা হলো?

ডাক্তার — কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর পৌরোহিত্যে সভা হয়েছিল। রাঁচির ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অধিবেশন। শিক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হয়। শিক্ষা ধর্মমূলক হওয়া চাই। আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর লৌকিক শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে চরিত্র সুগঠিত হবে। বর্তমান শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ়-মূলহীন। তাই মানুষ তৈরী হয় না ইত্যাদি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তা হলে দেখা যাচ্ছে টিচারদের আগে ট্রেনিং-এর দরকার। আর গার্ডিয়ানদের। আগে contents of man (মানুষ কি) এ জানা দরকার। তারপর philosophy or plan of education (শিক্ষার প্রণালী) নির্ধারণ। মানুষের ভিতর তিনটে শরীর রয়েছে, gross, intellectual and spiritual – স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। এই তিনটে শরীরেই যাতে ক্রমে বা এক সময়ে আহার পৌঁছে তার ব্যবস্থার দরকার। স্কুল কলেজে তবু মাঝের শরীরটার আহার যোগাচ্ছে — সূক্ষ্ম শরীরের। কারণ-শরীরের সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে চরিত্র সুগঠিত হবে। শান্তি আনন্দ আসবে। Highest ideal এর সঙ্গে যোগ রেখে সব করতে হবে। নইলে নৈতিক চরিত্র দৃঢ় হবে না। ভারতের শিক্ষার এই ব্যবস্থার জন্যই ভারতের সংস্কৃতি অত সুদৃঢ় ও উচ্চ। গুরুগৃহে এই তিন শরীরের বিকাশের ব্যবস্থা ছিল। মানুষের আদর্শ, জাতির আদর্শ আগে স্থির করে প্লান করলে কাজ হয় ভাল। নইলে যেমন কলসীর জল ঢালছে কিন্তু সব মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। গ্লাস রয়েছে অনেক দূরে। সব পণ্ডশ্রম হয়।

আমাদের বিদ্যাপীঠে ওঁরা বেশ করছেন অনাদি মহারাজরা। বেশ সব টিচার তৈরী হচ্ছে। ছাত্রদের ঐ তিন শরীরেরই খোরাকের ব্যবস্থা হচ্ছে। আর teacher-ও trained (শিক্ষকও তৈরী) হচ্ছে। অবশ্য সূক্ষ্ম শরীরের উপরই জোর দেওয়া উচিত শিক্ষার সময়, একটু বেশী করে। স্থূল শরীরের সংগঠন হচ্ছে আর কারণ-শরীরে বিশ্বাসও থাকছে সঙ্গে সঙ্গে। বিদ্যাপীঠের শিক্ষকরা সকলেই আপন আপন

কাজ বুঝে নিচ্ছেন। ওঁদের সঙ্গে থাকা একটা privilege (বিশেষ সুবিধাজনক ব্যাপার)। আমরা কিছুদিন ছিলাম মিহিজামে যখন আরম্ভ হয় প্রথম। পূর্বে ভেবেছিলাম হেমেন্দ্র মহারাজই (স্বামী সদ্ভাবানন্দ) বুঝি লিডার, তা নয়। এখন দেখি কোনও কর্তা নাই। যার যার কাজ নিজেরাই বুঝে করছেন। বেশ হচ্ছে। সকাল থেকে রাত নটা-দশটা অবধি অনবরত খাটুনী। সব কাজ হাসিমুখে করে যাচ্ছেন। দায়িত্বজ্ঞান ভিতরে ঢুকেছে, আর মানুষের কি কি দরকার তার শিক্ষাও পেয়েছেন ওখানকার শিক্ষকগণ।

শ্রীম কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আবার কথা বলিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠাকুরকে, 'উপায় কি'। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস'। অর্থাৎ Superman-এর (ব্রহ্মজ্ঞের) সহায়তা নেওয়া। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে করলে এতেই হয়ে যাবে।

গিরিশবাবুর কত বিশ্বাস! ঠাকুর বলতেন, 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস গিরিশের।' তিনি কি বাইরে দেখতেন? তিনি দেখতেন মানুষের ভিতর। বলতেন, 'কাঁচের আলমারীর ভিতর জিনিষ থাকলে যেমন সব দেখা যায় তেমনি আমি সবাইর ভিতর দেখতে পাই।' শুধু কি এ জন্মের? পূর্বজন্মের পরজন্মের সব দেখতে পেতেন বলতেন। গিরিশবাবুর বাহিরটা এমন হলে কি হয় ভিতরে সাধু ছিলেন পূর্ব থেকেই!

গিরিশবাবুর বাড়িতে একদিন ঠাকুর গেছেন। বাজার থেকে খাবার আনিয়ে থালায় করে সতরঞ্চির উপর রেখে দিলেন। ঐ সতরঞ্চিতে সকলে বসেছেন। বলরামবাবু ওখানে উপস্থিত সেই সময়। ওঁর মনে লেগেছে এই অনাচার দেখে। তাই ঠাকুর ওঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'এখানে এই রকম। তোমার ওখানে যাব তখন অন্য রকম, সদাচার।' বলরামবাবু নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব।

তাই তাঁর অনন্তভাব, অনন্ত কাণ্ড। এত সব হেঙ্গাম মিটাবার জন্য মাঝে মাঝে আসেন মানুষ হয়ে, এসে গোটাকয়েক কথা মোটের উপর বলে যান। এখন কিছুদিন ঐ কথা নিয়ে চলতে থাক। আবার

এসে আবার বলে যাবেন। এই রকম চলছে।

মিহিজামে দেখলাম, লাঙ্গল সব জমিতে পড়ে আছে। ছিঁটে জল দিয়ে কত জমি চাষ করবে তাই। যেই বৃষ্টি হলো অমনি সব লাঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত। সব বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তেমনি অবতার — তিনি এলে জলে জলময়।

'অবতার এলে জলে জলময়' এই মহাবাক্য ভক্তগণ চিন্তা করিতেছেন। শ্রীমও নীরব কিছুকাল। ঠাকুর অবতার এইমাত্র এসেছেন, এখন তবে তো খুব সুযোগ, আর আমরা খুব সৌভাগ্যবান, ভক্তরা কেউ কেউ ভরসার এই নিশ্চিন্ত ভাব উপভোগ করিতেছেন ক্ষণকাল। পুনরায় কথা আরম্ভ হইল।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — বেদান্ত সোসাইটিতে আজ কি হল বলুন তো?

ভক্ত — আজের বিষয় ছিল রাজযোগ। স্বামী অভেদানন্দজী বলেন, Concentration (একাগ্রতা) attention-এরই (মনোযোগেরই) একটা forward stage (অগ্রসর অবস্থা)। সমস্ত মনটা কুড়িয়ে এনে একদিকে একটা জিনিষে নিবিষ্ট করা। এরই নাম concentration (একাগ্রতা), প্রথমে হয় না, নিত্য অভ্যাস করতে হয়। চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যায়। ঠাকুরদের এতসব ছবি আছে। এর মধ্যে যেটি তোমার ভাল লাগে সেটিতে মনকে বসাতে চেষ্টা করবে। মন বাহিরে হাজার জিনিষে ছড়িয়ে আছে। অল্প অল্প করে তোমার আদর্শ ছবির দিকে আনবার চেষ্টা করবে। সাধারণ কথায় একেই ধ্যান অভ্যাস বলে। জপ, ধ্যান সব ঐ উদ্দেশ্যে করা হয়। রোজ রোজ একটু একটু করে করতে করতে হয়ে যাবে। শেষে সুখ পাবে।

এতে সাধুসঙ্গের বড় দরকার। সাধুসঙ্গে এ কাজটি অতি সহজে হয়ে যায়। সাধুরা সর্বদা ঐ অভ্যাস করছেন কিনা। তিনবার অন্ততঃ ধ্যান করতে হয় নিয়মিত সময়ে — সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায়। শেষ রাত্রিতে ধ্যান শীঘ্র হয়। মন তখন স্থির থাকে। তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ করবে।

শঙ্করাচার্য অত জ্ঞানী। সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে তিনি বলছেন, — ‘ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।’ সাধুসঙ্গ ভবার্ণব উত্তীর্ণ করতে পারে। অর্থাৎ অজ্ঞান নাশ করতে পারে, এক ক্ষণের জন্যও যদি সাধুসঙ্গ হয়। সাধুরা অগ্নিস্বরূপ। তাঁদের সঙ্গ করলে ভিতরের বাসনা সব শুকিয়ে যায়। পরমহংসদেবের কাছে যাতায়াত করে আমাদের সব উল্‌টে গেল। তোমাদের মতই আমাদের মন ছিল। তোমরাও সৎসঙ্গ কর। তোমাদের মনও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তোমরাও সাধু হতে পারবে। তখন তোমাদের কাছে লোক এলে তাদের মনও ফিরে যাবে। সেই মন নিয়ে আর সংসার ভোগ করা চলবে না। সন্ন্যাসী করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। গৃহে থেকেও হয়। অনাসক্ত হয়ে গৃহে থাকতে অভ্যাস কর। হয়ে যাবে। গেরুয়া তো শুধু সাইনবোর্ড।

Concentration (একাগ্রতা) ব্যতীত ঈশ্বর লাভ হয় না — কিছুই লাভ হয় না। সব বিষয়ে এর দরকার উন্নতি করতে চাইলে। পোলাণ্ডে একটি ছেলে পাঁচ বছরের সময় ওর বাবাকে Chess (দাবা) খেলার চাল বলে দিত। চৌদ্দ বছরের সময় World's Chess Competition-এ (বিশ্ব দাবা খেলা প্রতিযোগিতায়) champion (সেরা বিজয়ী) হয়েছে, পৃথিবী জয় করেছে।

তোমরা অভ্যাস কর। জ্ঞান লাভ করতে পারবে। জনক গৃহে ছিলেন, রাজ্য করেছিলেন কিন্তু জ্ঞানী ছিলেন। তোমরাও জ্ঞানী হও।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খৃঃ অঃ, ৯ই আশ্বিন, ১৩৩০ সাল।
বুধবার।

তৃতীয় অধ্যায়

যে বিপদে পড়ে নাই সে শিশু

১

মর্টন স্কুল। শ্রীম দোতলার পশ্চিমের হলঘরে বসিয়া আছেন। পাশে, ছোট জিতেন, বিনয়, মণি, নলিনী ও যোগেন উপবিষ্ট। একটি ভক্ত বেলা তিনটার সময় বেলুড় মঠে যান শ্রীম-র ইচ্ছায়। সেখান হইতে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে যান। স্বামী অভেদানন্দ সেখানে বক্তৃতা দেন। শ্রীম মঠের কথা সব শুনিলেন। এখন রাত্রি ৯টা।

আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ অঃ। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩০ সাল, রবিবার।

এইবার শ্রীম-র কথা হইতেছে।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — অন্নদাঠাকুরকে একবার নিয়ে যান মঠে, বেড়াবেন বলে।

যোগেন — উনি যাবেন না।

শ্রীম — জোর করে নয়। আপনি শুধু বলবেন, ঠাকুরের নিত্য পূজা হয় সেখানে, চলুন বেড়িয়ে আসি। আমরাও যাই। অভিমানে আঘাত দিবেন না। তাঁদের ওখানে গিয়ে মাথা নত করুন, এসব বলবেন না। বলবেন, যেমন বেড়ায় না লোক এদিক সেদিক, সেইভাবে। বলবেন, চলুন ঠাকুরকে একবার দর্শন করে আসবেন।

(রহস্যচ্ছলে, উৎসাহ দিয়া) আপনি তো কৃতি লোক। এত সব কাজ করেছেন, এই সামান্য কাজটা করুন না। এতে কল্যাণ হয়। যীশু বলেছেন, 'Blessed are the peace-makers: for they shall be called the children of God.(St. Matthew 5:9) শান্তি স্থাপন করে যারা, বিপদ মিটিয়ে দেয় যারা, তারা সামান্য লোক

নয়। তারা ধন্য। তারা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার পাত্র।

আজকাল ঠাকুরের 'মিশন' থেকে আলাদা হয়ে ঐ নামে কাজ কেউ করতে পারবে না — success (সফলতা) হবে না। অমুক অত বড় লোক। তিনি শেষে মঠের মতে মত করেছেন। তবে কাজ হচ্ছে।

অন্নদাঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। কিছুদিন পূর্বে তিনি শ্রীম-র নিকট আসিয়াছিলেন। তখন শ্রীম ঠাকুরের কথামৃত কিয়ৎ পরিমাণে তাহাকে পরিবেশন করিয়াছিলেন। আর খুব আদর যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন খুব বিপজ্জনক — ঠাকুরের এইসব মহাবাণীর আলোচনা হইয়াছিল সেদিন।

ডাক্তার বক্সী ও এটর্নি বীরেন প্রবেশ করিলেন। বীরেনের সঙ্গে পুরীর কথা হইতেছে। বীরেন পুরী যাইবেন।

শ্রীম — আমার ইচ্ছে হচ্ছে পুরী যাই। কতদিন থেকেই পুরী পুরী করছে মনটা। এখন জগন্নাথ নিয়ে গেলে হয়।

এইবার ঠাকুরের নামে নানা প্রতিষ্ঠানের কথা উঠিল। ভক্তরা কেউ কেউ বেশ উৎসাহে যোগদান করিতেছেন ঐ কথায়। সকলেই কি ঠাকুরের শুদ্ধভাব রাখিতে পারিবে? এই সব কথা। কলিকাতার উপকণ্ঠের একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বিশেষ করিয়া হইতেছে। শ্রীম এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এরা এইসব ছোকরাদের জোর করে কাপড় রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে। আর ছেলেগুলি চাঁদার খাতা হাতে করে হৈ হৈ করে ঘুরছে। এসব ভাল নয়। গেরুয়ার আদর্শ কত বড়। সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্ন গেরুয়া। মনের সব বাসনা গেলে সন্ন্যাস। অত বড় উঁচু আদর্শ বলেই চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গেরুয়া দেখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন। আদর্শকে অত নীচুতে নামাতে নাই সুবিধার জন্য। চাঁদা তুলতে হয় অমনি তুলুক না; গেরুয়া কেন?

শ্রীম কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এইবার একজন ভক্তকে বলিলেন গতকালের বেদান্ত সোসাইটির কথোপকথন ক্লাশের রিপোর্ট শুনাইতে। ভক্ত পড়িয়া শুনাইতেছেন। প্রশ্নকর্তা সভ্যগণ।

উত্তর দিতেছেন স্বামী অভেদানন্দজী।

প্রশ্ন — মহারাজ, দীক্ষার প্রয়োজন কি?

উত্তর — ইহা এক প্রকার সংস্কার, ব্যাপ্‌টিজমের মত। ঈশ্বরের রাজ্যে যেতে হলে এর দরকার।

প্রশ্ন — আচ্ছা কুলগুরুর নিকট থেকে দীক্ষা না নিলে কি দোষ হয়?

উত্তর — তোমার যদি তাতে বিশ্বাস না হয় তাহলে কি করবে? যেখানে বিশ্বাস হবে সেখান থেকেই নেওয়া যায়। তবে ওদের বাৎসরিক দিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন — একবার একজনের কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে আবার অপর স্থান থেকে নেওয়া যায় কি?

উত্তর — তা যায়। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তোমার পিতামাতা হরিভক্ত। তোমার মন হয়তো শক্তির দিকে আকৃষ্ট। ছেলেবেলায় হরিমন্ত্র নিয়েছিলে, কিম্বা বড় হয়েই নিলে। হরিমন্ত্রে তোমার কাজ হবে না। এ অবস্থায় মন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন। অবধূতের চব্বিশ গুরু ছিল। পরমহংসদেবও এক এক সাধনের সময় এক এক গুরু করেছেন।

পরমহংসদেব বলতেন 'মন তোর' (মন্‌তর, মন্ত্র)! মন্ত্র মানে তোমার মনে যাতে শান্তি আসে সে বস্তুটি। যেটি চিন্তা করতে তুমি ভালবাস সেটি নেওয়া।

প্রশ্ন — mind (মন) আর conscience-এর (বিবেকের) তফাৎ কি?

উত্তর — mind (মন) হলো সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক। বুদ্ধি হল নিশ্চয়াত্মক — সদসৎ বিচারাত্মক। মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, এই চারিটিকে বলে অন্তঃকরণ — inner organ, "Conscience (বিবেক) বিবেকাত্মক বুদ্ধি — ভালমন্দ বিচারশক্তি। It is formed by education, environments, customs and manners of different countries. ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আচার ব্যবহারের দ্বারা এর সৃষ্টি। তাই

conscience ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

প্রশ্ন — ভারতের দুর্দশার কারণ কি? নানাজনে নানারকম বলে।

উত্তর — ভারতের এই বর্তমান দৈন্য দুঃখ দুর্দশার কারণ তোমরা নিজেরা।

ভারতের পরাধীনতা, বাংলার পরাধীনতার কারণ তোমরা নিজেরা। তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা কর। তোমরা পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েছ। তোমরা হিন্দু হয়ে হিন্দুকে যত ঘৃণা কর মুসলমানকেও তত ঘৃণা কর না। কনখলে দেখতাম কুয়া থেকে মুসলমান জল তুলে নিচ্ছে তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু যেই হিন্দু মুচীতে ছুঁলো অমনি কূপ অপবিত্র হয়ে গেল। এইতো দেশের অবস্থা। এই আমাদের মনোভাব। এই মনোভাব নিয়ে না পারবে বড় হতে, না মুক্ত হতে পারবে।

সবাইকে ভালবাসতে শেখ। এদিকে সবাইতো মুখে বলছো সবই নারায়ণ — 'সর্বং নারায়ণং জগৎ'। তা'হলে আবার ঘৃণা করছো কি করে? পরমহংসদেব আমাদের শিখিয়েছিলেন, সব নারায়ণ। সকলকেই তাই শ্রদ্ধা কর। তিনি যুগাবতার। তাঁর কথা নিয়ে আমাদের চলতে হবে।

জাতি বিভাগ থাকবে। ওটা থাকুক। ওটা যাবার নয়। বুদ্ধদেব অত করেও ওটাকে উঠাতে পারেন নাই। কিন্তু untouchability (অস্পৃশ্যতা) উঠাতে হবে। এতে মানুষকে পশুরও অধম করে রেখেছে। হাড়ী, ডোম এরা পূর্বে ভাল ছিল বৌদ্ধ যুগে। পরে হিন্দুরা প্রতিশোধ নিয়ে একঘরে করে রেখেছে। ছোট করে রেখেছে। এদের শিখাও বেদ বেদান্ত সব। দেখবে ওরা মহা পণ্ডিত হয়ে যাবে এতে।

পরমহংসদেব নিজের মাথার চুল দিয়ে হাড়ীর ঘরের নর্দমা পরিষ্কার করেছিলেন। আর বলেছিলেন, 'মা আমার ব্রাহ্মণ অভিমান দূর করে ন্যাও। এটা থাকতে তোমায় পাব না।'

তোমরা সকলকে ভালবাস, সেবা কর। দেখবে, দেশ হুড় হুড় করে উপরে উঠে যাবে। তারাও উঠবে, তোমরাও উঠবে। তাদের নীচে রেখে তোমরা উপরে উঠতে পারবে না।

শ্রীম — আজের বক্তৃতায় কি সব কথা হ'ল?

ভক্ত — আজের বক্তৃতা ছিল ইংরেজীতে। সংক্ষেপে সার এই

— Return good for evil. Think all as parts of a stupendous whole — the virat. God sees through us — sees, speaks, eats etc, through us all. There can be no feeling of hatred in us if we judge in this way. Make an ideal and then go on working it out. Remember, you are a part of that ideal. Think of all alike as so many Narayans.

সকলেই ভগবানের রূপ, নারায়ণের রূপ। আমি ও সকলে এরূপ ভাবতে পারলে ঈর্ষা দ্বেষ দূর হয়ে যায়। বিরাট পুরুষের অংশ আমরা সব। তিনি আমাদের ভিতর দিয়ে দেখছেন, খাচ্ছেন, শুনছেন, সব করছেন।

শ্রীম — নারায়ণ বুদ্ধিতে দেখবে কি ক'রে যদি প্রথমে নারায়ণকে না চেনো। ঠাকুর তাই বলতেন, তপস্যা করে আগে নারায়ণকে চেনো। তারপর সংসার কর আর যাই কর। তা নইলে যেমন বইএ আছে ঐ কথা — কাজ হয় না।

একজন ভক্ত — কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) ক্লাশে সর্বদা ঐ সব কথা বলে থাকেন। সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, ধ্যান, নির্জনবাস এই সব কথা। বলেন, আদর্শ একটি ধর, আর এসব উপায়ে সেটিকে জাগ্রত কর। আর সকলের ভিতর ঐ আদর্শটি রয়েছে ভাব। আজের পাব্লিক বক্তৃতায় ঐরূপ বলেন নাই। হয়তো সাধনের উপর জোর দিলে লোক পালাবে শুনে, তাই হয়তো বলেন নাই। একটা সৎ ভাবনা মাত্র শুনিয়ে দিলেন। তা বলে কি সত্য কথা কইবো না, ঠাকুরের কথা যা। লোক থাক্ আর যাক্। তাঁর কথা কইতেই হবে। (সহাস্যে) আমাদের দরোয়ান বেশ বলে, 'সাচ্ বলুংগা ইসমে শির যায় জানে দো'।

ঠাকুর এই কথা বলতেন, সত্যকে ধরে থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়। সত্য কথা কলির তপস্যা।

২

আজ একাদশী ২০শে অক্টোবর ১৯২৩ খৃঃ, ৩রা কার্তিক ১৩৩০ সাল। গতকাল বিজয়া দশমী গিয়াছে। মর্টন স্কুলের ভক্তগণ পূজার কয়দিন মঠবাস করিয়া ফিরিয়াছেন। ডাক্তার কার্তিক বক্সী ও জগবন্ধু মঠ হইতে কাশীপুর ডাক্তারের বাড়ি হইয়া এইমাত্র ঠনঠনের কালীবাড়ির নিকট ট্রাম হইতে নামিলেন। এখন রাত্রি আটটা। তাঁহারা মা কালীকে প্রণাম করিতে গেলেন।

বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন শ্রীম মায়ের সম্মুখে বসিয়া আছেন, পূর্বাস্য। শুকলাল মন্দিরের নিম্ন সোপানে উপবিষ্ট। মনোরঞ্জন, যোগেন, সুখেন্দু ও ছোট জিতেন — কেউ বসা কেউ দাঁড়াইয়া আছেন।

বিস্ময়ানন্দে পূর্ণ হইয়া একটি ভক্ত মাকে অতিশয় ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন। মস্তক উত্তোলন করিতেই শ্রীম সস্নেহে বলিলেন, ‘চরণামৃত নিন, চরণামৃত।’ ভক্তটির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিতেছেন, কি সৌভাগ্য আজ আমার! ব্রহ্মশক্তির মানুষমূর্তি শ্রীশ্রী ঠাকুর। তাঁর হাতে গড়া অন্তরঙ্গ সন্তান শ্রীম মায়ের চরণামৃত লইতে নির্দেশ করিলেন। মায়ের চরণামৃত কি সংসারজ্বালার মহৌষধ?

ভক্তগণ শ্রীম-সঙ্গে মায়ের ধ্যান চিন্তা করিতেছেন। কিছুকাল পর একজন যুবক ভক্তকে শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কয় বছর হলো আপনারা এ মহাযজ্ঞে যোগদান করছেন? পাঁচ-ছ’ বছর হলো তো? দুর্গা পূজা মঠে যা হয়ে গেল এ একটি মহাযজ্ঞ। ধন্য যাঁরা এতে যোগদান করেন।

শ্রীম উঠিয়া গেলেন ঠাকুরবাড়ি আহার করিতে। অন্য ভক্তগণও নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। কেবল ডাক্তার, বিনয়, সুখেন্দু ও জগবন্ধু স্কুলবাড়িতে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরে মাদুরে আসিয়া বসিলেন। মঠে এই কয়দিন সুনিদ্রা হয় নাই, পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছে। তাই তাঁহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

একটি ভক্ত বেঞ্চিতে লম্বা হইয়া শুইয়া ভাবিতেছেন, ‘ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের নামের কোন বিশেষ অর্থ আছে কি? কিংবা এমনি

নাম দেওয়া হয়েছে? স্বামীজীর দেওয়া নামের বিশেষ অর্থ থাকাই সম্ভব।' ইতিমধ্যে শ্রীম আসিয়া উপস্থিত। 'কি নিদ্রাবিষ্ট বুঝি সব', শ্রীম একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'আজ্ঞা হাঁ, এদের বিশ্রাম একেবারেই হয় নাই। আমি দিনে একটু বিশ্রাম করেছিলাম তাই। এরা খুব ক্লান্ত', ভক্ত উত্তর করিলেন। 'হাঁ, এই কয়দিন কি খাটুনী সব গেছে, সব tired (ক্লান্ত)', তিনি বলিলেন।

বাহিরে চন্দ্রের কি স্নিগ্ধ সুষমা। জগৎ সুশান্ত কিরণজালে ঢাকা। ভক্তটিকে লক্ষ্য করিয়া যেন নিজেকেই নিজে বলিতেছেন।

শ্রীম — আগামী পূর্ণিমার দিনটি খুব দিন। কেশব সেন থাকতে ঠাকুর এই দিনে ওঁর বাড়িতে এসেছিলেন। স্টীমারেও একবার কেশববাবুর সঙ্গে বেড়িয়েছিলেন। কেশববাবুর শরীর গেলে কেশববাবুর মা ঠাকুরকে এই দিনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিছলেন কলুটোলার নবীন সেনের* বাড়িতে। ইনি বড় ছেলে।

ঐদিন রাত্রে আমরা বাসা খালি রেখে চলে এলাম। এমনি টান তাঁর জন্য। মনেও হয় নাই বাসায় বিপদ হতে পারে। নিচে বসে বসে সব গান শুনলাম। উপরে ঠাকুরের ভুবনমোহন নৃত্য হচ্ছিল আর গান। আমরা উপরে যাই নাই। রোয়াকে বসে শুনছি। অন্যে জানতে পারেন নাই। ঠাকুর কিন্তু টের পেয়েছিলেন। পরদিন তাই বলেছিলেন হঠাৎ, অন্য কোনও কথা নাই — 'গোপনে ভাল'। আমি শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। কি করে জানলেন? তিনি অন্তর্যামী পুরুষ। তাঁর তো অগোচর কিছু নাই! আজও সেই চাঁদ, সেই রাত মনে পড়ছে — সেই নৃত্য, সেই গান যা দেখলে, যা শুনলে ত্রিতাপ জ্বালার নাশ হয়, জগৎ ভুল হয়ে যায়। অবতার লীলার সাক্ষী সেই চাঁদ আজও দেখছি। যেন কাল হয়ে গেছে মনে হয়, অত বছর গেছে তবুও। কি আশ্চর্য এখনও দেখছি সেই অপরূপ নৃত্য সেই দেব-মানবের!

---

*শ্রী নবীন সেন শ্রী কেশব সেনের বড় ভাই।

৩

শরৎকাল। মর্টন স্কুল। তিনতলার কোণের ঘরে শ্রীম। গৃহ অর্গলবদ্ধ। একটি যুবক আসিয়া পাঁচ সাত মিনিট বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে শ্রীম বাহিরে আসিলেন। এখন সন্ধ্যা সোওয়া ছয়টা। আগামীকাল ঁলক্ষ্মী পূর্ণিমা।

এই যুবক আজ দেশে যাইবেন। শ্রীম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি আজ? ট্রেন ক'টায়?' যুবক উত্তর করিলেন, 'সাড়ে আটটায়। শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে।' শ্রীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খাওয়া হয়েছে কি?' 'শিয়ালদহে খেয়ে গাড়ীতে উঠবো', যুবক বলিলেন।

শ্রীম দোতলায় নামিতেছেন। হাতে একশিশি উত্তম মধু, সিমলা পাহাড় হইতে আসিয়াছে। বলিতেছেন, 'এই মধু মঠে মহাপুরুষকে দিতে হবে।' নামিতে নামিতে জগবন্ধুর হাতে দিলেন দেবী ভাগবত।

দোতলার সিঁড়ির ডানের ঘর। এই ঘরেই সর্বদা ভক্তসভা বসে। আজও ভক্তগণ এখানেই বসিয়া আছেন। শ্রীম শীঘ্র শৌচাদি সারিয়া আসিয়া মেঝেতে মাদুরে বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। শ্রীম-র ডান হাতে বড় জিতেন। তাঁরই পাশে উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন একটি যুবক। শ্রীম-র সম্মুখে, শুকলাল, ছোট জিতেন, বিনয়, যোগেন ও ছোট রমেশ। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — বিনয়বাবু, এই মধু মহাপুরুষ মহারাজকে দিতে হবে। মঠে নিয়ে যেয়ো। আর ভাবমহারাজের (স্বামী রামেশ্বরানন্দ) সঙ্গে ঐ বিষয় আর কিছু কথা হলো?

বিনয় — আজ্ঞে, না। উনি তো কতবার বলে রেখেছেন 'যখন ইচ্ছা হবে যাবেন'। উনি বলেন, জামতারায় আশ্রমই হয়েছে এইজন্য, ঠাকুরের সন্তানদের জন্য। উনি আরও বলেছেন, আপনি গেলে আশ্রম শীঘ্র জেগে উঠবে।

শ্রীম-র পুনরায় জামতারা, মিহিজাম, যাইবার ইচ্ছা।

বিনয় — মিস মেক্‌লাউড আপনাকে এই পত্রখানা দিয়েছেন।

একজন ভক্ত পত্র পড়িয়া শুনাইতেছেন। মিস মেক্‌লাউড

লিখিয়াছেন — কথামৃতের সবগুলি ভাগের ইংরেজী অনুবাদ হইলে জগতের লোকের প্রভূত কল্যাণ হইবে। নানারূপ দুঃখ দৈন্যে জগতের লোক এ সময় অতিশয় প্রপীড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণের শান্তিময় কথামৃত হৃদয়ে প্রবেশ করিলে নিশ্চয় শান্তিলাভ করিবে।

শ্রীম — তা আর বলতে! 'তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্'। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর গোপীরা বুঝেছিলেন এইটি। তাই বললেন, এই কথা। সংসারের ত্রিতাপজ্বালায় তপ্ত জীবগণের নিকট উহা জীবন অর্থাৎ জলস্বরূপ। প্রাণ শীতল হয় এ শুনলে, যেমন তৃষ্ণার্তের শরীর শীতল হয় জল খেলে। তা আর বলতে। আমাদের খুব ইচ্ছা আছে। কিন্তু হয়ে উঠছে না যে। এক পার্ট মাত্র আমি অনুবাদ করেছিলাম। মা শক্তি দিয়েছিলেন। বাকীগুলিও হবে তিনি শক্তি দিলে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — আপনার সঙ্গে মিস মেক্‌লাউডের কি কথা হলো কাশীপুর বাগান খরিদ করার সম্বন্ধে?

জগবন্ধু — আমি বলেছিলাম, আপনি তাঁর কাছে আমায় পাঠিয়েছেন কাশীপুর বাগানের সম্বন্ধে আলাপ করতে। বাগানের মালিকদের কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, তারা ষাট হাজার সমগ্র বাগানটির দাম চায়। তিনি চেষ্টা করলে এটি সহজেই মঠের হাতে আসে, আপনার এই অনুরোধের কথা বলি। স্বামীজীর এইখানে নির্বিকল্প সমাধি হয়। আর ঠাকুর প্রকাশ্য ভাবে স্বামীজীর নিকট পরিচয় দেন — 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' এইসব কথা শুনে বললেন, But I am not interested in the garden. If you are all interested, you can try (কিন্তু আমার এতে আগ্রহ নাই। তোমরা চেষ্টা করতে পার, তোমাদের যদি আগ্রহ থাকে।)

শ্রীম — আহা, কি ত্যাগ ওঁদের! গোপীভাব। শ্রীবৃন্দাবনে গোপীদের যেভাব ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্য, ঠিক সেই ভাব এঁর স্বামীজীর জন্য। সব ঐশ্বর্য আবার আত্মীয় স্বজন ছেড়ে বসে আছেন ঐ গঙ্গাতটে, মঠে স্বামীজীর সমাধি মন্দিরের পাশে। আহা, পূর্ণ প্রেমের লক্ষণ।

জগবন্ধু — মিস মেক্‌লাউড্ আপনাকে অনুরোধ করেছেন

কথামৃতের অনুবাদের জন্য। বললেন, I request Mr. M. to translate "Kathamrita" himself, because he speaks and writes brilliant English. After Swamiji I do not hear anybody speaking such good English. As literatrue, even his translation of the Gospel-Part I is an excellent study (শ্রীম-র কাছে আমার অনুরোধ তিনি নিজে 'কথামৃতের' বাকী অংশগুলির ইংরাজী অনুবাদ করুন। তিনি অতি উচ্চস্তরের ইংরেজী বলেন ও লেখেন। স্বামীজীর পর অমন ইংরেজী আর কারো কাছে শুনি নাই। তাঁর প্রথম ভাগের অনুবাদ পড়লে মনে হয় উহা অতি উচ্চশ্রেণীর একটি ইংরেজী সাহিত্য)।

শ্রীম — তাতো হল। কিন্তু ওটি* যদি কেউ করে দেয় তাহলে খুব ভাল হয়। খরিদ করে মঠের হাতে ছেড়ে দেওয়া। প্রায় এক বছর ঘর করেছেন ওখানে। কত স্মৃতি! আবার মহাসমাধি হয় ঐখানে। অন্তরঙ্গ বাছাই হয় সেখানে, কে আপন কে পর!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বরানগরের প্রথম মঠের স্থানটি আর কাশীপুর বাগান খুব দর্শন করতে হয়। তবে ঐখানকার সব ভাব ভক্তদের ভিতর জাগ্রত হবে। ঐসব স্থানও জেগে উঠবে। বরানগরের মঠে কত সব ঈশ্বর চিন্তা হয়েছে, কত জপ ধ্যান। ধ্যানই তখন বেশী হতো। কৌপীন সম্বল করে পড়ে আছে সব। কি বৈরাগ্য! জগতের হুঁশ নাই। আহারে শয়নে লক্ষ্য নাই। সর্বদা সঙ্গীন চড়ে আছে। ঠাকুর সবে চলে গেছেন। সকলের বিরহ ব্যথা। গঙ্গাতীরে বসেই কত রাত কাটিয়ে দিত। দুপুরে দুটি শুধু ভাত আর তেলোকুচো পাতা সিদ্ধ। এই তো আহার! রাত্রে রুটি ও একটু গুড়। তাও আবার পেট ভরে নয়। জলখাওয়ার মত। নিজেরাই করে নিতো বামুন না থাকলে। কত কষ্ট গেছে। কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। সব প্রেমোন্মাদ। ভগবানকে কিসে সঙ্গে রেখে আনন্দ লাভ হয়, চক্ষুর সামনে সেই চেষ্টা সকলের। ঠাকুর থাকতে তাঁর সাক্ষাতে ভক্তদের হৃদয় প্রেমানন্দে

*ওটি — কাশীপুর উদ্যান খরিদ

পূর্ণ থাকতো। সেটি চলে যাওয়ায়, চেষ্টা সকলেই করছে কিসে ফিরে আসে সেটি দৈনন্দিন জীবনে — আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে। সর্বকাজে শ্রীভগবানের জীবন্ত আনন্দময় উপস্থিতি ভক্তরা চাইছে।

বিনয় — মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, তখন এক পয়সার দেশলাই কিনবার শক্তি ছিল না। তেল কেনা তো দূরের কথা! অন্ধকারে বসে সব ভজন করতেন। কাশী-অদ্বৈতাশ্রমের গোড়ায় ঐরূপ ছিল, বললেন। এক একদিন এমন গেছে অতি কষ্টে এক পয়সার বাতাসা ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয়েছে। পয়সা নাই, তেল ও দেশলাই কিনবার, তাই অন্ধকারেই খাওয়া হতো।

শ্রীম — তাইতো স্বামীজী বলতেন, যারা বিপদে পড়ে নাই, তারা babies, মানে, দুগ্ধপোষ্য শিশু। বয়স হলে কি হয়, মন ঐরূপ। কত কষ্ট গেছে স্বামীজীর। অসুখবিসুখও কম হয় নাই। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর অসুখ হতো। বরানগরে একবার অসুখ হলো। ডাক্তার ডাকা হবে। কিন্তু ভিজিটের টাকা নাই। ভাল ডাক্তার দেখানো গেল না। কত চেষ্টা করে ভক্তরা ঔষধের দাম সংগ্রহ করতেন। তখনকার ভক্তরাও সব নড়েভোলা, পয়সা নাই। ভাল হলেন, কিন্তু আবার ম্যালেরিয়া। যাচ্ছে না কিছুতেই। শেষে কি আর করেন? এই নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন। এইবারেই বৈদ্যনাথ, ভাগলপুর, গাজীপুর, মীরাট প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। তারপর সঙ্কল্প করলেন হিমালয়ে তপস্যা করবেন। আলমোড়া চলে গেলেন। একটি গাছের নিচে আসন করেছেন, অমনি টেলিগ্রাম এলো, 'তোমার বোন আত্মহত্যা করেছে।' কি সুখের সংবাদ! আসন তুলে পাহাড়ের রাস্তায় শ্রীনগর হয়ে টিহিরীতে এলেন। ইচ্ছা উত্তর-কাশী যাবেন। টিহিরীতেই স্থির হলো কুটীর বেঁধে এখানেই তপস্যা করবেন। বাঙালি কে একজন দেওয়ান কি অন্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সঙ্গের গুরুভাইদের কার অসুখ হলো, গঙ্গাধরের বুঝি, তাকে নিয়ে এলেন দেরাদুন। এরপর ঋষিকেশে নিজের গুরুতর পীড়া, জ্বর, প্রাণ যায় — নাড়ী নাই। ন্যাংটা শব-দেহের ন্যায় পড়ে আছেন। কোথা থেকে একটি সাধু দৈবাৎ এসে উপস্থিত, হাতে পিপ্পল চূর্ণ আর মধু। জিহ্বায় ঐ

দিয়ে ঘষতে ঘষতে চেতনা ফিরে এলো। গুরুভাইরা সঙ্গে ছিলেন, হরি মহারাজ, শরৎ ও সান্ন্যাল। কেউ কেউ কেঁদেছিলেন শরীর ত্যাগ হয়ে গেছে ভেবে। কি আশ্চর্য পরে ঐ সাধুকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। স্বপ্নের মত এসে স্বপ্নের মতই বিলীন হয়ে গেল। রাখাল তখন হরিদ্বারে ছিলেন। তিনিও পরে ওদের সঙ্গে মীরাট যান। বুড়ো বাবাও এসে জুটলেন মীরাটে। স্বামীজীর অসুখ হওয়ায় তখন কে আর তপস্যা করে? টিহিরীতে এর পূর্বে গঙ্গাধরেরও অসুখ হলো। স্বামীজী তাকে নিয়ে বিব্রত। তাকে নিয়ে দেরাদুন গেলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরেও তাকে রাখবার স্থান হয় নাই। কে এক উকীল, কাশ্মীরী পণ্ডিত, ঔষধ ও পথ্যের দাম দিতে রাজী হলেন। কিন্তু স্থান আর পাওয়া গেল না। ভাড়াটে ঘরে গঙ্গাধরকে রাখা হল। একটা ঠাকুর দালানে অন্য সব আছে এক শেঠের বাড়িতে। স্বামীজীর এক বন্ধু খৃষ্টান সেখানে শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হতে তিনি নিয়ে গেলেন গঙ্গাধরকে তার বাড়িতে। কিন্তু মুসলমান বাবুর্চি দেখে পলায়ন। গঙ্গাধরকে মীরাট পাঠানো হল। অপর সকলে ঋষিকেশ থেকে একটু ভাল হলে স্বামীজীকে নিয়ে সাহারণপুর হয়ে মীরাট গেল। দিল্লীর দিকে তারপর এলেন। তারপরই বুঝি একা একা ভ্রমণ শুরু করলেন। সবাইকে সরিয়ে দিলেন। কত কষ্ট কত বিপদের পর তবে ঐ শতদল কমলটি ফুটেছে।

সারা ভারতময় বেড়ালেন একা একা। নির্জনবাসের ইচ্ছা অতি প্রবল হওয়ায় তিন বছর এইভাবে বেড়ালেন। কখনও গুরুভাইদের সঙ্গে দেখা হতো; গুজরাটে হয়েছিল। এঁরা ছাড়তে চায় না। তখন খুব কঠোর হয়ে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর আমেরিকা। সেখানেও কি কম কষ্ট? খেটে খেটে কত অসুখ। ফিরে এলেন, কিন্তু কিড্‌নিতে রোগ হলো, তাতেই দেহ গেল।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — তার আগেও কত বিপদ। বিপদের অন্ত নাই। বাপ ছিলেন বড় এটর্ণি। অনেক আয় ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন খুব খরচে লোক। যত্র আয় তত্র ব্যয়। ধার করেও দান করতেন। হঠাৎ মারা গেলেন বাপ। বাড়ির লোক তখন খেতে পায় না। নরেন্দ্র

বড় ছেলে। চাকরীর জন্য কত চেষ্টা করছেন — এখানে যাওয়া ওখানে যাওয়া। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমরা বললাম। তিনি বৌবাজার হাইস্কুলের হেডমাস্টার করে দিলেন। একমাস গেলেন সে কাজে। এর মধ্যেই কর্মটি গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জামাই ছিলেন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী। তিনি তাঁকে দাবিয়ে রাখতে চান। নরেন্দ্র মোটেই সেই পাত্র নন, খাপখোলা তরোয়াল। জামাই এক ফন্দি করলেন। ছেলেদের দিয়ে তার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ করালেন। ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাশের *(বর্তমান দশম ও নবম শ্রেণী)* ছেলেরা লিখলে, তিনি পড়াতে পারেন না ভাল। বিদ্যাসাগর মশায় আমাকে বললেন, 'তা হলে নরেন্দ্রকে বলো আর না আসে। দরকার হবে না।' এই কথা শুনে আমাদের মাথা ঘুরে গেল। যদি বা বহু কষ্টে একটি কর্ম জোগাড় হল, একি বিপদ আবার উপস্থিত! নরেন্দ্রকে বললাম। এই কথা শুনে নরেন্দ্র বলেছিলেন, 'কেন ঐরূপ বললে ছেলেরা, আমি তো বাড়ি থেকে খুব তৈরী হয়ে গিয়ে পড়াতাম।' আর কিছু বললেন না। না আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন, না অপরের দোষারোপ করলেন। কোনও কৈফিয়ৎ দিলেন না। তাও আবার অতি coolly (শান্তভাবে) বললেন এই কথা। Noble soul, মহাপুরুষ। দেখ, যিনি জগতকে শিক্ষা দিবেন তিনি ছেলেদের পড়াতে পারেন না। কি অপবাদ! কি আশ্চর্য! ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষ কি করে বুঝবে? তাঁকে এনেছেন বড় কাজের জন্য। বিপদে ফেলে অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিয়ে নির্মল করে তবে কাজে লাগালেন। জগতকে শিক্ষা দিলেন তখন জগতের লোক শুনে স্তম্ভিত হল। জগতের বহির্মুখী চিন্তাধারাকে যেন মুচড়ে দিয়ে মোড় ফিরিয়ে দিলেন ভিতরের দিকে। পাশ্চাত্যকে বললেন, সাবধান, তোমরা ধ্বংসের মুখে বসে আছ। সাবধান হও, নইলে সব যাবে। বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে সমগ্র জগতকে কুক্ষীগত করে রেখেছ, কিন্তু নিজের soul-কে হারিয়ে ফেলেছো। 'ye are divinities — অমৃতস্য পুত্রাঃ' তোমরা এটা ভুলে গিয়েছ। জাগ্রত হও, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন কর। তাঁর সন্তান মানুষ — এ মহাসত্যের উপর সভ্যতা স্থাপন কর তবেই কল্যাণ।

শ্রীম কিছুকাল চুপ রহিলেন। পুনরায় কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — আর একবার চাকরীর জন্য সিমলা থেকে বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত গেলেন একজনের পিছু পিছু। তারপর বললেন, ‘না আপনাকে আর যেতে হবে না’। Noble soul, উমেদারীতে যেতে রাজী নন্।

স্বামীজী বরানগর মঠে থাকতেন। আবার মাঝে মাঝে বাড়িতেও আসতেন। তখন বাড়ির এঁরা তাঁকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হতেন। তিনি বলতেন, ‘আমি খেয়ে এসেছি’। এদিকে কিন্তু উপোস। পাছে বাড়ির লোকেরা তাঁদের সামান্য খাদ্য তাঁকে খাইয়ে দেন তাই এই কথা বলতেন। কত রাত কলকাতার রাস্তার পাশের বাড়ির রোয়াকে বসে কাটিয়ে দিয়েছেন ঐ সময়। অত সব দুঃখকষ্ট নিজের জীবনে দেখেছেন। তবেই সেবাশ্রমগুলি করেছেন। দারিদ্র্য দুঃখ কত বড় দুঃখ তা তাঁর জীবনে পূর্ণভাবে অনুভব করেছেন। তাই চিরকাল, দরিদ্রের উপর দয়াবান ছিলেন। আমেরিকা থেকে আসার পর তাই বলতেন, যারা দুঃখকষ্টে পড়ে নাই তারা যে babies (শিশু)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করলে তবে তো হৃদয়ে বল আসবে। স্বামীজীর জীবন-চরিত সকলের পড়া উচিত, তবে মানুষ হবে। বিশেষ করে যুবকদের পড়া উচিত। তা হলে হৃদয়ে দৃঢ়তা আসবে, ভগবানে বিশ্বাস আসবে। এই সংসার দুঃখ সাগর। তাতে সব জীব ডুবে আছে। বলছে বেশ আছি। হুঁশ নাই। যার হুঁশ হয়েছে, যে বুঝতে পারছে এই দুঃখ, সে-ই মাথা উঁচু করে থাকতে পারে এখানে। এমন করে সোজা হয়ে। সে-ই মানুষ।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — মহাপুরুষগণের লক্ষণ, — ‘দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ’ (গীতা ২/৫৬)। তাঁদের মন সুখদুঃখের পারে থাকে, চির সুখে। কিন্তু সুখদুঃখময় সংসারে থেকে কাজ করেন। তাঁদের দেখে অপরে সাহস পায়। তারা ‘অসঙ্গশস্ত্রেন’ (গীতা ১৫/৩) অশ্বত্থরূপ সংসার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেন। এ অবস্থা কেবল অবতারাদির হয়।

মহাপুরুষগণ, ‘জিতসঙ্গদোষাঃ’ (গীতা ১৫/৫)। সঙ্গের দোষ এঁদের

স্পর্শ করতে পারে না। যে সঙ্গে থাকা যায় তার দোষগুণ আসে। কিন্তু অবতারাদি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা সঙ্গদোষে দুষ্ট হন না। দেখুন না, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বোঝা বোঝা প্রেম ঢাললেন। মথুরায় চলে গেলেন যখন, তখন যেন কিছুই হয় নাই, নূতন মানুষ। মন নির্লেপ। তারপর দ্বারকায় যদুবংশীয়দের রাজা করলেন। আবার ধর্মসংস্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে যাতায়াত করছেন। যুদ্ধবিগ্রহ কুরুক্ষেত্রে কত কি করলেন, কিন্তু মনে দাগ নাই। একেবারে নূতন মানুষ। এইটি, 'জিতসঙ্গদোষ'।

যেখানে যাচ্ছেন সকলে মনে করছে আমাদের লোক। কিন্তু বস্তুতঃ কারো নন। কেন? তিনি যে 'অধ্যাত্মনিত্যাঃ' (গীতা ১৫/৫)। স্ব-স্বরূপে সর্বদা অবস্থিত। তিনি জানেন মানুষ-দৃষ্টিতে তিনি কারো নন, আত্মদৃষ্টিতে সকলের অন্তরাত্মা।

মনে রোখ্ চাই। বিপদ টিপদ তো আছেই। পূর্ব থেকে তার জন্য prepared (প্রস্তুত) থাকতে হয়। অত সব করলেন যদু বংশীয়দের নিয়ে, আবার দেখ প্রভাসলীলা। নিজের চক্ষুর সম্মুখে সমগ্র যদুবংশ ধ্বংস হল। তিনি এমন করে (দুই বগলে দুই হাত রেখে) দাঁড়িয়ে দেখলেন, সাক্ষীস্বরূপ। সংসার বিষাদময় এটা জেনে সংসারে যাও।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' — দুর্বলের স্থান নাই এই সংসার যুদ্ধক্ষেত্রে। বীরগণ কেবল বেঁচে থাকতে পারে এখানে — আত্মরতি বীরগণ। তাই মনকে অবসন্ন হতে দিতে নাই। অবসন্ন হয়ে পড়লে তখন রোখ্ করে বলতে হয়, আমি আত্মার অংশ, সন্তান। সর্বদা এই সজাগ দৃষ্টি থাকবে — আমি জগদীশ্বরের সন্তান, সচ্চিদানন্দের অংশ, আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, শান্তি ও প্রেমরূপ। রণক্ষেত্রে যেন বীর heart within and God overhead! — ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাসবান।

সাধারণ লোককে 'সঙ্গদোষ' রগুিয়ে দেয়। সঙ্গীর গোলাম হয়ে যায়।

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥' (গীতা২/৬২/৬৩)

বিষয়ীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়। না পেলে হয় ক্রোধ। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন আসে সম্মোহ। এই সময় গুরু শাস্ত্রবাক্য সব ভুল হয়ে যায়। তাতেই আসে দুর্বুদ্ধি আর তাতেই পতন। পতন মানে কি? না, 'আমি কর্তা' এই বুদ্ধি। আর উত্থান মানে কি? না, আমি সর্বশক্তিমানের সন্তান। আমি অকর্তা, ঈশ্বর কর্তা, এই জ্ঞান যার হয় সেই বুদ্ধিমান ঠিক ঠিক। বাকী সব বুদ্ধিহীন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — উঠুন, আপনি উঠুন। গাড়ীর সময় হয়ে এলো।

শ্রীম-র প্রাণস্পর্শী কথামৃত পান করিয়া যুবকের সব ভুল হইয়া গেল। পনর মিনিট অতীত হইল তথাপি উঠিতেছে না। পুনরায় শ্রীম বলিলেন, উঠুন, উঠুন, আবার খেতে হবে। (সকলের প্রতি) উনি আজ দেশে যাবেন — একটু বেড়িয়ে আসছেন।

প্রমত্তের মত যুবক উঠিলেন। শ্রীম-র পাদস্পর্শ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। যুবকের মন যেন কে হরণ করিয়া নিয়াছে। যন্ত্রচালিতের মত চলিলেন, সঙ্গে গেল বিনয় ও ছোট জিতেন।

ট্রেন চলিতেছে। ট্রেনে বসিয়া যুবক ভাবিতেছেন, 'আজের সব কথা যে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন। স্বামীজীকে আদর্শ করে ধরলেন। সঙ্গদোষ যেন স্পর্শ না করে। আমি তাঁর ছেলে সচ্চিদানন্দের অংশ, একথা না ভুলে যাই। সুখদুঃখ সংসারে থাকতে গেলে হবেই, তবে তার জন্য পূর্ব থেকে তৈরী হয়ে থাকা চাই। তাঁর নামে মাথা উঁচু করে চলা। স্মরণ রাখা 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' (মুণ্ডক ৩/২/৪)। আর কর্মক্ষেত্রে 'জিতসঙ্গদোষাঃ' 'অধ্যাত্মনিত্যাঃ' — এই আদর্শ দিলেন। গাড়ী চলিতেছে — যুবকের মনও চলিতেছে — চলিতে চলিতে এক স্থানে যাইয়া স্থির হইল। 'আমি ঈশ্বরের পুত্র' এই মহাসত্যটিকে বাস্তব করিতে হইবে।

২৩শে অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই কার্তিক, ১৩৩০ সাল।
মঙ্গলবার, শুক্লা চতুর্দশী।

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরে দোল যাত্রার দিনে শ্রীম

১

কালীঘাট, আদি গঙ্গার তট। গদাধর আশ্রম। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। পূর্বাকাশ ঈষদালোকিত। শ্রীম গদাধর আশ্রমের ছাদে বসিয়া আছেন। এখানে মাসাধিক কাল তন্ত্রমতে দেবীপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। পূজা ও হবন্ চলিতেছে। সিন্দুর রঞ্জিত একটি বড় ত্রিশূল ঘটের পার্শ্বে স্থাপিত। এই ঘটেই পূজা হয়। প্রধান পুরোহিত স্বামী কমলেশ্বরানন্দ। ইনি এই আশ্রমের মহন্ত। কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারীও বসিয়া পূজা দর্শন করিতেছেন। অদূরে কালীঘাটের মন্দিরের দিক হইতে শঙ্খঘন্টার ধ্বনি আসিতেছে — মঙ্গল আরতি হইতেছে।

আজ ১লা ডিসেম্বর ১৯২৩ খৃঃ, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল, রবিবার।

শ্রীম কিছুকাল থেকে গদাধর আশ্রমে থাকেন। মাঝে মাঝে মর্টন স্কুলেও যান। ঠাকুরের ভক্তগণ যাঁরা সর্বদা তাঁর কাছে যাতায়াত করেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে আসিয়া কখনও রাত্রিবাস করিতেছেন। আজ জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেন, প্রভৃতি আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শাখা গদাধর আশ্রম আদি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। তাই এই ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান; যাত্রীদের যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। কেউ কেউ 'রাম রাম', কেহ 'রাধে কৃষ্ণ' কেহ 'মা গঙ্গে', কেহ 'জয় মা কালী' উচ্চারণ করিতেছেন। কেহ বা গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে আবৃত্তি করিয়া চলিতেছে। কেহ মধুর স্বরে গান করিতেছে। অত শীত কিন্তু গ্রাহ্য নাই — ধর্মের উন্মাদনা কত প্রবল!

হোমকুণ্ডের সম্মুখে শ্রীম উপবিষ্ট। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতেছেন। এই পবিত্র সময়ে আহুতি

মন্ত্রের শেষাংশ 'স্বাহা' বারবার সমস্বরে উচ্চারিত হইতেছে — কি মধুর পবিত্র প্রভাব বিস্তার করিতেছে সাধু ব্রহ্মচারীদের হৃদয়ে। স্থানটি মধুময় সময়টি মধুময় — মধুময় সাধকগণের হৃদয়। এইবার স্তব পাঠ করিয়া পূজা শেষ করিতেছেন ঃ —

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রং।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

(শ্রীশঙ্করাচার্য : ভবান্যষ্টকম্)

সকাল সাতটা। গদাধর আশ্রমের ভজনমণ্ডলী এখন দক্ষিণেশ্বর যাইতেছে। সেখানে মা ভবতারিণীকে শ্যামা নাম শুনাইবে। রামনাম কীর্তনের মত শ্যামা নাম কীর্তন ভক্তগণ রচনা করিয়াছেন। রামনামের মতই শ্রুতিমধুর ও ভক্তিপূর্ণ। ভক্তগণের আজ অবসর।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির এখন শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সেবাধীন। তিনি অতি সাগ্রহে মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, মাকে শ্যামানাম শুনাইতে। সাধু ও ভক্ত মিলিয়া পঞ্চান্ন জন হইল। শ্রীম বিনয়, জগবন্ধু, জিতেন প্রভৃতি ভক্তগণকেও এই সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, 'সুবিধা হ'লে খেয়ে দেয়ে একবার চেষ্টা করবো যেতে।'

স্বামী গিরিজানন্দ দলপতি। তিনি সকলকে লইয়া ট্রামে চড়িয়া বড়বাজার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে জাহাজে আরোহণ করিয়া শিবতলা পৌঁছিলেন। সেখান থেকে পদব্রজে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সকলে উপস্থিত হইলেন।

বেলুড় মঠ হইতে বহু সাধু ও ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন স্বামী ধীরানন্দের সহিত।

নাটমন্দিরে মায়ের সম্মুখে কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। সকলে গাহিতেছেন। পরিচালক সনৎ।

দশটায় আরম্ভ হইয়া ১২টায় শেষ হইল শ্যামানাম কীর্তন। কি জমজমাট ভাব! অতদিন যেন কালীবাড়ি তমোমেঘাবৃত ছিল। আজিকার কীর্তনে ও সাধুভক্তসমাগমে যেন মেঘের আড়াল হইতে মায়ের আনন্দরশ্মি বিচ্ছুরিত হইল। আর উহা ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়বিহারীকে স্পর্শ করিল। কি আনন্দ! দক্ষিণেশ্বর মন্দির আজ আনন্দমুখর।

সাধু ও ভক্তগণের আনন্দ আজ সর্বত্র। গঙ্গাস্নান করিতে করিতে কেহ সাঁতার কাটিতেছেন, কেহ আবার গায়ে জল ছিটাইতেছেন। কেহ বা অপরকে টানিয়া নিয়া জলে ফেলিয়া দিতেছেন।

একটার পর মায়ের প্রসাদ পাইতে সকলে বসিয়াছেন। আয়োজন করার কথা ছিল চল্লিশ জনের কিন্তু প্রসাদ পাইলেন বিরাশী জন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় আর স্বামী ধীরানন্দের সুব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানে সকলে পরম পরিতৃপ্তির সহিত পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইলেন।

বহুকাল পর আজ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের এই আনন্দোৎসব। শ্রীশ্রীঠাকুরের সময় কখনও এরূপ আনন্দোৎসব হইত। তারপর অনেক কাল আর তাহা হয় নাই। এখন ভক্তের হাতে সেবার ভার আসায় আবার আরম্ভ হইয়াছে।

আজ গ্রামের বহুলোক আসিয়াছে। আর রবিবারের দর্শকভক্তও বহু। দক্ষিণেশ্বর আজ আনন্দময়।

আহারান্তে সাধুভক্তগণ বিস্তৃত কালীবাড়ির নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন। কেহ নাটমন্দিরে বিশ্রাম করিতেছেন। কেহ পঞ্চবটীতলে বসিয়া আছে, কেহ বিল্বতলে। আবার কেহ গঙ্গার ঘাটে। মর্টন স্কুলের ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আনন্দ করিতেছেন। উত্তরের দরজা খোলা।

ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন মাতৃপীঠ নহবতখানার নিম্নতলের মায়ের গৃহ হইতে শ্রীম বাহির হইতেছেন। তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা নাই। সকলেই দৌড়িয়া গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। এখন বেলা আড়াইটা। তিনি আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সকলের প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে তো? আসুন, প্রদক্ষিণ করা যাক্।'

শ্রীম-র আগমন সংবাদ পাইয়া বহু সাধু ভক্ত একত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে স্বামী ধীরানন্দ, গোপালানন্দ, উমেশ পুরী, নীলকণ্ঠ মহারাজ প্রভৃতি সাধুগণ, আর জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেন, বড় অমূল্য প্রভৃতি মর্টন স্কুলের ভক্তগণ।

শ্রীম বকুলতলার ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া গঙ্গাদর্শন করিলেন। তারপর ভূমিষ্ট হইয়া চাতালের মধ্যস্থলে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, 'এইখানে ঠাকুরের মায়ের অন্তর্জলী হয়। এইখানেই ঠাকুর গর্ভধারিণীর চরণ ধরিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'মা, তুমি কে-গো আমায় গর্ভে ধারণ করেছো!' নিজেকে নিজে জানতেন কিনা — অবতার। তাই বিস্ময়ানন্দে বলতেন, 'তুমি সাধারণ মা নও।'

কখনও কখনও পঞ্চবটী, ঝাউতলা যাতায়াতের সময় এখানে দাঁড়িয়ে ঠাকুর গঙ্গাদর্শন করতেন। আমাদের মা ঠাকুরুণ নিত্য এই ঘাটে গঙ্গা স্নান করতেন রাত তিনটার সময়।'

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ হস্তরোপিত পঞ্চবটীমূলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছেন। উঠিয়া, পুরাতন বটবেদিকার দক্ষিণ সোপান শ্রেণীর দ্বিতীয় সোপানে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, তারপর বেদিকা পরিক্রমা করিতেছেন। এই সোপানে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ রক্ষা করিয়া কেশবের সঙ্গে বসিয়া কথা কহিয়াছিলেন। বেদিকার দক্ষিণ দিকের মধ্যস্থলে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন। এখানেও একদিন শ্রীপদ রক্ষা করিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়াছিলেন।

শ্রীম পঞ্চবটীস্থ ঠাকুরের ধ্যান কুটীর প্রদক্ষিণ করিতেছেন। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকস্থ বাতায়নের মধ্য দিয়া গৃহাভ্যন্তর দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঘরে শিবমূর্তি আছে। তারপর বারান্দায় আসিয়া দরজার চৌকাঠে হস্ত রাখিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ রোপিত মাধবী লতিকাকে যুক্ত করে স্পর্শ, প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া ঝাউতলার দিকে অগ্রসর হইলেন। বহুলোক অনুগমন করিতেছে।

আজকাল ঝাউতলার জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। গঙ্গার দিকে ঝাউতলার রাস্তায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ঝাউতলার মধ্য দিয়া সোজা বিল্বতলে আসিতেছেন। পূর্বমুখী হইয়া চলিতেছেন — পেছনে

গঙ্গা সম্মুখে অদূরে বিল্বতল। এখানে রাস্তা নাই। সম্প্রতি জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। ভূমি কণ্টকাকীর্ণ। শ্রীম নগ্ন-পদে চলিতেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের ছিন্ন মূল সকল সূচিকাবৎ তীক্ষ্ণ আর ঊর্ধ্বমুখ। শ্রীম ভাবস্থ হইয়া চলিতেছেন। প্রায় মধ্যস্থলে গিয়া আর চলিতে পারিতেছেন না। পদতলে কন্টক বিদ্ধ হইয়াছে। জগবন্ধু প্রভৃতি সঙ্গে। তাঁহারা পায়ের কণ্টক বাহির করিয়া দিতেছেন। তিনি একজনের স্কন্ধ ধারণ করিয়া আছেন। দুইজনের, জগবন্ধু ও ছোট জিতেনের, স্কন্ধে ভর করিয়া অনেক কষ্টে বিল্বতলার রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন।

বিল্বতলে শ্রীম। পশ্চিমদিক হইতে বেদির উপর হামাগুড়ি দিয়া বিল্ববৃক্ষ স্পর্শ ও প্রণাম করিলেন। বেদিকা পরিক্রমা করিতেছেন। বেদিকার পূর্বদিকে আসিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। এইখানে একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বিল্বমূলে পূর্বমুখী ধ্যানরত শ্রীমকে দেখিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর, শ্রীম চক্ষু মেলিয়া অন্তরের নিধি ধ্যেয় মূর্তিকে সশরীরে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার পায়ে গিয়া প্রেমোন্মাদনায় বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজ চল্লিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, তথাপি যখনই এখানে আসেন এইরূপ ভাববিহ্বল হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন।

ইংরেজী-পড়া ভক্তগণ কেহ কেহ ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য বস্তু লাভ করিয়াছেন ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে! আধুনিক শিক্ষা, সভ্যতা ও ভব্যতার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, 'ইংলিশম্যান' শ্রীম একি করিতেছেন! পরম ধনকে হৃদয়ে জাগ্রত জীবন্ত লাভ করিলে বুঝি মানুষ, অষ্টপাশ হইতে আপনি বিমুক্ত হইয়া যায় — যেমন সর্প ত্বক্ বিমুক্ত হয়।

এক্ষণে শ্রীম বেদিকায় উত্তর দিক হইতে আরোহণ করিয়া বসিয়াছেন, দাক্ষিণাস্য — সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ। কিছুকাল ধ্যান করিয়া পুনরায় প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া হাঁসপুকুরের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন — পশ্চিমাস্য। সম্মুখে হাঁসপুকুর, তারপর পুরাতন বটবৃক্ষ ও পঞ্চবটী, তারপর পতিতপাবনী সুরধুনী। তৎপর পূর্বমুখ হইয়া পানাপুকুরে গমন করিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া হাঁসপুকুরের দক্ষিণ তীরের

ঘাটে উপস্থিত। ঘাটের উপর চত্বর ইষ্টক নির্মিত। আর তিন দিকে বসিবার আসন আছে ঐ ইষ্টকের। শ্রীম ঐ উচ্চাসনে বসিলেন না। বসিলেন, চত্বরের মধ্যস্থলের একটু বাম হাতে। শ্রীম-র পদযুগল নিম্নে প্রথম সোপানের মধ্যস্থলে। দৃষ্টি প্রসন্ন গম্ভীর — মন যেন কোন্ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে বসিয়া রহিলেন। এইবার প্রেমবিজড়িত সুস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন — (চত্বরের উত্তর প্রান্তের মধ্যস্থল, শ্রীম ডান হাতে উহা দেখাইয়া) এইখানে একদিন ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন, স্বামীজী পুকুর হ'তে গাড়ুতে করে জল তুলে আনলেন। পায়খানায় যাবেন ঠাকুর। তখন নরেন্দ্রের বয়স আঠার উনিশ বছর। নূতন আনাগোনা করছেন। এইটিন এইটিটুর মার্চ। নরেন্দ্রকে বলিলেন, দেখ নূতন প্রেম হলে খুব আনাগোনা করতে হয় প্রথম প্রথম। তারপর না হয় দেরী করে এলেও হয়। প্রথম প্রথম সময় কাটে না প্রেমিক প্রেমিকার, একজন আর একজনকে না দেখলে। মেয়েমানুষদের ভালবাসার কথার দৃষ্টান্ত দিয়ে ঐ কথা বলেছিলেন। ফরটিটু ইয়ারস্ (৪২ বৎসর) হয়ে গেল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কাল হয়ে গেল বুঝি।

কুঠীতে শ্রীম। হাঁসপুকুর থেকে সোজা রাস্তা ধরিয়া আসিয়া এখানে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গার দিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন, "এখানে ষোল বছর ছিলেন ঠাকুর। অক্ষয়ের মৃত্যুর পর ঐখানে গেলেন, এখন সেটি ঠাকুর ঘর। ঠাকুরের মা শোকে আর এই ঘরে থাকতে চাইলেন না। তাই ঐখানে গেলেন।"

এইবার ঢুকিলেন কালী বাড়ির অঙ্গনে, উত্তরের সদর দরজা দিয়া। যুক্তকরে সকল দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া রাধাকান্তের মন্দিরে আরোহন করিতেছেন। রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তারপর চরণামৃত লইয়া নিম্নে নামিয়া আসিলেন। আবার প্রণাম — অঙ্গনে, উত্তরাস্য, রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সর্বনিম্ন সিঁড়ির নিচে মধ্যস্থলে। বলিলেন, "কেশব সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে থাকলে, ঠাকুর এইরূপ প্রণাম করতেন, লোকশিক্ষার জন্য।"

একটি ভক্ত মন্দিরের রোয়াকে আরোহন করিয়াছেন। শ্রীম নিম্নে দাঁড়াইয়া গঙ্গাজল হাতে লইতেছেন। টব হইতে ভক্ত দিতেছেন। হাত শুদ্ধ করিয়া এইবার মা কালীর মন্দিরের দিকে যাইতেছেন।

মা কালীর মন্দির। শ্রীম ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন বারান্দায়, দেবীকে ডান হাতে রাখিয়া গলবস্ত্রে। তারপর উঠিয়া গিয়া দরজার পশ্চিমের পার্শ্বে উত্তরাস্য ধ্যান করিতেছেন। কিছুকাল পরে মাকে একটি টাকা প্রণামী দিলেন। আর নকুল আসিয়া বলিলেন, 'জেঠামশায়, মায়ের চরণামৃত নিন। আর সিন্দুর।' এই বলিয়া কপালে সিন্দুরের তিলক পরাইয়া দিয়া হাতে চরণামৃত দিলেন।

নাটমন্দিরে শ্রীম। বেলা তিনটা হইতে পুনরায় কীর্তন চলিতেছে। শ্রীম প্রথমবার কীর্তন শুনিতে পান নাই। তাই দ্বিতীয়বার তাঁহাকে শোনাবার জন্য এই কীর্তন। তিনি একটি স্তম্ভমূলে বসিলেন, যেন ঠাকুরের পদতলে আশ্রয় লইলেন। এই স্তম্ভটি, মার মন্দিরের দরজা পেছনে রাখিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলে পূর্ব-পশ্চিম দ্বিতীয় সারির দক্ষিণ হস্তের প্রথম স্তম্ভ। একবার এই নাটমন্দিরে যাত্রাগান হইতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবে আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবেশে এই স্তম্ভটিকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীম দক্ষিণেশ্বর আসিলে এই স্তম্ভটিকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করেন। আজও তাই করিয়া তার পদমূলে উপবিষ্ট। ভজন শেষ হইল সাড়ে চারটার পর। এইবার সাধুভক্তগণ কেহ বেলুড় মঠে, কেহ কলিকাতা, কেহ ভবানীপুর রওনা হইতেছেন। কেহ বা রহিয়া গেলেন আরতি দর্শন করিবেন।

শ্রীম পুনরায় কালী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রণাম করিয়া পুনরায় মায়ের সামনে বসিয়াছেন। কতবার ঠাকুর মায়ের সামনে বসাইয়া ভক্তদের ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। এইখানেই নরেন্দ্রনাথ তিনবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন — 'মা, জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য দাও।' কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইল না — "মা, অন্ন বস্ত্র দাও, অর্থ দাও' — দারুণ কষ্টেও। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা কি বিফল হইতে পারে?

ডাক্তার কার্তিকবাবু অনেক সন্দেশ আনিয়াছেন। মায়ের ভোগ

দেবার পর ভক্তগণ উহা আনন্দে গ্রহণ করিতেছেন। প্রসাদ হাতে করিয়া শ্রীম-সঙ্গে ভক্তগণ বাসন মাজার ঘাটে দাঁড়াইয়া প্রসাদ খাইতেছেন।

মায়ের মন্দিরের সম্মুখে চত্বরে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইলেন। মাকে দেখিতেছেন যুক্ত করে। তারপর বসিয়া পড়িলেন। ডান হাতের আসনটিতে কারুকে বসিতে দিলেন না খালি রাখিলেন। বলিতেছেন "একদিন ঠাকুর এখানে বসেছিলেন। আর একটি ভক্ত (শ্রীম) এখানে (শ্রীম-র বসার স্থানে)। ঠাকুর গান গাহিতেছিলেন, 'ভবদারা ভয়হরা নাম নিয়েছি তোমার।' এই গানটি গাহিয়া ঠাকুর ভক্তকে মায়ের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলেন।" তাই দক্ষিণেশ্বরের এ স্থানও শ্রীম-র অতি প্রণম্য।

শ্রীযুক্ত রামলাল দাদা আসিয়া মন্দিরের গঙ্গার দিকের দরজা খুলিয়া দিলেন। বারান্দার দরজাও খোলা। পশ্চিমের সূর্যকিরণ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মায়ের মূর্তিকে যেন জীবন্ত ও ঝলমল্ করিয়া তুলিয়াছে। কি সুন্দর দর্শন! ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের কন্যাকুমারীর মন্দিরেও উদীয়মান সূর্যের কিরণরশ্মি প্রবেশ করিয়া মাকে এক অপরূপ রূপে মণ্ডিত ও প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। ভক্তগণ এখানে দেখিতেছেন নানা পুষ্প ও অলঙ্কারে ভূষিতা ভবতারিণী ভবকে ত্রাণ করিবার জন্য জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীম-র অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইল। এতদিন অপর লোকের হাতে সেবা থাকায় সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। শ্রীশ্রী ঠাকুর এইরূপ পশ্চিমের দরজা খুলিয়া দিয়া মাকে গঙ্গাদর্শন করাইতেন।

শ্রীম চাঁদনীতে দাঁড়াইয়া আছেন, পাশে স্বামী ধীরানন্দ। অল্পক্ষণ পরে গঙ্গাস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন ঘাটে, সঙ্গে অমূল্য, বিনয় ও জগবন্ধু। ঘাটে বহু যাত্রী-নৌকা। বাবুরা কেহ কেহ মেয়ে-মানুষদের লইয়া আসিয়াছেন — গান বাজনা, রঙ্গরস করিতেছেন। মা তো সকলেরই মা।

শ্রীম ঠাকুরঘরে গোলবারান্দা দিয়া প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যা প্রদক্ষিণ করিতেছেন। অগ্রে শ্রীম, তাঁর পশ্চাৎ স্বামী ধীরানন্দ,

ডাক্তার, বিনয়, বড় অমূল্য, ভোলানাথ ও জগবন্ধু পর পর চলিতেছেন। শ্রীম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বড় খাটটির পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে গদীর নিচে হস্ত প্রবেশ করিয়া সেই হস্ত ললাটে লাগাইলেন। তারপর ছোট খাট। পূর্ব দিকে দাঁড়াইয়া, পশ্চিমাস্য হইয়া ঠিক মধ্যস্থলে শয্যাপ্রান্তে মস্তক সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর থাকতে এই খাটে বসা থাকিলে এইরূপ প্রণাম করিতেন।

গৃহে রামলাল দাদা দাঁড়াইয়া সব দর্শন করিতেছেন। প্রণাম শেষ হইলে তিনি শ্রীমকে প্রসাদ দিলেন। ভক্তগণও গোলবারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রসাদ পাইতেছেন।

এইবার বিদায়ের পালা। শ্রীম ঠাকুরঘরের উত্তরের দরজা দিয়া বাহির হইতেছেন। সদর দেউড়ীর দিকে যাইতেছেন — ফটকের বাহিরে ডাক্তারবাবুর গাড়ী রহিয়াছে তাহাতে উঠিবেন। অগ্রে শ্রীম, তারপর ভোলানাথ, বিনয়, জগবন্ধু, বড় অমূল্য ও ডাক্তার। শ্রীম ডাক্তার ও বিনয়কে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। বলিলেন, 'আপনারা স্টীমারে যান কেউ কেউ। ঠাকুর বলতেন, 'ঘোড়ার কষ্ট হয়।' শ্রীম গদাধর আশ্রম ভবানীপুর যাইতেছেন।

শিবতলায় স্টীমারে প্রায় একশত সাধু ও ভক্ত উঠিয়াছেন। আনন্দে সকলে পুনরায় কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন। গঙ্গার উপর দিয়া স্টীমার চলিতেছে কলিকাতা অভিমুখে। নবযুগের নবভাবপ্রবাহের মুখ্যকেন্দ্র বেলুড় মঠ ঐ দেখা যাইতেছে — গঙ্গার পশ্চিমকূলে। আর পূর্বতটে শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতার-লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর।

২

বসন্ত প্রভাত। মর্টনের চারতলার ছাদ। শ্রীম মাদুরে বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য ছাদের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। সম্মুখে অপর মাদুরে বিনয়, জগবন্ধু ও ছোট অমূল্য। সূর্য উঠিতেছে।

আজ দোলযাত্রা। শ্রীম গীতা পড়িতেছেন। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে করিয়া শুনাইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মৃত্যুর সময় যে যা স্মরণ করে মরে,

সে তাই হয়। তার জন্যই অভ্যাস করতে হয় যাতে মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা হয়। 'মামনুস্মর যুধ্য চ' (গীতা ৮/৭), মানে নিজের কর্তব্য কর্ম করা। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণও রেখো আমাকে, মানে ঈশ্বরকে। আগে কর্ম পরে স্মরণ নয়। আগে স্মরণ পরে কর্ম। আর কর্মের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে স্মরণ। কর্ম শেষ হয়ে গেলে সম্পূর্ণ মন দিয়ে আমায় স্মরণ করবে।

ঠাকুর তাই বলতেন, ঘটি রোজ মাজতে হয়। অভ্যাস যোগ। অজ্ঞানান্ধকারের পারের যে জ্যোতির্ময় পুরুষ অর্থাৎ ভগবান, তাঁকে ভাবতে ভাবতে যদি প্রাণ যায় তা হলে তাঁকেই লাভ হয়। তার জন্যই শরীর ত্যাগের পূর্বেই প্রস্তুত হতে হয়।

সর্বদ্বারাণি, অর্থাৎ যা দিয়ে রূপরসগন্ধাদি আসছে সেই ইন্দ্রিয়সমুহ মনে লয় করা। মনকে হৃদয় বিহারী শ্রীভগবানে নিবদ্ধ করা। আর প্রাণকে মানে প্রাণবায়ুকে (অঙ্গুলি দ্বারা ভ্রূমধ্য দেখাইয়া) এখানে কপালে স্থাপন করতে হয় মৃত্যুর সময়।

(ভগবান) বলছেন যে অনন্যরূপ হয়ে আমার চিন্তা করে, তার হয় ঈশ্বর দর্শন। আমার নাম করতে করতে যে দেহত্যাগ করে তার আর আসতে হয় না। তা ছাড়া সকলেরই পুনর্জন্ম নিতে হয় — ব্রহ্মলোক থোক আরম্ভ করে সকল লোকের অধিবাসীদের। কিন্তু যে আমাকে লাভ করে তার আর জন্ম হয় না।

ব্রহ্মার যখন রাত্রি তখন সব লয় হয়। যখন দিন তখন সকলের পুনঃপ্রকাশ হয়।

অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, মায়া — তারপর যে সনাতন পুরুষ তিনিই কেবল থাকেন আর সবের লোপ হয়ে যায়। যাঁকে বেদে 'অব্যক্ত', 'অক্ষর' বলা হয়েছে তাঁকেই শ্রীকৃষ্ণ পরমাগতি বলছেন। অনন্যা ভক্তিতে কেবল ঐ পুরুষকে পাওয়া যায়।

কি কালে মৃত্যু হলে আসতে হয়, কি কালে মৃত্যু হলে আসতে হয় না, তা শুন (অর্জুন)। উত্তরায়ণরূপ যে ছ'টি মাস, এ সময় মৃত্যু হলে আর আসতে হয় না। কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন ছয় মাসে যদি কেউ মারা যায় সেই যোগীকে ফিরে আসতে হবে অর্থাৎ তার

পুনর্জন্ম হবে।

এইতো এই রকম হলে এই রকম হয় বলা হলো। এখন উপায়? তাও বলছেন 'যোগী হও'। যিনি সংসারের কোন ভোগ চান না — স্বর্গাদিও না, তিনি যোগী। যোগীর এক লক্ষ্য — ঈশ্বর। অন্য কোনও দিকে মন নাই। এইটিতে যদি রুচি জন্মে তা হলে আর যোগীর কিছুতেই ভুল হয় না। স্বর্গাদি তুচ্ছ তাঁর কাছে। এরূপ যোগী নারায়ণের স্থান প্রাপ্ত হন।

শ্রীম চারতলায় নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পশ্চিমের জানালা দিয়া নিম্নে আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে লোক চলাচল দেখিতেছেন। আবার দক্ষিণের জানালায় মুখ বাড়াইয়া নিচের মুচি-পল্লীর ভজন গান শুনিতেছেন।

এইবার নিজের শয়ন-খাটে আসিয়া বসিলেন — উত্তরাস্য। শ্রীম-র পশ্চাতে ছোট অমূল্য বেঞ্চেতে বসিয়াছেন। বিনয় মেজেতে আসনে শ্রীম-র বাঁ হাতে, পূর্বাস্য বসা। জগবন্ধু পাশেই তাঁহার ঘরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিতেই শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন, আজ দোলযাত্রা। একটু 'কথামৃত পড়ুন'। শ্রীম ২য় ভাগ ২৩ খণ্ড বাহির করিয়া দিলেন। 'দোলযাত্রা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে'।

পাঠক পড়িলেন (শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন) — ভক্তির 'আমি', বিদ্যার 'আমি', বালকের 'আমি' — এতে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন।... হাজার বিচার কর আমি যায় না। আমিরূপ কুম্ভ। ব্রহ্ম যেমন সমুদ্র, জলে জল। কুম্ভের ভিতর বাহিরে জল। জলে জল। তবুও কুম্ভ তো আছে। ঐটি ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণে কুম্ভ আছে 'আমি তুমি' আছে। তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত। তুমি প্রভু, আমি দাস। এও আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়বার যো নাই। কুম্ভ না থাকলে তখন সে এক কথা।

শ্রীম — এর নাম প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত। সমাধিস্থ হয়ে তো সর্বদা থাকা যায় না। তাই নিচে এলে একটা ভাব নিয়ে থাকতে হয়। একটা জীবন্ত ভাব থাকা দরকার। সাকার নিরাকার দর্শনের পর পাকা ভাব হয়। সাধন অবস্থায় কখনও এদিক ওদিক হয়।

শুকদেবের ‘বিদ্যার আমি’ ছিল। প্রহ্লাদ, হনুমান এঁদের ‘দাস আমি’ ছিল। ঠাকুরের ‘বালকের আমি’ — তুমি মা, আমি ছেলে। মা বই কিছুই জানতেন না। সর্বদা প্রার্থনা, ‘মা তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।’ শয়নে, স্বপনে ‘মা’। ঘুমুচ্ছেন, ঘুম তো খুব সামান্য ছিল, এর ভিতরই মা মা করে উঠছেন। যেমন মায়ের কোলের শিশু — মা ছাড়া থাকতে পারে না। হাত ভেঙ্গে গেছে, বলছেন, মা বড্ড লাগছে। কিন্তু আরাম করে দাও একথা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। আহা, কি অবস্থা যেন শিশু সর্বদা মায়ের অঞ্চল ধরে আছেন, মায়ের কোলে।

দোলযাত্রার দিনে দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে গিরিশ ঘোষের কাছে যাইতে বারণ করিয়াছেন। গিরিশ গৃহস্থ। পাছে ঐ রং ধরে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, গৃহস্থ আশ্রমে যোগ ভোগ দুই-ই থাকে। কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমে শুধু যোগ। নরেন্দ্রকে দিয়া একটি নূতন থাক্ সৃষ্টি করিবেন। তাই গৃহস্থাশ্রমের ভেদগুলি একে একে দেখাইয়া সস্নেহে বলিতেছেন, ‘বাবা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না।’ নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া আছেন। গৃহস্থাশ্রমের মলিন গ্রন্থিগুলির কথা শুনিয়া উপস্থিত গৃহস্থ ভক্তগণের হৃদয় কম্পিত হইতেছে। অন্তর্যামী ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া অভয় বাণী শুনাইতেছেন।

পাঠক (পড়িতেছেন) শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে বলিতেছেন — এগিয়ে পড়। আরও আগে যাও, চন্দন কাঠ পাবে। আরও আগে যাও, রূপার খনি পাবে। আরও এগিয়ে যাও, সোনার খনি পাবে। আরও এগিয়ে যাও, হীরে মাণিক পাবে। এগিয়ে পড়।

শ্রীম — মহিমাচরণের শুনে ভয় হচ্ছে। তাই ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন। অবতার যখন highest ideal preach (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচার) করেন তখন সকলের searching of the heart (অন্তরের পরীক্ষা) আরম্ভ হয়। মহিমাচরণেরও তা হয়েছিল (হাস্য)।

পাঠক (পড়িতেছেন)। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিতেছেন — তুই নাকি চিকিৎসক হয়েছিস্। ‘শতমারী ভবেদ্বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।’

শ্রীম (সহাস্যে) — নরেন্দ্র অনেক বিপদে পড়েছেন পিতৃবিয়োগের পর! অনেক লোকের contact-এ (সংস্পর্শে) এয়েছেন। অনেক জেনেছেন। তাই বলেছেন, ‘চিকিৎসক’। মানে হাজার লোক যে মেরেছে সে পাকা লোক, বহুদর্শী। নরেন্দ্র অল্প বয়সেই বহুদর্শী হয়েছেন। সংসার দুঃখপূর্ণ। ঈশ্বরই সত্যিকার সুখ ও শান্তির আধার, এ অভিজ্ঞতা নরেন্দ্র লাভ করেছেন। ঠাকুর এই কথাই বলছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ওদিকে আবির দেখলাম, আজের দিনের বিশেষ জিনিষ। আজ দোলযাত্রা কিনা শ্রীকৃষ্ণের।

ছোট অমূল্য — আজ্ঞে, আমি নিয়ে আসছি আবির।

শ্রীম — দু’ পয়সার বেশী আনবেন না।

আবির আসিয়াছে।

পাঠ চলিতেছে। শ্রীম উঠিয়া ঘরের পূর্ব দেয়ালে বিলম্বিত ঠাকুরদের ছবিতে নগ্নপদে আবির দিতেছেন। দেয়ালে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের একখানি ছবি রহিয়াছে, আর একখানা চৈতন্য-সংকীর্তনের ছবি। ঠাকুর, মা ঠাকরুণ, যীশুখৃষ্ট, রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, মা কালী প্রভৃতির ছবি আছে। ঠাকুরের শরীর ত্যাগের পর ভক্ত সঙ্ঘের ছবি, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ছবি আছে। আবার অন্তরঙ্গ গৃহস্থ ভক্তগণ, নাগ মহাশয়, বলরামবাবু, গিরিশবাবু প্রভৃতির ছবিও আছে। আর একখানা ছবিতে আছে যোলজন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্ত। ঠাকুরের আদেশে করা, ডিমে তা দিতেছে একটি পাখীর ছবিও রহিয়াছে। শ্রীম একে একে প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করিয়া ভক্তিভরে সকলকে আবির উপকরণে পূজা করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আপনারাও আবির দিন। আলগা দিন, ছুঁয়ে কাজ নাই। (বিনয়ের প্রতি) তুমি নাই বা দিলে যখন অশৌচ। এসব মানতে হয়।

জগবন্ধু — ঠাকুর দেখেছিলেন কি এই ছবিখানা, পাখী ডিমে তা দিচ্ছে?

শ্রীম — না। বলেছিলেন একখানা করাতে। ওঁর শরীর ত্যাগের পর হয়েছিল। যোগের চিহ্ন। যোগের উদ্দীপনা হয় এতে।

শ্রীম মস্তক স্পর্শ করিয়া ঐ ছবিকে প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম (যীশুর ছবি দেখাইয়া) — এখানা পঁচিশ বছর হয়েছে। মা ঠাকরুণ যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন তখন কেনা হয়। আরও অনেক ছবি এ বাক্সে আছে। অবসর সময়ে টাঙ্গিয়ে দিলে হয়।

শ্রীম (স্বগতঃ) — আহা, আজ দোলযাত্রা। এই কথাই মনে পড়ছে। ভাবছিলাম, দক্ষিণেশ্বর যাব। কিন্তু হয়ে উঠলো না। বুড়ো মানুষ কিনা! স্নান আহার এসবের হেঙ্গাম। তার উপর আবার গরম, এইসব প্রতিবন্ধক।

ওখানে থাকলে এসব (ঠাকুরদেবতার দর্শন ও ঠাকুরের স্মৃতিস্মরণ) আবার হতো। (পাঠকের প্রতি) বাকীটা পড়ে ফেলুন।

তৃতীয় অধ্যায় পাঠ চলিতেছে। মহিমাচরণ মহানির্বাণতন্ত্র হইতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন — 'হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং' ইত্যাদি। শ্রীম পাঠ শুনিয়া যেন কি স্মরণ করিতেছেন।

শ্রীম (হঠাৎ পাঠকের প্রতি) — ওরা তর্ক করছেন। এদিকে একটু পরে আমায় আস্তে আস্তে ঠাকুর বলছেন, আমার ঐ সব ভাল লাগে না। ও (মহিমাচরণ) যা বললে টেনে রেখে দিয়েছে।

মহিমাচরণ এলেই এই স্তবটি ঠাকুরকে শুনাতেন। এঁর শ্লোক আবৃত্তি করতে আনন্দ হয় তাই তাঁকে ঐ পথেই নিয়ে যাবেন। স্তব শুনেই ঠাকুরের মন একেবারে ভিতর বাড়িতে চলে গেল — একেবারে সমাধিস্থ। যেমন শুক্‌নো দেশলাই; একটু ঘষলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে। ঠাকুরের এই অবস্থা।

আমরা হাঁ করে চেয়ে থাকতাম কিনা ওঁর দিকে ভিতরে কি হচ্ছে বোঝবার জন্য। ঠাকুরের মন নিচে নেমে এলে ফস করে আমাকে ঐ কথা বললেন — টেনে রেখে দিয়েছে। তিনি অন্তর্যামী, জানতে পেরেছিলেন আমরা তাঁর ভিতর বোঝবার চেষ্টা করছি। তাই ঐ কথা বললেন।

আহা, এ স্তবটি একটি মহামন্ত্র। এটি যদি কেউ আবৃত্তি করে অনায়াসে সিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাঁর অনেক মহামন্ত্র রয়েছে 'কথামৃতে'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সকলে এই মহামন্ত্রটি একবার আবৃত্তি করুন।

ভক্তসঙ্গে শ্রীম আবৃত্তি করিতেছেন —

হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং,
হরিহর বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্॥
জনমমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্।
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

(মহানির্বাণ তন্ত্র - তৃতীয় উল্লাস)

মহিমাচরণ পুনরায় শঙ্করাচার্য কৃত শিবনামাবল্যষ্টকং পাঠ করিতেছেন। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে আছে — 'সংসার-দুঃখগহনাৎ জগদীশ-রক্ষ', এই প্রার্থনা। স্তব পাঠ সমাপ্ত হইলে ঠাকুর গৃহস্থ ভক্ত মহিমাচরণকে অভয় দিতেছেন। বলিতেছেন, 'সংসার কূপ, সংসার গহন কেন, বল? ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধরলে আর ভয় কি? তখন এই সংসার মজার কুটি।...কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেও বা। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটাবনে চলে যাও। কিসের ভয়?

শ্রীম (ছোট অমূল্যর প্রতি) — দেখুন কি অভয়বাণী ভক্তদের জন্য। কার সাধ্য একথা বলে ঈশ্বর ছাড়া — তাঁকে ধরলে আর ভয় নাই! ওদিকে ভয় এদিকে অভয়।

পাঠক প্রথম দুইটি শ্লোক পাঠ করিতেছেন। শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুটি আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর চতুর্থ পরিচ্ছেদ পাঠ প্রায় শেষ হইতে চলিল। শ্রীরামকৃষ্ণ 'মাস্টার'-কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন — 'আচ্ছা এই যে কেউ কেউ অবতার বলছে তোমার কি বোধ হয়?... পূর্ণ, না অংশ, না কলা? ওজন বল না!

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — 'ওজন বল না! ওজন বল!'

পাঠক (শ্রীম-র প্রতি) — ষড়্ভুজ মানে কি?

শ্রীম — তা তিনিই জানেন। (সহাস্যে) ঠাকুর বলছেন, 'থামো, তোমার অসুখ'। রামবাবু সবে অসুখ থেকে উঠেছেন। তিনি নরেন্দ্রের

সঙ্গে তর্ক করছেন। জানেন বললেও থামবেন না। তাই আবার বললেন, 'আচ্ছা, আস্তে আস্তে (হাস্য)। এদিকে আবার আমায় বলছেন, 'আমার এসব ভাল লাগে না।'

ভবতারিণীর সন্ধ্যারতিতে শ্রীম।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির। মা কালীর সন্ধ্যা-আরতি হইতেছে। শঙ্খ ঘন্টাদি বাদ্য বাজিতেছে। পূজারী মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অগ্নি প্রভৃতি সৃষ্টির প্রথম পঞ্চদ্রব্য দ্বারা মায়ের পূজা করিতেছেন। শ্রীম মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন যুক্তকরে গলবস্ত্রে। তিনদিকে ভক্তগণ ভক্তিভরে দর্শন করিতেছেন। আজ দোলযাত্রা তাই বহু লোক সমাগম। আজ আবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি।

আজ সকালে শ্রীম, বিনয় ও জগবন্ধুকে ঁদক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শন করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা সাড়ে পাঁচটায় আসিয়াছেন। শ্রীম-র আসার সম্ভাবনা ছিল না, তবু আসিয়া পড়িলেন। কাশীপুর হইতে ডাক্তার কার্তিক বক্সী গিয়া শ্রীমকে নিজের গাড়ীতে বসাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। ছোট অমূল্য, ছোট জিতেন, লক্ষ্মণ, মনোরঞ্জন, শুকলাল প্রভৃতি আসিয়াছেন। গদাধর ও মহেশচৈতন্য ইদানীং দক্ষিণেশ্বরে রহিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবমন্দিরের আরতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। মা কালীর মন্দিরের আরতি চলিতেছে। তখনই শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আরতি শেষ হইলে চাঁদনীর মধ্য দিয়া শ্রীম গঙ্গার বড় ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ পূর্ণচন্দ্র। চন্দ্রকিরণ গঙ্গার জলে পড়িয়া অপূর্ব শোভা সৃজন করিয়াছে। গঙ্গার জল রজতপ্রভ হইয়াছে — মাঝে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে।

উপর হইতে দ্বিতীয় সোপানের দক্ষিণ দিক হইতে তিনহস্ত উত্তরে বসিয়া শ্রীম, মা-গঙ্গা চন্দ্র ও চন্দ্রকিরণজাত নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিতেছেন। গঙ্গার অপর পারে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। আর কাঁসর ও ঘন্টার নিনাদ শোনা যাইতেছে। ভাটায় জল অতি নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। শ্রীম বৃদ্ধ ও ক্লান্ত। তাই একজন ভক্ত গঙ্গাজল

আনিয়া শ্রীম-র হস্তে দিলেন। ঐ জল তিনি মস্তকে ও মুখে দিয়া ঁরাধাকান্ত মন্দিরের দিকে যাইতে লাগিলেন।

মন্দিরের সোপান শ্রেণীর ঠিক মধ্যস্থলে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রাঙ্গণে উত্তরাস্য হইয়া শ্রীম ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। তারপর সোপান বাহিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বারান্দায় পুনরায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন — মুখে 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' এই মহামন্ত্র। চরণামৃত ধারণ করিয়া নামিয়া আসিলেন। ঠাকুরের ঘরে আসিবার পথে শিবমমন্দির সমূহের উদ্দেশ্যে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বসিয়া আছেন — পশ্চিমাস্য ছোট খাটটির ঠিক মধ্যস্থলে। তিনি ধ্যান করিতেছেন। রামলালদাদা আসিয়া মায়ের প্রসাদী গড়েমালা শ্রীম-র গলায় পরাইয়া দিলেন। গদাধরও একটি মালা পরাইলেন। শ্রীম মালা হাতে লইয়া মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিয়া জামার বুক পকেটে রাখিয়া দিলেন। ঠাকুরের উভয় খাট পরিক্রমা করিয়া শ্রীম পুনরায় আসিয়া মা কালীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া চরণামৃত ধারণপূর্বক চত্বরে অবতরণ করিলেন। এখানেও দুইবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। প্রথম প্রণামের লক্ষ্য মা ভবতারিণী, দ্বিতীয় প্রণামের লক্ষ্য ঠাকুর। চত্বরে আসিয়া ঠাকুর যে স্থানে বসিতেন সেই স্থানেই প্রণাম করিলেন।

এইবার শ্রীম নাটমন্দিরের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত গমন করিলেন। পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার পথে বৃহৎ পিলারকে আলিঙ্গন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিয়া ভাবে, এই পিলারকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাই শ্রীম-র নিকট উহা অতি পবিত্র বস্তু, পবিত্র তীর্থ। চত্বর হইতে মধ্যস্থল দিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলে ডান হাতে একটি পিলার আছে। ঠিক তারই দক্ষিণের পিলারটি এই মহাতীর্থ।

আকাশে চাঁদ। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া উত্তরের ফটক দিয়া শ্রীম কুঠীর সম্মুখে উপস্থিত। কুঠীর সোপান হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত মস্তকে স্থাপন করিলেন। এইস্থানে একটি লোক শ্রীমকে অন্তরালে ডাকিয়া চুপি চুপি কথা কহিতেছে। লোকটি কর্মপ্রার্থী।

নহবতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে শ্রীম মস্তক অবনত করিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। এই স্থান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণভক্ত জননীর চরণরজে সমাকীর্ণ পুণ্যতীর্থ। তাই বুঝি বৃদ্ধ শ্রীম বালকের ন্যায় ভুলুণ্ঠিত হইলেন — মায়ের পায়ে ছেলে। যুক্ত করে মায়ের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহ কুঞ্জিবদ্ধ। শ্রীম বুঝি মাকে জগজ্জননীরূপে দেখেন। নচেৎ জ্ঞানবৃদ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী স্নাতক সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক এই 'ইংলিশম্যান' কেন অশিক্ষিত গ্রাম্য রমণীর চরণ তলে ভূলুণ্ঠিত।

বকুলতলার ঘাটের উপরে শ্রীম দাঁড়াইয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। তারপর ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন — উত্তরাস্য। শ্রীশ্রীমায়ের চরণরজ ধারণ করিয়া এই সোপান শ্রেণীও আজ মহাপবিত্র তীর্থ। শ্রীশ্রীমা এই ঘাটে নিত্য স্নান করিতেন। আবার এইখানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্জলীর সময় স্বীয় গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবীর শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া বিস্ময়ানন্দে বলিয়াছিলেন, 'মা, তুমি কে গো? আমায় গর্ভে ধারণ করেছ!'

শ্রীম পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। বাঁ হাতে গঙ্গাতীরে একটি ইষ্টক নির্মিত বেদিকা রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই উহাতে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। শ্রীম হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই বেদিকাটিকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর মূলে তিন হাত পশ্চিমে পুনরায় শ্রীম ভূলুণ্ঠিত। তারপর উঠিয়া গিয়া ঠাকুরের সাধনস্থল পুরাতন বটবৃক্ষের চত্বরের উত্তর-পশ্চিম কোণে নিচ হইতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। উপরে চন্দ্রকিরণ বৃক্ষের ফাঁক দিয়া আলো-আঁধারের সুমধুর খেলার সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমে গঙ্গা-সলিলে চন্দ্রকর পতিত হইয়া স্বচ্ছস্নিগ্ধ প্রতিবিম্ব রচনা করিয়াছে। সেই প্রতিবিম্ব পঞ্চবটীর নিবিড়ঘনপত্র সমূহের নিম্নদেশ দিয়া যেন আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোক প্রবাহের (flood light) ন্যায় পবিত্র বনস্থলীকে দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। নব ভারতের এই তপোবন পূর্ণ শশীর উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত। বৃদ্ধ শ্রীম সেই কিরণে স্বীয় গুরুদেব

নরদেহী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝি খুঁজিতেছেন, স্মৃতিজ্ঞানে।

শ্রীম বিল্বতলে ভূপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছেন। স্থান তেমন পরিষ্কৃত না হইলেও শ্রীম তথায় ভূপতিত হইলেন। এই স্থলে শ্রীম ঠাকুরকে সশরীরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে বিল্বমূলে বসিয়া যাঁহাকে ধ্যান করিতেছিলেন দীর্ঘকাল পরে নয়ন মেলিয়া তাঁহাকে নরদেহে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। অবতারে বিশ্বাসী লোকের নিকট এই স্থান তাই অমূল্য। ইহা মহা সিদ্ধপীঠ।

শ্রীম বেদীর উপর দক্ষিণ দিকে বিল্ববৃক্ষকে প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বেদীর উপর বসিয়া উত্তরাস্য ধ্যান করিলেন। সঙ্গী ভক্তগণও কেহ কেহ ধ্যান করিতেছেন। কেহ বা শ্রীম ও ভক্তগণের ধ্যানমূর্তি দর্শন করিতেছেন।

শ্রীম হাঁসপুকুরের দক্ষিণ ঘাটের চত্বরে উপনীত। চত্বরের তিনদিকে বসবার জন্য বাঁধান বেঞ্চি আছে। কেবল উত্তরদিক খোলা — ঘাটে নামিবার সিঁড়ি আছে বলিয়া। পূর্বদিকবর্তী বেঞ্চেতে শ্রীম বসিয়াছেন — বেঞ্চ দুইটির পূর্বদক্ষিণ সংযোগস্থল হইতে আড়াই হাত উত্তরে। শ্রীম-র সম্মুখে পঞ্চবটী তারপর গঙ্গা। এইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন। বেঞ্চের নিম্নদেশে চত্বর। সেটি একটি সমকোণ ইষ্টক নির্মিত ক্ষেত্র। তাহার উত্তর পশ্চিম দিকে শ্রীম দক্ষিণাস্য হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। এই স্থলে একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়াছিলেন। উত্তরাস্য — নরেন্দ্রনাথ সোপানতল হইতে গাড়ুতে জল তুলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। সেই জলে শ্রীরামকৃষ্ণের শৌচাদি কার্য সম্পন্ন হয়। গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি, তাই শৌচাদি নিম্নাঙ্গের কর্মে উহা ব্যবহার করেন না। এইস্থলে দাঁড়াইয়া একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন — আরোও ঘন ঘন আসতে হয়। শুনিস্ নাই 'নূতন পীরিতে কি করে লোক।' নরেন্দ্রনাথ তখন নূতন আনাগোনা করিতেছেন।

এবার শ্রীম পঞ্চবটীতে আবার আসিয়াছেন। ধ্যান-কুটীরের অভ্যন্তর দর্শন করিতেছেন দক্ষিণের বাতায়ন পথে। কুটীর মধ্যে একটি ক্ষীণ তৈল প্রদীপ মিট্‌মিট্ জ্বলিতেছে — পাশেই একটি ধ্যানস্থ মৃণ্ময়

শিবমূর্তি। গৃহ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই হস্তে ললাট স্পর্শ করিলেন। কুটীরের বারান্দায়ও হস্তদ্বারা প্রণাম করিলেন। এইস্থলে পূর্বে মৃণ্ময় কুটীর ছিল। ঠাকুর তাহাতে বসিয়া ধ্যান করিতেন। এখন উহা ইষ্টক নির্মিত। গৃহাভ্যন্তরস্থ সকল সামগ্রীই নূতন।

শ্রীম ঠাকুরের রোপিত পঞ্চবটী ও সাধনস্থল পুরাতন বটতলা প্রদক্ষিণ করিতেছেন। পুরাতন বটবেদিকার উত্তর পশ্চিম কোণ পর্যন্ত গমন করিলেন। এইস্থলে পুরাতন বৃক্ষের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই ডাল হইতে রাস্তার পশ্চিমে গঙ্গাতটে নূতন আর একটি বৃক্ষ জন্মিয়াছে। ঠাকুরের সাধনপীঠের বহু নিম্নে, চত্বরে উত্তরাস্য হইয়া একটি ব্রহ্মচারী ধ্যানমগ্ন। শ্রীম এই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের ঘরের পশ্চিম দিকের গোলবারান্দায় শ্রীম আরোহণ করিতেছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। সোপানের নিম্নস্থলে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত ললাটে স্থাপন করিয়া তবে উপরে উঠিতেছেন। পুনরায় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। ছোট খাটটির পূর্বদিকে পশ্চিমাস্য প্রণাম করিয়া পূর্ব-দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া হাজরা মশায়ের আসনে মাদুরে বসিলেন। এখানে অদ্যাবধি একটি মাদুর পাতা থাকে। শ্রীযুক্ত রামলাল দাদা বসিয়া আছেন। শ্রীমকে আসিতে দেখিয়া রামলাল দাদা দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়া হাতে ধরিয়া তাঁহাকে মাদুরে বসাইলেন। শ্রীম দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন। উত্তর বারান্দায় যাইবার পথে বসিয়াছেন — ডাক্তার বক্সী, বিনয়, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, শুকলাল, গদাধর, মহেশ চৈতন্য, ছোট অমূল্য, ছোট জিতেন, বড় অমূল্য, লক্ষ্মণ প্রভৃতি। শুকলাল বড় একহাঁড়ি রসগোল্লা ও সন্দেশ আনিয়াছেন। উহা রামলাল দাদা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিলেন। শ্রীম রামলাল দাদাকে দেখাইয়া ভক্তদের বলিতেছেন, "ঠাকুর এঁদের মুখ দিয়ে খান। আদ্দেক রেখে দাও এঁদের জন্য; তারপর সকলে প্রসাদ পাও।" ঘোষাল একজন কর্মচারী এই মন্দিরের। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তদের বলিলেন, "এখানকার সকলেই আমাদের প্রণম্য, যাঁরা সব মায়ের সেবা করেন।"

প্রসাদ পাওয়ার পর শ্রীম ঠাকুরের ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া

বিদায় লইলেন। ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায় উত্তরপূর্ব কোণে ডাক্তার কার্তিক বক্সীর ঘোড়ার গাড়ী উপস্থিত। শ্রীম-র কাল চুটীজুতা ছিল গাড়ীর ভিতর আর ডাক্তারের জুতা ছিল নিম্নে ভূমিতে। শ্রীম ভুলক্রমে ডাক্তারের জুতায় হাত দিয়া ধরিলেন নিজের জুতা মনে করিয়া। ডাক্তারের সন্ত্রস্ত আপত্তিতে জুতা নিচে রাখিয়া দিলেন। এখন হাত শুদ্ধ করিতে হইবে। জল কাছে নাই। শ্রীম ভূমি হইতে রজঃ স্পর্শ করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, "এখানকার সব ধূলোতে হাত দিলে গঙ্গাজলের কাজ হয়। সব পবিত্র।" দুইবার এই বাণীটি আবৃত্তি করিলেন। আবার বলিতেছেন, "একদিন দেখি ঠাকুর নিজহাতে ঝাড়ু দিচ্ছেন ঠিক এই স্থানটি। আমায় দেখে বললেন, "মা এখান দিয়ে বেড়ান।" তিনি এই সব লীলা সর্বদা এই চক্ষুতে দর্শন করতেন কি না!

ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায় রামলাল দাদা দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম নমস্কারান্তে তাঁহার নিকট বিদায় যাচ্ঞা করিতেছেন — "দাদা, আসি তা হলে।" দাদাও প্রীতি নমস্কার করিয়া শ্রীমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তারপর ঘোষালকে নত হইয়া নমস্কার করিয়া শ্রীম গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন ভক্তরা মনে করিলেন, কিন্তু তিনি পদব্রজে বড় ফটকের দিকে চলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "Experiment (পরীক্ষা) করছি হেঁটে আসতে পারবো কিনা আলমবাজার থেকে।"

শ্রীম ফটকের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। একটু অগ্রসর হইলেই দক্ষিণ দিকে যদু মল্লিকের ফটক। শ্রীম যুক্তকরে এই ফটক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর এখানে প্রায়ই আসতেন — তাঁর touch (স্পর্শ) আছে।" রাস্তায় চলিতে চলিতে বিনয়কে বলিলেন, "তুমি একবার জিজ্ঞেস করে এসো তো, যুগলবাবু বাড়ি আছেন কি না।" ভক্তসঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে আলমবাজারের মোড় পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ ফাল্গুন পূর্ণিমা, আকাশে পূর্ণচন্দ্র। প্রায় এক মাইল পথ আসিতে তের মিনিট লাগিয়াছে। শ্রীম ডাক্তারের গাড়ীতে উঠিয়া রওনা হইলেন। ভক্তগণ মোটর বাসে আসিবেন। এখন রাত্রি দশটা।

রাস্তা চলিতে চলিতে একটি যুবক ভাবিতেছেন, আজ শ্রীম মন্দিরে প্রায় দশবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। আবার যুক্তকরে কখনও বা হস্তস্পর্শেও বহুস্থানে বহুবার প্রণাম করিয়াছেন। কেন, এই প্রণাম? তিনি কি এখনও ঠাকুরকে সশরীরে দর্শন করিতেছেন এইসব স্থানে? বিচার করিয়া বা স্মরণ করিয়া প্রণামে সজীবতা, মাধুর্য্য ও স্বাভাবিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীম-র আচরণে পূর্ণ সজীবতা দেখিতেছি, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম হইলেও শ্রীম আজ যুবকের ন্যায় ভক্তি চঞ্চল। শ্রীম-র নয়নে ও আননে এক সরস আনন্দময় সজীবতা ও স্বাভাবিকতা দেখিতেছিলাম। এই তন্ময়তাতেই বুঝি শ্রীম-র দেহ-শ্রম বিদূরিত। শ্রীম কি বিদেহ?

মর্টন ইনষ্টিটিউশন, কলিকাতা,
২১শে মার্চ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ। ৭ই চৈত্র ১৩৩০ সাল।
শুক্রবার, দোল পূর্ণিমা।

পঞ্চম অধ্যায়

গীতার বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ

১

শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন বেঞ্চেতে, দক্ষিণাস্য। হেডমাস্টার মুকুন্দ রামপুরহাট হইতে আসিয়াছেন। উনি ওখানে কাজ করেন। শ্রীম তাহাকে পুত্রবৎ আদর করিয়া পাশে বসাইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। এখন সকাল নয়টা। আজ ২২শে মার্চ ১৯২৪ খৃঃ অব্দ, ৮ই চৈত্র ১৩৩০, শনিবার। অন্তেবাসী আজ প্রথম ষ্টীমারে বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন। তিনি এইমাত্র ফিরিলেন।

শ্রীম তাঁহাকে দেখিয়াই বলিতেছেন, "আমরা হাঁ করে চেয়ে আছি, কখন ফিরবেন। তাই expect (আশা) করছিলাম। এটি যে miss (পরিত্যাগ) করেন নাই, বড্ড ভাল হয়েছে। আয়াঙ্গার মশায়ের সন্ন্যাস হয়েছে আজ ভোরে — কি নাম হয়েছে?"

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হ্যাঁ, সন্ন্যাস হয়ে গেছে আজ ভোরে। নাম হয়েছে স্বামী শ্রীবাসানন্দ।

শ্রীম — বিরজা হোম হলো কোথায়?

অন্তেবাসী — ধ্যানঘরে।

শ্রীম — কোথায় দেখা হল প্রথম?

অন্তেবাসী — মহারাজের মন্দিরের কাছে।

শ্রীম — কোন ঘরে রয়েছেন?

অন্তেবাসী — দোতলায়, মহারাজের ঘরে।

শ্রীম — কেমন দেখলেন?

অন্তেবাসী — খুব প্রফুল্ল।

শ্রীম — কিছু কথা হলো?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ। বললেন, "Now I am happy"

(এখন আমি সুখী)।

মুকুন্দ বিদায় লইলেন। শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — নূতন সন্ন্যাসী! এঁদের কত ত্যাগ! পিছু পিছু থাকতে হয়। দেখতে হয় সব — intrude (বিরক্ত) না করে। কি করে বসেন, কি করে কথা কন, সব দেখতে হয়।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

(গীতা ২/৫৪)

ছেলেরাও ত্যাগ করে। তা আর তেমন কি? যেমন হরি, এতে তারই ভাল হয়েছে। কিন্তু ওঁর কত বড় ত্যাগ। (সহাস্যে) যোগেন স্বামী ঠাট্টা করে বলতেন, 'এখানে এসে আমাদের লাভই হয়েছে। লোকে পুজো করে, পায়ের ধূলো নিচ্ছে, কত কি! ওখানে থাকলে ট্রামওয়ের কনডাক্টার হতে হতো' (হাস্য)।

এখন রোজ যাওয়া উচিত মঠে যাদের time (সময়) আছে। এমন লোক, অনেক কাজ হবে এঁর দ্বারা। কোথায় হয়তো আবার ডুব মারবেন। বি—বাবুর তেমন ব্যাকুলতা নাই। নয়তো সারাদিন থাকতে পারেন মঠে। অমূল্যবাবুও পারেন। না, ইনি আবার ঠাকুর সেবায় আটকে গেছেন। তা এও খুব ভাল কাজ হচ্ছে। ফ্রেণ্ডসদের কাজে help (সাহায্য) করতে হয়। ওরা কত সেবা করেছেন কত সময়। বি—বাবুর মনে তেমন চেষ্টা নাই। আলসে, কুঁড়ে। না, মানে ইয়ে (ব্যাকুলতা) নাই। (জগবন্ধুর প্রতি) আপনারা কাল যেতে পারেন, সকাল সকাল খেয়ে। হাজার বই পড়লে কি হয়? একবার দেখলে অনেক কাজ হয়। ঠাকুর বলতেন, 'পড়ার চাইতে শোনা ভাল। শোনার চাইতে দেখা ভাল।' তাই গিয়ে দেখতে হয় বার বার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এখন ভাবছি দক্ষিণেশ্বর দিন কতক যাওয়া-আসা করবো। প্যাকেটে করে ভাত নিয়ে যাব ভাবছি (হাস্য)। তারপর সমস্ত শরীরে আর কাপড়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিব। তাহলেই হয়ে গেল। বুড়ো বয়সে নিয়ম চলে না — আর চলে না। পঞ্চাশ পার হলে আর নিয়ম চলে না। (একজন ভক্তের প্রতি) সকালে বুঝি

ওরা (পাঞ্জাবী) রুটি করে না?

খাওয়া নিয়েই যত গণ্ডগোল। তা খাওয়া সোজা করে দিলেই হলো। দেখনা, এতো বড় একটা simplification (জটিল অঙ্ক) তার result (ফল) হলো হাফ্ (½)। তা কি দরকার, খাওয়া নিয়ে এতো করার?

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ওটুকু হেঁটে গেলে বেশ হয় — আলমবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির। মাঝে একজন ফ্রেণ্ডের (যুগলের) বাড়ি আছে। কাল, দেখেছি তের মিনিট লাগলো আসতে।

একজন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — গত রাত্রে নারাণ আয়াঙ্গার মশায়কে স্বপ্নে দেখলাম, গেরুয়া পরা। আজ যা দেখে এলাম সব মিলে যাচ্ছে। শুধু মাথায় চুল দেখেছিলাম। আজ দেখলাম নেড়া।

শ্রীম — পূর্বের সংস্কার রয়েছে কিনা তাই মাথায় চুল দেখেছেন। এখন আবার দেখতে হয়, সন্ন্যাস নিয়েছেন। আমাদের মন এইভাবে তৈরী। যা দেখি, যা শুনি, এর সমষ্টিই মন।

এখন বেলা দশটা। শ্রীম স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্ন সাড়ে চারটা। দোতলার ঘরে মেজেতে মাদুরে শ্রীম বসা। শনিবারের ভক্তগণ উপস্থিত। ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ ও সঙ্গী, ভীম ও বসন্ত, ফকির ও মাখন প্রভৃতি আসিয়াছেন। জগবন্ধু এখানেই থাকেন। দেখিতে দেখিতে এটর্ণি বীরেন, বড় ও ছোট অমূল্য, সদানন্দ প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। একটু পরে বেলুড় মঠের একজন সাধু আসিয়াছেন। সাধুটি ঘি-মুড়ি আহার করিলেন। এইবার শ্রীম সাধুর সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — ছেলেদের বইতে একটি কবিতা আছে। নাম, 'He will not come.' একটি কুকুর ছিল। তার প্রভু হঠাৎ মারা যায়। কুকুরটি বড়ই শোকগ্রস্ত। সে সর্বদা প্রভুর grave-এর (কবরের) উপর বসে থাকতো। Summer (গ্রীষ্ম) গেল, Winter (শীত) এলো। না খেয়ে খেয়ে আর শীতে তার অসুখ করলো। স্কুলের ছেলেরা তাকে খাবার এনে দিত। শীতের সময় স্কুল বন্ধ

ছিল। তাই আহার জুটলো না। খুব অসুখ হলো। শরীর খুব দুর্বল। তাই কবরের উপর থেকে একটু একটু করে সরে পড়লো। যেই মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল অমনি ভীষণ এক আর্তনাদ করে লাফ দিয়ে গিয়ে আবার কবরের উপর পড়লো। তারপর মৃত্যু।

এটি দুটোর example (উপমা), — পূর্ণ সন্ন্যাস, আর সচ্চিদানন্দে প্রেম — ঠাকুর যা বলতেন। হাঁ, এ দুটিরই উপমা।

সাধু (শ্রীম-র প্রতি) — ঠাকুরকে দর্শন করা যায় এই স্থূল শরীরে?

শ্রীম — হাঁ। শুনেছি, ভক্তরা কেউ কেউ তাঁকে দর্শন করেছেন। ঠাকুর বিবেকানন্দকে বলেছিলেন — এই পাখাটি যেমন দেখছি, তেমনি দেখা যায় (ঈশ্বরকে)।

সাধু — Conscious state-এ না, Super-conscious state-এ (সজ্ঞানে কি সমাধিতে)?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, এই সাদা চোখেই আগে দর্শন হতো। এখন ভাবে হয়।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। আর পালন না করলে কিছু বোঝা যায় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই।

শ্রীম (ভোলানাথের প্রতি) — মুখুয্যে মশায় ঐ গানটি গান না — 'ভবরাণী'। আর ঐটি মুখে মুখে বলবেন (হাস্য)। কেউ একটি গান করে শুনিয়েছেন ঠাকুরকে। আবার একটি শোনবার ইচ্ছা থাকলে বলতেন, 'আচ্ছা, ঐটি একবার মুখে মুখে হউক না (সকলের হাস্য)।

ভোলানাথ গাহিতেছেন।

গান।

কি হবে কি হবে, ভবরাণী তবে, ভবেতে আনিয়ে ভাবালে আমায়।
না জানি সাধন, না জানি পূজন, বিষয় বিষ ভোজন করি প্রাণ যায়।।
কাতরেতে তাই ডাকি ভবদারা, কখন আছে কখন যেতে হবে তারা।
এ দেহ সন্দেহ ত্বরায় দেখা দেহ; রসিকের এ দেহ জলবিম্ব প্রায়।।

শ্রীম — ওটিও হউক।

গান। বিকল্পবিহীন সমাধি বিলীন ব্রহ্মে চিরদিন আসন তোমার।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীম ভক্তদের বলিতেছেন, "কৈ, চাঁদ দেখেন নাই আপনারা? চলুন উপরে, আপনাদের চাঁদ দেখাব (হাস্য)। সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। কেহ বিদায় লইলেন। বেশীর ভাগই শ্রীম-র সঙ্গে চারতলার ছাদে উঠিলেন।

শ্রীম চারতলার ছাদে বেড়াইতেছেন — উত্তর-দক্ষিণ। গতকাল পূর্ণিমা গিয়াছে। আজও আকাশে স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রিমা। এই সময়ে গত রাত্রিতে শ্রীম দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে ভক্তসঙ্গে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। আবার এই বসন্তের চন্দ্রালোকেই তিনি প্রথম প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। বসন্ত চন্দ্রিমা শ্রীম-র বড় প্রিয়।

শ্রীম বেড়াইতেছেন, আর মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া চাঁদ দেখিতেছেন। কি ভাবিতেছেন, আবার চলিতেছেন।

ভক্তগণ অনেকে উপস্থিত। কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম এইবার বিস্তৃত ছাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন — দক্ষিণাস্য। নিজে নিজে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বগতঃ) — সবই তিনি করে রেখেছেন। সবই তিনি হয়ে রয়েছেন। তাই ঠাকুর রোজ প্রার্থনা করতেন, শরণাগত, শরণাগত।

এইবার শ্রীম আসিয়া বাঘাম্বরী কম্বলের উপর বসিয়াছেন ছাদের দক্ষিণ প্রান্তে — পশ্চিমাস্য। শ্রীম-র তিনদিকে ভক্তগণ — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বড় অমূল্য, মাখন ও তাঁর বন্ধু, শচীনন্দন, বলাই, ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি। কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি আশ্চর্য, দেখুন না — সূর্যটি কি করে আসে। এটি আসে তবে প্রাণ বাঁচে। তারপর দেখুন, মানুষ কি? এমন একটুখানি Spermatozoon, (বীজাণু) থেকে এতো বড় শরীর হলো — হাত পা, নাক মুখ, সব। তারপর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার।

এটি (শরীর) আবার এমনি করে তৈরী যে এতে আবার reflections (প্রতিবিম্ব) হয়। কাঁচের পিঠে মারকারী (mercury) দেওয়ায় তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। তেমনি এই দেহ। এটি ঠিক এমনি ভাবে তৈরী। এতেও sense world এর (বাহ্য জগতের) ছবি পড়ে। আবার যেই (প্রাণ) সরিয়ে নিল অমনি সব পড়ে রইলো।

এতে আর ছবি উঠবে না।

তাই বাজী ভোর না হতে সেরে নিতে হয় — শরীর থাকতে থাকতে। অধর সেনকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তাড়াতাড়ি সেরে নেও, তাড়াতাড়ি সেরে নেও।' ছ'মাস পরেই অধরবাবুর শরীর গেল।

শ্রীম (একজন যুবক ভক্তের প্রতি) — গৃহস্থদের বলতেন, 'তোমরা মনে ত্যাগ করবে।' মনে কি ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়? বাইরে ত্যাগ করতে হয়। বাইরে না হলে মনেও হয় না। ভয় পাবে বলে ঐ সকল বলতেন।

যোগীদের কিন্তু সব ত্যাগ হয়। মানে, sense world-টার (বাহ্য জগতের) কিছু না নিতে নিতে আর একটা পরদা খুলে যায়। মারকারির (Mercury - পারা) পিছনে আরো আছে কি না। সেইগুলি ক্রমশঃ develop (পরিপুষ্ট) করতে থাকে।

বাঘে একজন মুনিকে হয়তো ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সকলে খবর পেয়ে পিছু পিছু যাচ্ছে। মুনি বাঘের মুখে বসেও 'সোঽহং সোঽহং' করছেন। তিনি জানেন কি না, কিছুই নাই। ঈশ্বরই সার।

বুদ্ধির jurisdiction sense knowledge (দৌড় বাহ্য জগৎ) পর্যন্ত এর বেশী না।

বড় জিতেন — তা হলে sense knowledge-এর (বাহ্য জগতের জ্ঞানের) দরকার নাই?

শ্রীম — না, তবে if it leads to something higher (যদি উহা উন্নতির কোন উচ্চ আদর্শে নিয়ে যায়)। এই sense knowledge (বাহ্য জগতের জ্ঞান) দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়, — মোড় ফিরিয়ে দিলে।

সেইজন্য সাধুসঙ্গ করতে হয়। আর অভ্যাস যোগ দ্বারাও হয়। তাই চোখ বুজে ধ্যান করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, আমায় গাছতলায় নিয়ে গেল। চোখ বোজালে। আবার পাছে মনে অন্য চিন্তা হয়, তাই একজনকে শূল হস্তে রেখে দিয়েছেন, ভয় দেখাতে।

চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। চেয়ে ধ্যান করতে পারে কারা? যাদের পাখীর মত মন হয়েছে — ডিমে তা দিচ্ছে, ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি। মন

রয়েছে ওখানে, ডিমে। তেমনি যার মন সর্বদা ঈশ্বরেতে থাকে তিনি চেয়ে ধ্যান করতে পারেন।

বড় জিতেন — clean slate-এর (লেপাপোঁছা স্লেটের) দরকার তা হলে।

শ্রীম — তারজন্যই তো যোগীরা চেষ্টা করছেন। কিছুই নেবেন না, পুরো নন-কোঅপারেশন।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর একজনের হাত থেকে মালা কেড়ে নিলেন আর বললেন, এখানে এলেও মালা জপা? এখানে যারা আসবে তাদের একেবারে চৈতন্য হয়ে যাবে।

অবতার যখন আসেন তখন বড় সুবিধা। তখন ডাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল। অন্য সময় বড় তেষ্টা। মাটি খুঁড়েও জল পাওয়া যায় না। কিন্তু অবতার এলে খুব chance (সুযোগ)।

আয়োজন কত, কিন্তু নেবার লোক নেই যে! সৌভাগ্য কি কম? দেখুন, প্রথম মানুষ জন্ম। মানুষ জন্মেই কেবল সাধনভজন করা যায়। অন্য কোনও শরীরে হয় না। এই জন্মেই মোক্ষ হয়। দ্বিতীয়, ভারতে জন্ম — যেখানে ঈশ্বরের অনেক নাম হয়ে গেছে যেখানে ঋষিরা এসেছিলেন। তৃতীয়, বাংলা দেশে জন্ম। এই বাংলা দেশে চৈতন্যদেব এসেছিলেন। প্রেমের বন্যাতে দেশ ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন ঠাকুর এসেছেন — এই সবে চলে গেলেন। হাত বাড়ালে ধরতে পারা যায়। মা, মা, বলে পাগল। কিছুই নিলেন না। অত প্রেম ঈশ্বরে যে কটি বস্ত্রখানাও রাখতে পারছেন না। সমস্তটা মন বিলীন হয়ে আছে তাঁ’তে। আর চতুর্থ সৌভাগ্য, সেই সময়ের ভক্তদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আবার সাধু দেখা যাচ্ছে, তিনি যাদের তৈরী করে গেছেন। ভক্তদের দেখলে তাঁর কথা মনে পড়ে। অনেক আয়োজন, কিন্তু লোক কই? একেবারে হেউ ঢেউ — অনেক অনেক আছে। নেমন্তন্নে গেলে অনেকে বলে, আরোও নিন্, আরোও নিন্, কিন্তু আর নেয় না।

বড় জিতেন — একটি চাপরাশিকে একজন বকেছিল ভুল হওয়ায়। আর একজন শুনে বললে, ‘মশায়, ও ভুল করবে না তো

কি? ওযে ছাতুখোর। সংসারে এতো ভাল জিনিষ থাকতে ও ছাতু খায়। তেমনি আমরা যে ঘাস খাই!

শ্রীম (ভরসা দিয়ে) — আপনারা অমৃত খাচ্ছেন। অবতার যখন আসেন তখন আকাশ বাতাস তাঁর ভাবে surcharged (পরিপূর্ণ হয়ে থাকে)।

আপনি কি জানেন আপনি কোথায়? ঘুমন্ত লোক গাড়ীতে বসে কাশী এসেও ভাবছে, আমি ঐখানেই রয়েছি হাওড়ায়। তারপর কাশীর জিনিষ দেখালে তখন বোঝে, 'না, আমি কাশী এসেছি'। সবে ঘুম ভাঙ্গলে কি বোঝা যায়, কোথায় আছি?

আপনি যখন কথা বলবেন, শুনে লোক অবাক্ হয়ে যাবে। বার্ক (Burke), শেরিডন (Sheridan) সব অবাক হবে Single speech of Hamilton-এর মত। হেমিলটন নামে একজন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেম্বর ছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে মেম্বর হয়ে আসছেন। কখনও তিনি বক্তৃতা দেন নাই। একদিন এমন বললেন, বার্ক, শেরিডন সকলে অবাক। আপনিও একদিন ওরূপ বলবেন।

বড় জিতেন — গীতা পড়ছিলাম। মানে বোঝা যাচ্ছে না। — 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি —' (গীতা ৩/৩৩) আর একটা কি?

শ্রীম — ওকি বোঝা যায়! তপস্যা না করলে ও' হয় না। দূর থেকে বাজারের হো হো শব্দ শোনা গেল। বাজারে না ঢুকলে কি জানা যায় কিসের শব্দ। নির্জনে গোপনে তপস্যা করতে হয়, তবে বোঝা যায়, গীতা শাস্ত্রাদি।

আগে তরুণ ঋষিরা যেতেন বড় ঋষিদের কাছে সমিৎ হাতে। বড় ঋষিরা বলতেন, 'বুঝেছি কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছ। তা এক বছর তপস্যা করে এসো।' এমনি কাণ্ড। তপস্যা না করলে প্রশ্ন করারও অধিকার হয় না। কি বলতে কি বলে ফেলে।

তাই তপস্যা করতে হয় — শাস্ত্র বুঝতে হলে। (গানের সুরে) 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি জানতে পারে?'

শ্রীম মর্টন ইনষ্টিটিউসনের চারতলার ছাদে বসিয়াছেন কম্বলাসনে পশ্চিমাস্য। সম্মুখে ভক্তগণ। অনবরত শ্রীম-র মুখ-কমল হইতে

কথামৃত পান করিয়া ভক্ত-অলিকুল মত্ত। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র। আবার সুশীতল সমীরণ। বসন্তের এমন দিনেই শ্রীম ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাই আজ ঠাকুরের দিব্য-সঙ্গের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীম আনন্দে ভরপুর। অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের সেই নির্মল আনন্দ রস ভক্তদের প্রদান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তাই শ্রীম রসভাণ্ডার 'কথামৃত' পাঠ করিতে বলিলেন। নিজে প্রথম ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড বাহির করিয়া দিলেন। হ্যারিকেনের আলোতে জগবন্ধু পড়িতেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে শুভাগমন করিয়াছেন।

পাঠক (পড়িলেন) শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন — তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু — মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন। ....তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হলো। অবতার আর ঈশ্বর অভেদ।

শ্রীম — তাই ক্রাইষ্ট বলেছিলেন, '....he that hath seen me hath seen the Father' (St. John 14:9). '...I and my Father are one' (St. John 10:30). কিন্তু ঈশ্বর না বোঝালে এটি বোঝবার যো নাই। এমনি তাঁর মায়া। তাই রামকে মাত্র কয়েকজন ঋষি চিনেছিলেন। কৃষ্ণকেও তাই, কয়েকটি লোক অবতার বলে গ্রহণ করেছিলেন — অসিত, দেবল, ব্যাসাদি। ক্রাইষ্ট, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদেরও তাই। কি করে চিনবে? বুদ্ধির কর্ম নয়, বিদ্যার কর্ম নয়, পাণ্ডিত্যের কর্ম নয়! তিনি জানালেই শুধু জানতে পারে। আর পথ নাই।

পাঠক (পড়িতেছেন) শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন — বই, শাস্ত্র এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবার পথ বলে দেয়। ...কিন্তু খবর সব জেনে নিজে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তু লাভ। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? ...পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, নজর ভাগাড়ে (হাস্য)।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — এই দেখুন, কিছু করতে বলেছেন। মানে, তপস্যা চাই। নির্জনে থাকতে হয়। নইলে শাস্ত্রের অর্থ বোঝা

যায় না। বস্তু লাভ তো দূরের কথা।

অবতারের language-ই (ভাষা) আলাদা। অবতার আসার আগে পণ্ডিতগুলো হাজ্জাগোজ্জা করে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে। কিন্তু অবতার এলে শাস্ত্রের দরকার নাই। অত পড়তে হয় না। তাঁর মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনলেই হলো। শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ তিনি প্রকাশ করেন, তাঁর কথায় ও আচরণে। অবতার না এলে লোক মুস্কিলে পড়ে পণ্ডিতদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে। তাই তখন উপায়কেই উদ্দেশ্য বলে মনে করে। শাস্ত্র তো উপায়, উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। শাস্ত্র পড়াই তখন উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। অবতার এসে বলেন, তপস্যা কর, নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে না হয় বল। শুধু পড়ায় কিছুই নাই। কর, কিছু কর আন্তরিক।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বর এক একটি object lesson (দৃষ্টান্ত) চোখের সামনে ধরেন। নারাণ আয়ঙ্গার মশায়কে দেখুন না। ভিতরেও ছাড়িয়েছেন আবার বাইরেও ছাড়িয়েছেন। কাল মাত্র সন্ন্যাস হয়েছে, এখন তীব্র বৈরাগ্য। সব আছে, অর্থ, মান, যশ পুত্রকন্যাদি আবার কুল — সৎ ব্রাহ্মণ কিনা — সব আছে, কিন্তু সব ত্যাগ করেছেন, কি তীব্র বৈরাগ্য। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁকে দেখা উচিত। দেখলে চৈতন্য হয়ে যায়।

এক বছর ধরেই সন্ন্যাস নিয়ে আছেন। কখনও মায়াবতী, কখনও কাশী, এইরূপ করে আশ্রমে আশ্রমে বাস করেছেন। হাতে ইতিমধ্যে একটা বেদনা দেখা দিল। বম্বের বড় বড় ডাক্তাররা বললেন, বিলেতে গিয়ে অপারেশন করতে হবে। হাড়ে পুঁজ জমেছে। ভ্রুক্ষেপ নাই — দেহের দিকে চাইলেন না। এদিকে সন্ন্যাস নিয়ে ফেলেছেন। কোথায় বিলেত যাওয়া চিকিৎসার জন্য আর কোথায় সন্ন্যাস! কাল সকালে সন্ন্যাসের একটু পরই একজন ভক্তকে বলেছেন, 'Now I am happy'। তার মানে, সাদা কাপড় পরা থাকলে সকলে ডাকবে। আজ বিয়ে, কাল অমুক, সবেতে ডাকবে। গেরুয়া পরলে আর ডাকবে না। ভাববে, তিনি এখন আর এসব বিষয় দেখেন না, কি হবে ডেকে? গেরুয়া একবার নিলে ফিরে যেতে লজ্জা হয়। এইজন্য গেরুয়া নেওয়া। সাদা কাপড় থাকলে সম্ভাবনা থাকে ফিরে যাবার।

কি রোখ্! ঠাকুর পাঁচ টাকার গরু ও পঁচাত্তর টাকার গরুর গল্প করতেন। চাষারা গরু কেনার সময় পরখ করে — ল্যাজে হাত দেয়। যে গরুটা হাত দিতেই নেতিয়ে পড়ে আরামে, সেটার দাম পাঁচ টাকা। হাত পড়তেই যেটা তিড়িং-বিড়িং করে লাফিয়ে উঠে তার দাম পচাত্তর টাকা। এঁদের দাম পঁচাত্তর টাকা — আয়াঙ্গার মশায় প্রভৃতি। খুব রোখ্। কত বাধা পড়লো, কিছুতেই বাধা মানলেন না। দর্শন করলে লোকের চৈতন্য হয়ে যাবে। ঠাকুর তাই বলতেন, পড়ার চাইতে শোনা ভাল, শোনার চাইতে দেখা ভাল।

শ্রীম (স্বগত) পট পরিবর্তন। (ভক্তদের প্রতি) — তাই ঠাকুর বলতেন, মা এখনও আমার অবস্থা বদলাচ্ছেন। আরসির ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। একখানা ছবি তুলে নিয়ে আর একখানা দিলে। এইভাবে সব বদলাচ্ছে। সব তাঁর ইচ্ছা।

২

মর্টন স্কুল। সকাল সাড়ে সাতটা। বিনয় ও ছোট অমূল্য রাত্রিতে এখানে ছিলেন। তাঁহারা এখন কাশীপুর ডাক্তার কার্তিক বক্সীর বাড়ি যাইতেছেন। সেখানে থাকেন। শ্রীম-র নিকট বিদায় লইতেছেন। শ্রীম দোতলার সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। প্রণাম করিতেই তিনি তাঁদের কল্যাণের জন্য উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (বিনয় ও অমূল্যের প্রতি) — নারাণ আয়াঙ্গার মশায়ের সন্ন্যাস হয়ে গেছে। এখন রোজ মঠে যাওয়া উচিত। টাট্‌কা সন্ন্যাসী, তীব্র বৈরাগ্য এখন। দর্শন করলে চৈতন্য হয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, 'পড়ার চাইতে শোনা ভাল। শোনার চাইতে দেখা ভাল।' হাজার বই পড় কিচ্ছু হবে না, একবার দেখলে যা হয়। তীব্র বৈরাগ্য! ছেলেদের life (জীবন) আর কি! এদিক যেতো, না হয় ওদিক গেল। এঁদের মনে কর সব ছিল — নাম, যশ, ধন, দৌলত, কুল, শীল, উচ্চ রাজপদ। সব ছেড়ে চলে এসেছেন। আজকাল অনেকক্ষণ মঠে থাকা উচিত — থেকে এঁদের সব watch (দেখা) করা। 'কিমাসীত ব্রজেত কিম্' (গীতা ২/৫৪)। Idea and ideal body

(ভাবনা ও আদর্শ নবরূপ) ধারণ করে। তা দেখতে হয় গিয়ে।

এখন বেলা নটা। শ্রীম নিজ কক্ষে চারতলায় বসিয়া আছেন খাটে, পশ্চিমাস্য। তাঁহার বাঁ দিকে বেঞ্চেতে মোহনবাঁশী ও জগবন্ধু বসা। মোহনবাঁশীর বয়স চল্লিশ হইবে। তাঁহাকে সাধুদের সেবা করিতে বলিয়াছিলেন শ্রীম।

মোহনবাঁশী (শ্রীম-র প্রতি) — এখন জেনেছি, রোজ যাব (গদাধর আশ্রমে)। এটা আপনার আদেশ, তাঁদের বলবো।

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — তা বলা দরকার কি? আমি সাধুদের দাসের দাস। অত বড় বড় কথার দরকার কি? সাধুদের আশ্রমে ঢুকতে হয় জোড়হাতে করে। কেন? ঠাকুর বলতেন কিনা, উঁচু ঢিপিতে জল দাঁড়ায় না।' তাই (জোড়হাতে মস্তক নত করিয়া) এমন করে যেতে হয়। সেবা করতে হয় সাধুদের, সেবা নিতে নাই। আগে থাকতেই এসব বিষয় ভেবে ready (প্রস্তুত) হয়ে যেতে হয়।

সাধুরা ভোগ-টোগ ছেড়ে আছেন। তাই মনে করুন সাধুরা গৃহস্থদের কাছে থাকেন না। গৃহ মানে ভোগের আড্ডা। বিষয়ীদের সঙ্গে বেশী থাকলে ঐরূপ হয়ে পড়ে। বিষয়ী মানে যারা টাকাকড়ি, মান সম্ভ্রম, দেহসুখ, মেয়েমানুষের সুখ এসব নিয়ে আছে। সাধুরা এসব কিছু চান না।

আগুনের কাছে থাকলে গা গরম হয়। বরফের ঘরে থাকলে গা ঠাণ্ডা হয়। গৃহে যারা আছে তারা তো ওসব নিয়ে আছে কিনা!

নানান খানা চাইলেই মুস্কিল। তা না হলে জীবন ধারণ তো খুব সোজা। বিদ্যাসাগর মশায় বলতেন, 'কেন যাব আমি অপরের দাসত্ব করতে? তিন মুঠো চাল ফুটিয়ে নুন দিয়ে খাব।' তা হলেই হয়ে গেল problem solved (সমস্যার সমাধান)।

তার জন্যই আপনাকে দক্ষিণেশ্বরে থাকতে বলেছিলাম। এমন স্থান! ভগবানে যাদের ভালবাসা আছে, তাদের কুকুরের মত ওখানে পড়ে থাকাও ভাল। রামকে বলেছিলেন বশিষ্ঠ, 'রাম, তুমি আসবে শুনে এখানে রয়েছি। নইলে দাসত্ব করতুম না। তোমায় রোজ দেখতে পাব, তাই এই হীন কর্ম স্বীকার করেছি।' বশিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন

কিনা। পেটে খেলে পিঠে সয়।

জয়বিজয় ভগবানের দ্বারী। সনৎ, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, এই চারজন আদি ঋষি গেছেন দেখা করতে। জয়বিজয় যেতে দিলেন না। ওঁরা বললেন, 'কি, আমাদের প্রাণ অত ব্যাকুল ভগবানের দর্শনের জন্য, তোমরা যেতে দিলে না, আমরা অভিশাপ দিচ্ছি আমাদের এই কষ্ট দেবার জন্য তোমাদের মর্তে গিয়ে জন্ম নিতে হবে।' ভগবান এই কথা জানতে পেরে ঋষিদের কাছে গিয়ে উপস্থিত। বললেন, 'আজ আমার কি শুভ দিন! আপনাদের দর্শন করে ধন্য হলাম।' এঁদের সুখাসনে বসিয়ে তুষ্ট করে তারপর জয়বিজয়ের কাছে গেলেন। ওঁরা কাঁদছেন। তাঁদের বললেন, 'ধন্য তোমরা! আমায় যারা দিবানিশি চিন্তা করছেন সেই ঋষিগণ তোমাদের অভিশাপ দিয়েছেন। তাতেও তোমাদের ধৈর্য হারায় নাই। তোমরা কাঁদছো আবার! ধন্য তোমরা। কেন ভয় কি? তোমরা মর্তে গেলে আমিও তোমাদের সঙ্গে মর্তে যাব।'

শ্রীম (মোহনবাঁশীর প্রতি) — সাধুর আশ্রমে গিয়ে সেবা করতে হয়। তাঁরা দৌড়াদৌড়ি করছেন, আর তখন একজন গিয়ে ধ্যানজপ করবে, তা হয় না। একবার মা ঠাকরুণের কাছে কয়েকজন স্ত্রীভক্ত গিছলেন। সকলে বসে ধ্যান করছে (ধ্যানের অভিনয় করিয়া) এমন করে চোখ বুজে। মা তখন গোবর দিয়ে লেপ দিচ্ছিলেন একটা জায়গা। একটি ভক্ত (শ্রীম-র ধর্মপত্নী) উঠে গিয়ে মায়ের সঙ্গে লেপ দিচ্ছেন। মা বললেন, 'তুমি এলে, এরা সব ধ্যান করছে।' স্ত্রীভক্ত বলছেন, ছি, অমন ধ্যানের মুখে আগুন। তুমি গোবর দিয়ে নিকোচ্ছ আর আমি বসে বসে ধ্যান করবো। আমি তা পারবো না।' ঐ ভক্তটি ঠিক বুঝেছে, কোনটি করতে হয়, কোন্‌টি না।

বৈষ্ণবরা বেশ বলে, 'আমি মালায় আছি' (হাস্য)। একজনকে কোনও কাজে যেতে হবে। সে টের পেয়ে মালা নিয়ে বসলো। সকলে খুঁজছে, অমুকে কোথায়, বাজারে যেতে হবে যে। আর পাওয়া যাচ্ছে না। একজন অনেক খুঁজে পেতে গিয়ে বের করলো আর বললো, তোমায় যে বাজারে যেতে হবে। সে উত্তর করলো,

আমি এখন মালায় আছি (সকলের হাস্য)। অন্য একজন বললে, আবার অমুক কাজটাও যে করতে হবে তোমায়। তখনও সেই উত্তর — 'মালায় আছি'। যেই আর একজন বললে, ওহে, এসো খাবারের জোগাড় হয়েছে। সে উত্তর দিচ্ছে, আসছি। মালা হয়ে গেছে (সকলের উচ্চহাস্য)। এসব আলসে লোক। এদের না হয় এদিক, না হয় ওদিক।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'একটি পাখীর ছবি যদি কেউ করে, ডিমে তা দিচ্ছে, দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যাল। যোগের খুব উদ্দীপন হয় তা হলে।' ঐ কুকুরের গল্পটিও তেমনি। প্রভুভক্ত কুকুর প্রভুর শোকে দেহত্যাগ করলো। কেউ যদি করে এমন একটি ছবি তা হলেও যোগের খুব উদ্দীপন হয়। প্রভুর কবরের উপর বসে থেকে শরীর দিলে। এটি পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ সন্ন্যাসের লক্ষণ।

শ্রীম (মোহনবাঁশীর প্রতি) — 'He will not come' — এই নামে ছেলেদের একটা কবিতা আছে। একজনের একটা কুকুর ছিল। কুকুরটিকে খুব ভালবাসতো। সেই লোকটি হঠাৎ মরে যায়। কুকুরটা গিয়ে যে তার কবরের উপর বসলো আর উঠলো না। গ্রীষ্ম গেল, শীত এলো। এ সেখানেই বসে আছে। স্কুলের ছেলেরা কখনও কিছু খেতে দিত আর বলতো — 'He will not come' শীতে না খেতে পেয়ে শরীর খুব দুর্বল হয়ে যায় তাই ছেঁচড়ে কবরের নিচে পড়ে গেল। কিন্তু যেই মৃত্যুর সময় এলো, অমনি ভীষণ আর্তনাদ করে লাফিয়ে কবরের উপর গিয়ে পড়লো। আর তক্ষুনি মৃত্যু হল।

মোহনবাঁশী কয়েকবার বলিলেন, শাস্ত্রে এই আছে, শাস্ত্রে ঐ আছে।

শ্রীম (অতিষ্ঠ হইয়া) — শাস্ত্র শাস্ত্র করলে কি হবে? কে নেয় শাস্ত্রের কথা? শাস্ত্র তো বলছেন, সাধু সঙ্গ কর, সাধু সেবা কর, কিন্তু শুনছে কে? খালি বগর বগর করে!

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — গীতাখানা দিনতো, উল্টান যাক্।

ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা করছেন। দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অর্জুনের সংশয় হয়েছে কোন্ পথ ভাল। তাই প্রশ্ন করলেন জ্ঞানযোগী বড়, কি ভক্তিযোগী বড়? যিনি নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি বড়, কিংবা যিনি বিরাটরূপী সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি বড়?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, নিরাকার উপাসনা বড় কঠিন, সগুণ উপসনা বেশ। আর বললেন, যে সর্বদা আমার কথা চিন্তা করে শ্রদ্ধার সহিত সেই যুক্ততম। মানে হচ্ছে, অর্জুন এই সগুণ উপাসনার অধিকারী তাই তাঁর কাছে এটা বড় বললেন। অধিকারী ভেদে সবই বড়, সবই ভাল। ছোট বড় নাই এতে। ঠাকুর তাই বলতেন, 'যা যার পেটে সয়' তার পক্ষে তাই ভাল। ছোট বড় না বলে, বরং বলা ভাল, কোনটা তাঁর পক্ষে suitable, easier and natural (উপযুক্ত, সহজ ও স্বাভাবিক)। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় এই বলেই মনে হয়। ভগবান তারপর সগুণ উপাসনার চারটি alternative (পক্ষ) দিলেন।

প্রথম, আমার সগুণ ধ্যানে মগ্ন হও। দ্বিতীয়, তা না পারলে, চেষ্টা কর, অভ্যাস কর। তৃতীয়, তা না পারলে, 'মৎকর্ম' (গীতা ১২/১০) কর। চতুর্থ তাও না পারলে সব কাজ কর, কিন্তু benefit (লাভ) নিজে নেবে না। সব শুভ কর্ম নিষ্কাম হয়ে করতে বললেন।

'মৎকর্ম' মানে গোটা কয়েক কর্ম বেছে নেওয়া যেগুলি directly (সোজাসুজি) ভগবানের উদ্দীপন করে। নবধা ভক্তি, বৈধী ভক্তির কথা বলছেন, শ্রবণ কীর্তনাদি। 'সর্বকর্ম' মানে যা কিছু করা যায় শুভ অশুভ স্বাভাবিক সব কাজ। 'সর্বকর্ম' যেমন বড় circle (বৃত্ত) আর 'মৎকর্ম' ছোট circle (বৃত্ত)। দুটোই নিষ্কাম কর্ম। এমনকি স্বাভাবিক কর্ম, কি দুষ্কর্ম সবই তাঁতে সমর্পন করা উচিত। সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া। কিছু নিজের, কিছু ঈশ্বরের, তাতে হয় না। সব তাঁর — দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার — সব তাঁতে উৎসর্গ করে কর্ম করার চেষ্টা। এটি ঠিক ঠিক হয় ভগবান দর্শন হলে। তার পূর্বে সাধকের অবস্থায় এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে sincerely (প্রাণপণে) সাধ্যমত চেষ্টা করা।

অর্জুনকে যুদ্ধে লাগাতে হবে। তাই সর্বকর্ম-ফলত্যাগ (গীতা

১২/১১) শ্রেষ্ঠ এই কথা বললেন। 'অভ্যাস থেকে জ্ঞান' — intellectual understanding বড়। তা থেকে 'ধ্যান', মানে, concentration বড়। তার চাইতেও বড় — সর্ব কর্মফল ত্যাগ (গীতা ১২/১২)।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। গুরুমুখে শুনে তারপর অভ্যাস করতে হয়। এরপর নিজে নিজে চিন্তা করে, বুঝে, তারপর ঐ বিষয়ে ধ্যান। ভোগ বাসনা থাকলে ধ্যানও ঠিক হয় না। তাই তাঁর দর্শন হয় না। তাই শান্তি পায় না। তাই বলছেন, সর্ব কর্মফল ত্যাগ। বলছেন, জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে ভালমন্দ যা কর সব আমাকে সমর্পণ কর। তাহলে শান্তি পাবে। অর্জুনকে এইভাবে শান্তির পথ দেখিয়ে দিলেন।

এইবার উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলছেন। উত্তম ভক্ত সর্বভূতে ভগবানকে দেখেন। তাই সকলের উপর তাঁর প্রেম। তাহলে দ্বেষ আর কাকে করবে। সকলই আপনার মিত্র। সকলের দুঃখেই তখন করুণা হয়। এইজন্য 'অদ্বেষ্টা', 'মৈত্র' ও 'করুণ'। 'নির্মম, নিরহঙ্কার' (গীতা ১২/১৩) — ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা এ বোধ হয়ে গেছে, তাই সবই ঈশ্বরের — আমার 'আমিটা' পর্যন্ত। সুখদুঃখ দুইই ঈশ্বরের প্রসাদ। এই শরীর মনও তাঁর। সুখদুঃখও তাই তাঁর — কেননা আমিটাও যে তাঁর। এখন কে আর তা হলে সুখদুঃখ বোধ করে? এর মানে এই নয় যে সুখদুঃখ বোধ হবে না। দেহ থাকলেই অবশ্য হবে। কিন্তু মনের উপর এই সবে আধিপত্য করতে পারবে না। 'ক্ষমী' মানে ক্ষমাশীল। এটিও একটি লক্ষণ ভক্তের। শক্তি থাকতেও প্রতিকার না করা ক্ষমার লক্ষণ। অন্যায় কেহ করলেও অপরের ন্যায় ধৈর্যচ্যুত হয় না। তিনি দেখেন ভগবৎ মায়ায় সে করছে তাই ক্ষমাশীল হয়। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া ক্ষমা নয়। যার উপর ক্ষমা প্রয়োগ করবে, সে ব্যক্তির আত্মগ্লানি হওয়া চাই এই ক্ষমা প্রদর্শনে।

'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী' (গীতা ১২/১৪) — ভক্তের সর্বাবস্থাতেই সন্তোষ। কেননা তিনি দেখেন ঈশ্বর আমায় এ অবস্থায় রেখেছেন, যেমন বিড়ালের ছানার মা ছাড়া উপায় নাই। সর্বদা এক ঈশ্বর চিন্তা,

তাই ‘যোগী’। যোগী স্বভাবতঃই সংযত চিত্ত হন, চঞ্চল নন, গম্ভীরাত্মা। তাই ‘দৃঢ়নিশ্চয়ঃ’ (গীতা ১২/১৪)। তাঁর মনে যে ভাব উদয় হয় উহা ঈশ্বরের আদেশ মনে করে তাতে দৃঢ়চিত্ত হন। তাই কর্তব্যে অচঞ্চল। যা করবেন বলে স্থির করেছেন জগৎ উল্টে গেলেও তা তিনি করবেন।

ভক্ত কাউকেও উদ্বেগ দেন না, নিজেও উদ্বিগ্ন হন না (গীতা ১২/১৫)। কারো কাছ থেকে কোনও প্রাপ্য নাই তাঁর। সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়ায়, নিজের কোনও বিষয়-কামনা না থাকায় হর্ষ, বিষাদ, ভয়, উদ্বেগ নাই। নিজের কিছুই নাই সব তাঁর। বাঞ্ছিত বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষ, না পেলে বিষাদ, তজ্জন্যই ভয় ও উদ্বেগ। এঁর ত্রিজগতে অন্য কোনও বাঞ্ছা নাই। বাইবেলে আছে এমন একটি চরিত্র, জোব (Job)।

কারোও অপেক্ষা নাই, তাই ‘অনপেক্ষঃ’। কেউ কিছু করে দিবেন এ ভরসা রাখেন না। একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর। ‘শুচিঃ’ অন্তর্বহিঃ শুচি। বহিঃশুচি স্নানটান দ্বারা হয়। অন্তঃশুচি হয় ভগবান চিন্তায়। ‘শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু’ বললে অন্তর শুদ্ধ হয়ে যায়। ‘দক্ষঃ’ মানে সব কাজে পটু। Sense of proportion (বিচার-বুদ্ধি) থাকে। তাই ঠাকুর বলতেন, “ভক্ত হবি তো, বোকা হবি কেন?” ‘উদাসীনঃ’ মানে ভগবানে মন নিবদ্ধ। তাই সংসারের petty things (তুচ্ছ জিনিষে) তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারে না। পক্ষপাতিত্ব নাই। ‘গতব্যথঃ’ ভক্তকে দুঃখ বিচলিত করতে পারে না আত্যন্তিক ভাবে। ঠাকুর বহু দুঃখ সয়েছেন। তাই তিনি বলতেন, ‘শ, ষ, স। যে সয় সে রয়। যে না সয় সে নাশ হয়।’ দুঃখকষ্ট আসে যায়। কিন্তু অন্তে মনকে majestic height-এ (অতি ঊর্ধে) অর্থাৎ ভগবানে তুলে দেয়। এ বোধ হয়ে যায় ভক্তের। ‘সর্বারম্ভ পরিত্যাগী’ মানে all beginnings (সব আরম্ভ) পরিত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ নূতন কাজে আর হাত দেন না। যা এসে পড়লো তাই করে যাচ্ছেন। (গীতা ১২/১৬)।

ঠিক ঠিক ভক্তের কোন দ্বন্দ্ব নাই — হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষা এর একটাও নাই। কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষ, অপ্রাপ্তিতে দ্বেষ হয়।

আবার বাঞ্ছিত বস্তু হারিয়ে গেলে শোক হয়। ভক্তের ঈশ্বর ছাড়া কোনও বাঞ্ছা নাই। তাই ‘শুভ-অশুভ’ বোধ নাই। সব শুভ তাঁর কাছে। তিনি দেখেন, যা আমরা মন্দ বলে দেখি তাও কল্যাণকর। কেননা, তা যে ঈশ্বরেচ্ছায় হচ্ছে। ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময়। তাই হর্ষদ্বেষাদি নাই। (গীতা ১২/১৭)।

ভক্ত শত্রুমিত্রে সমান, মান অপমানে সমান, শীতউষ্ণে, সুখদুঃখে সমান। নিন্দাস্তুতিতে সমান। আর সামান্যতে সন্তুষ্ট। ‘অনিকেতঃ’ — বাড়ি ঘর নাই। Personal property কিছুই নাই। যেন ঝড়ের এঁটোপাতা। বাড়ি ঘর নাই তথাপি ‘স্থির-মতিঃ’ (গীতা ১২/১৮-১৯) উন্মাদের মন অস্থির। ভক্তের মন ভগবানে সন্নিবিষ্ট। তাই স্থির বুদ্ধি, স্থিতপ্রজ্ঞ।

ভক্তের এইসব অলৌকিক লক্ষণগুলোকে ‘অমৃতং’ বলেছেন। এর মানে, যার এগুলি হয় তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি জন্ম মরণ চক্রের বাহিরে। তাই ‘অমৃত’। কিম্বা অমৃত যেমন অমর করে তেমনি এগুলিও অমর করে অর্থাৎ ভগবান লাভ করিয়ে দেয়।

এ সব লক্ষণ যিনি ভগবান দর্শন করেছেন তাঁ’তে প্রকাশিত হয়। আবার যিনি ভগবান দর্শনের চেষ্টা করছেন তাঁর আদর্শ, তাঁর সাধন।

ঠাকুরের জীবনে এই সবগুলি দেখেছি। গীতারই জীবন ছিল কিনা! গীতা-বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম (মোহনবাঁশীর প্রতি) — তাঁতে কখনও দ্বেষ ছিল না। সবই যে তিনি হয়ে রয়েছেন তাহলে আর দ্বেষ কি করে হয়? আপন ইষ্টকে কি করে ঘৃণা করেন? ঠাকুর সকলকে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে নমস্কার করতেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সকলের ভিতর ঈশ্বর তাই সকলই মিত্র। কারোও দুঃখ দেখলে করুণায় ঠাকুরের হৃদয় বিগলিত হতো। মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থে গিছলেন। গরীবদের দেখে বড় করুণা হল। তাই মথুরকে এদের খাওয়াতে বললেন। আর এক একখানা নূতন কাপড় দেওয়ালেন। আর এক মাথা তেল। ‘আমার’ বলতে পারতেন না, বলতেন ‘এখানকার’। রামলালদের কত কষ্ট, কিন্তু তাদের জন্য

কারো কাছে কিছু চাইতে পারতেন না। মমতা নাই, অহংকারও নাই। তা বলে ভক্তের জন্য মমতা ছিল না তা নয়। ভক্তদের দেখতেন মায়ের লোক তাই মমতা রেখেছিলেন। ঠাকুরের অহঙ্কারও ঐ — আমি মায়ের কোলের শিশু, তাই বিদ্যার অহঙ্কার। এ মমতা, এ অহঙ্কার দোষের নয়। আমি বিদ্বান, আমি ধনী, আমি মানী এসব খারাপ। ইনি আমার পুত্র, ইহা আমার বাড়ি — এ মমতা খারাপ। আবার সুখদুঃখে সমান বোধ ছিল। মথুরবাবু সেবা করতেন তাতেও যেমন, তার মৃত্যুর পর ছেলেরা দেখছে না, তাতেও তেমনি। মথুরবাবুর মৃত্যুর পর খুব কষ্ট হয়েছিল সেবার। ত্রৈলোক্যরা তেমন দেখতো না। খুব ক্ষমাশীল ছিলেন ঠাকুর। মথুরবাবুর কুলগুরু কালীঘাটের একজন হালদার ছিলেন। ঠাকুরকে মথুর প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, তাঁর কথায় কত অর্থব্যয় করেন দেখে ঈর্ষা হয়েছিল ঐ হালদারের। তাই একদিন সে ঠাকুরকে পদাঘাত করেছিল মথুরবাবুর জানবাজারের বাড়িতে। ঠাকুর তখন ভাবস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পদাঘাত করে বলেছিল, বল্, তুই কি গুণ্ করেছিস মথুরকে? ঠাকুর মথুরকে সে কথা বলেন নাই। বললে রক্ষে ছিল না। টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতো তাকে।

ঠাকুরের কখনও অভাব বোধ দেখি নাই। মা যে অবস্থায় রেখেছেন তাতেই সন্তুষ্ট। মথুরবাবুর শরীর গেলে কেউ দেখবার লোক ছিল না। বেলা একটা দুটোর সময় শুকনো কড়কড়া প্রসাদ খেতেন। এদিকে পেট খারাপ। বিছানাপত্র সব ময়লা ছেঁড়া। কিন্তু তাতেও অসন্তোষ নাই, সদা সন্তুষ্ট। 'দৃঢ় নিশ্চয়' — অসুখের সময় কবরেজকে বললেন, জল খাব না, তা ছ' মাস জল খেলেন না। একদিন চৈত্র মাস, খুব গরম। ঠাকুর বলরামবাবুর বাড়ি এসে হাজির ৩টার সময়। এসে বললেন, 'বলে ফেলেছি যাব তিনটার সময় তাই এসেছি। কিন্তু ভারি ধূপ।'

তাঁ'তে হিংসাদ্বেষ ছিল না। তাই কেউ তাঁর কাছ থেকে ভয় বা উদ্বেগ পেতো না, শিশুর নিকট যেমন। কালী বাড়ির কর্ম্মচারীরা সব অন্য ভাবের লোক ছিল। ত্রিশ বছর তাঁদের সঙ্গেই রইলেন। কোনও

উদ্বেগ নাই।

কারোও উপর প্রত্যাশাও ছিল না ঠাকুরের। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বললেন, রাখলেনই বা। ওরা না দিলে আসবে কোথেকে। একজন ভক্ত (শ্রীম) তিনটা জামা নিয়ে গিছলেন। একটা রেখে দুটো ফেরৎ দিলেন। তাতে গোস্বামী মশায় ঐ কথা বলেছিলেন। ঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, না আমার সঞ্চয় করতে নেই। মা রয়েছেন। মা-ই সব দেন। তুমি অমুক রাজা আমায় মানবে, কি তুমি কেশব সেন আমায় বড় বলবে, তবে আমি বড় হবো — এ ভাব তাঁতে ছিল না।

ঠাকুরের সব জিনিষপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো। ঠাকুরের cleanliness (শুদ্ধির) এর উপর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আর সাজগোছ করে রাখা তাঁর স্বভাব ছিল। Sense of proportion-ও (বিবেচনা বুদ্ধিও) খুব ছিল। বলেছিলেন, 'আচ্ছা, এটা জলচৌকী যদি বার আনা হয়, তবে ওটা (ষ্টুল) দু'টাকা হবে কেন?' অমুক ভক্ত কাছে থেকে সেবা না করলে চলবে না, এ অপেক্ষা ছিল না। তিনি দেখতেন, মা-ই এক একজনকে এনে রাখছেন আবার সরিয়ে নিচ্ছেন। একজন ভক্ত (রাম) বললেন, 'তাহলে ও (লাটু) থাকবে এখানে ঠাকুরের সেবার জন্য'? ঠাকুর উত্তর করলেন, তার ইচ্ছে হলে থাকে তো থাক্। কারো উপর নির্ভরতা নাই। সব ভার মায়ের উপর।

ঠাকুর সংসারের কোনও জিনিষ চাইতেন না। মমতাবুদ্ধিও ছিল না। একটা জিনিষ কেউ দিলে বালকের ন্যায় আহ্লাদ করতেন। খানিকপর আর মন নাই সে জিনিষে। দশ হাজার টাকা দিতে চাইলো লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী। টাকার কথা শুনেই একেবারে মূর্ছা। বলতেন, নটোর (লাটুর) নুন দেবার ক্ষমতা নাই তবুও তাকে ভালবাসি।' কেন? নিজের শিষ্য বলে নয়, মায়ের লোক তাই।

তাঁর শত্রুমিত্রে ভেদ ছিল না। কালীবাড়ির কর্মচারীরা কত যাতনা দিতো কিন্তু তিনি সেধে গিয়ে তাদের ভাল করতেন। মান অপমানেও সমান। অত মান দিতেন কেশববাবু, তাতে লক্ষ্য নাই। আবার নন্দন বাগানে অপমান করেছে। খেতে ডাকে নাই। কিন্তু নিজে গিয়ে সেধে

খেতে বসলেন। চেয়ে নিয়ে লুচি নুন ট্যাকনা দিয়ে খেলেন। পাছে অকল্যাণ হয় গৃহস্বামীর। কিন্তু তরকারী নিলেন না, একটা অন্য রকমের মেয়ে দিতে এসেছিল!

নিন্দাস্তুতিতেও সমান ছিলেন। হাজরা মশায় নিন্দে করেন। তিনি উল্টে তাকে ভালবাসেন। নিজের দুধের হিস্যা দিলেন। আবার দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছে রেখে দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশববাবু প্রভৃতি ভক্তরা কত প্রশংসা করতেন কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

'অনিকেতঃ' (গীতা ১২/১৯) — দারোয়ান ভুল করে ঠাকুরকে বের হয়ে যেতে বললে কালীবাড়ি থেকে। অমনি চললেন হাসতে হাসতে, কাঁধে গামছাখানা। কোথায় থাকবেন সে ভাবনা নাই। ত্রৈলোক্য দেখতে পেয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাচ্ছেন ছোট ভট্চায্ মশায়? ঠাকুর বললেন, কেন, এই যে বলে পাঠালে চলে যেতে। ত্রৈলোক্য দুঃখিত হয়ে বললে, কি জালাতন, দেখুন তো, কি অন্যায়। আপনাকে কে বললে — চলে যেতে? ফিরে আসুন। আবার হাসতে হাসতে ফিরে এলেন।

ঠাকুরের জীবনে এই সব অবস্থা দেখা গিয়েছে। শাস্ত্রের এইসব সাধনের কথা যখন বুঝতে পারা যায় না তখন তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যায়। এইগুলিরই মূর্তরূপ ঠাকুর। শুধু শাস্ত্র, ভাষ্য পড়ে বোঝবার উপায় নাই — কতগুলি কথা মাত্র। কিন্তু এসব জীবনে ঘটেছে এমন লোক দেখলে বোঝা যায়, এসব কথা মাত্র নয়। এসব গুণ রূপধারণ করে আসে। সিদ্ধ পুরুষেও সবগুলি দেখা যায় না। ঠাকুরে সবগুলি দেখেছি। তিনি সিদ্ধের সিদ্ধ। অবতারাদি ঈশ্বরকোটিতে এসব প্রকাশ হয়।

বেলা সাড়ে দশটা।

মর্টন ইনষ্টিটিউসন, কলিকাতা।
২৩শে মার্চ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ৯ই চৈত্র, ১৩৩০ সাল।
রবিবার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মঠ ভক্তদের ‘বেঙ্গল ক্লাব’

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন সকাল আটটা। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে জগবন্ধু ও ছোট জিতেন বসিয়া পাঠ করিতেছেন। শ্রীম নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাতে একটি ঘৃতপূর্ণ বড় বোতল। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এটা মায়াবতীর ব্রাঞ্চে দিয়ে আসতে হবে সাধুসেবার জন্য। (ছোট জিতেনের প্রতি) ঠাকুর বলেছিলেন, সাধুসেবা করলে ভাল হয়। কি বলেন? পঞ্চবটীতে কয়েকজন সাধু এসেছেন। ঠাকুর একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) সাধুসেবার বন্দোবস্ত করতে বললেন। বলে, একটি গল্প বললেন। দ্রৌপদী নাইছেন। তখন ঘাটে একজন সাধুও নাইছিলেন। তাঁর বহির্বাস জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দেখে, দ্রৌপদী আপন বস্ত্রের অর্ধেকখানা ছিঁড়ে সাধুকে দিলেন। কৌরব সভায় বস্ত্র হরণের সময়, দ্রৌপদী আকুল হয়ে কাঁদছেন লজ্জা নিবারণের জন্য। ভগবান দর্শন দিয়ে বললেন, “তুমি কি কখনও সাধুকে বস্ত্র দান করেছিলে?” দ্রৌপদী তখন ঐ ঘটনার কথা বললেন। শুনে, ভগবান বললেন, তবে আর ভয় নাই। বস্ত্র যত টানছে তত বেড়ে যাচ্ছে। সাধুসেবার এমনি মাহাত্ম্য।

আজ ২৪শে মার্চ, ১৯২৪ সাল সোমবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৩০ সাল।

এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন, চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ মেজেতে কেহ, কম্বলে কেহ, বেঞ্চেতে কেহ বসিয়াছেন। বড় জিতেন, জগবন্ধু ও শচীনন্দন শ্রীম-র সহিত মাঝে মাঝে একথা সেকথা কহিতেছেন। এই সময় একজন ব্রহ্মচারী আসিলেন পুরুলিয়া হইতে। স্বামী কৃষ্ণানন্দ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিতে। ব্রহ্মচারী এখন বেলুড় মঠ হইতে

আসিয়াছেন। তিনি বেঞ্চেতে পশ্চিম মুখ হইয়া বসিয়াছেন। শ্রীম আনন্দের সহিত কৃষ্ণানন্দজীর খবর লইতেছেন।

ব্রহ্মচারী (অতি বিনীতভাবে) — কিছু ঠাকুরের কথা বলুন।

শ্রীম — পঞ্চবটীতে সাধু এসেছেন। ঠাকুর একজন ভক্তকে তাঁদের সেবার ব্যবস্থা করতে বললেন। (এই বলিয়া পূর্বকথিত গল্পটি বলিলেন)। ঠাকুর বলেছিলেন, সাধুসেবা করা ভাল, কি বল? কেমন এটি ভাল না?

কিছুদিন মঠে থেকে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করে তারপর ওখানে যাবেন। ঠাকুর বলতেন, সাধুসঙ্গ গৃহস্থেরও দরকার, সাধুরও দরকার। কেমন, এটি ভাল না?

কর্ম করতে হলে নিষ্কাম কর্ম করতে হয়। যেমন, আশ্রম করলাম subscription (চাঁদা) তুলে, কিন্তু নিজে ভিক্ষা করে খাব। বিবেকানন্দ বলতেন, বাবা কালী কমলীওয়ালার কথা। বলতেন, ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম ঐ একটি সাধুকে করতে দেখেছি। চাঁদা করে লাখ লাখ টাকা তুললেন। তা দিয়ে উত্তরাখণ্ডের সব রাস্তাঘাট করালেন। মাঝে মাঝে ধর্মশালা আর সদাব্রত। ঋষিকেশে সাধুদের জন্য অন্নসত্র।

তিনি নিজে জল তুলতেন, আটা ঠাসতেন, রুটি সেঁকতেন। সঙ্গে অন্য লোকও কেহ কেহ সাহায্য করতো। সাধুদের সেই রুটি দিচ্ছেন। নিজেও বাইরে এসে সাধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই রুটি ভিক্ষা নিচ্ছেন। এদিকে আবার ন্যাংটা। একটা কাল কম্বল মাত্র গায়ে। যেই কাজকর্ম সব ঠিক ঠিক মত চলতে লাগলো, ওমা, তিনি উধাও হয়ে গেলেন — একেবারে ডুব মারলেন disappear (অদৃশ্য) হয়ে গেলেন! আজও কেউ তাঁর খবর জানে না। এর নাম নিষ্কাম কর্ম।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিবেকানন্দ নিজেও তাই করলেন। ওয়েষ্টে এত সব মান পেলেন। এদেশে ফিরে এসে একটি মাত্র কৌপীন পরে আছেন। সব দিয়ে দিলেন গুরুভাইদের। ভক্তদের কাছে চিঠি লিখে পাঠাতেন, ‘আপনারা আমার খাওয়া পরার জোগাড় করে দিন। আমি এখন ভিক্ষে করে খাচ্ছি।’ পূর্বের ন্যায় সেয়ারের গাড়ীতে পাঁচ পয়সা দিয়ে বরানগর যাতায়াতও করলেন। খালি পা

হট্ হট্ করে চলছেন।

ঠাকুর বিবেকানন্দকে (তখন নরেন্দ্র) বলেছিলেন এইট্টিন এইট্টি ফাইভের (১৮৮৫ খৃঃ) দোলযাত্রার দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ‘বাবা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিছু হবে না।’ স্বামীজী যা করলেন একে বলে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। শোনা যায়, বাবা কালী কমলীওয়ালা স্বামীজীকে চিনতে পেরেছিলেন। তখনও তিনি আমেরিকায় যান নাই। ঋষিকেশে ছিলেন। বলেছিলেন নাকি ঐ সত্রের ভার নিতে। কিন্তু ভগবান তাঁর জন্য জগৎ সিংহাসন রচনা করে রেখেছেন। তিনি কেন যাবেন এখানে কর্ম করতে। তিনি যে জগৎকে শিক্ষা দিবেন। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) কেমন, এটি ভাল?

ব্রহ্মচারী — আচ্ছা, কামনা একেবারেই করতে নাই?

শ্রীম — নিজের জন্য নয়, — ‘লোকহিতায়’ হতে পারে। তাও আবার গুরু লাভ হলে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে করতে হয়। তিনি জানেন কিনা কোনটি মঙ্গলকর। গুরু মানে, ঈশ্বরই মানুষরূপ ধারণ করে এসেছেন। এই বিশ্বাস চাই। তাঁর আদেশ নিয়ে করা। এই পথ।

বিলেতের বিশপ-অব-নরফক্ একবার লিখেছিলেন ‘টাইমস’-এ। বলেছিলেন, ‘আমি জানি আমি যা বলবো তাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু কি করবো সত্যের খাতিরে আমাকে তা বলতেই হবে। সত্য প্রকাশ করতেই হবে।’

বলেছিলেন “এই যে চার্চ টার্চ হচ্ছে, মিশনারীরা সব করছেন এই সব ক্রাইষ্টের আদর্শের অনুগামী নয়। যাঁরা করছেন তাঁদের নিজের সুবিধার জন্যই এসব করছেন বলে মনে হয়। নিজের ভাল ঘর, আসবাবপত্র, চাকর, conveyance (যানবাহন) এ সব হচ্ছে। ক্রাইষ্টের শিষ্যরা যেরূপ আচরণ করতেন এখন এঁরা তা করছেন না। এসব apostolic Christianity (খ্রীষ্টশিষ্যদের আচরণীয় ধর্ম) নয়। তাঁরা ছিলেন পূর্ণ সন্ন্যাসী। তাঁদের আদর্শ ছিল ক্রাইষ্টের মহাবাক্য — 'The foxes have holes and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.'(St. Matthew 8:20)” (বন্য শৃগালেরও বাসস্থান

রয়েছে গর্তে, বাতাসে উড়ে বেড়ায় যে পাখীরা — তাদেরও বাসা আছে, কিন্তু ঈশ্বর পুত্র ক্রাইষ্টের মাথা গুঁজবার স্থান নাই)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'আমি' যায় না কিনা, তাই ভক্তের 'আমি' নিয়ে থাকা ভাল। বটগাছের ফেকড়ী বেরোবেই হাজার কাট। তবে একেবারে যায় সমাধি হলে। তা ঠাকুরের হয়েছিল। একটি সাধুর (স্বামী দয়ানন্দর) ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুরের তখন সমাধি। একটি ভক্ত বলছেন, 'দেখুন, দেখুন, সমাধি — ইসকো সমাধি বোলতে হ্যায়।' সাধুটি সমাধির কথা পড়েছেন, শুনেছেন, দেখেন নাই। তখন অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — আপনারা ওখানে (পুরুলিয়ায়) রয়েছেন। ওখানকার মত একটি গান করে শোনান না। আপনারা যেখানে আছেন — অমন সব স্থানে শান্ত নির্জন বনে, বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। উপনিষদের আর একটি নাম আরণ্যক। অরণ্যে বলা হয়েছিল বলে আরণ্যক।

দুটি কথা আছে — গৃহ ও বন। 'গৃহ' মানে যেখানে বিষয়ের কথা হয়। 'বন' যেখানে ঈশ্বরের কথা হয়। চৈতন্যদেব বিষয় কথাকে গ্রাম্য কথা বলতেন। বলতেন, 'গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে।' কৃষ্ণানন্দের ঐ বনেই বাস করার adaptation (অভ্যাস) হয়ে গেছে, নির্জনে থাকতে ভালবাসে।

ব্রহ্মচারী একটি রামকৃষ্ণ স্তোত্র আবৃত্তি করিলেন। তারপর একটি ভজন গাহিতেছেন।

গান। জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ, জয় ভব ভয়হারী হে।
জয়তু জয়তু পরমব্রহ্ম, জয় নররূপ ধারী হে।।
কামকাঞ্চন আঁধারে ধরণী ডুবিল হেরে।
উদিল সূর্য অমিত বীর্য্য; যুগে যুগে অবতরী হে।।
মহাসমন্বয় তরে, রামকৃষ্ণ একাধারে।
ডাকছ কেন সকাতরে, জগতের নরনারী হে।।
শুনেছি অভয় বাণী তুমি জগৎ চিন্তামণি।
তোমারি দ্বারে অতি কাতরে, এসেছি দীন ভিখারী হে।।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আশ্রমে কত মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাই ইচ্ছা হয় আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়াই। কত লোক আসছে, মহৎ সব লোক। ওখানে (গদাধর আশ্রমে) কত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কুঁড়া ফেলেছে কি না। (বড় জিতেনের প্রতি) বুঝলেন, দিঘিতে কুঁড়া ফেললে, বড় বড় মাছ উপরে ভেসে আসে। কুড়া মানে ঈশ্বরে ভক্তি।

ঈশ্বরই সব করছেন। চেষ্টাও তিনি। গীতায় আছে, ‘পৌরুষং নৃষু’ (গীতা ৭/৮) চেষ্টাও তিনি দেন আবার বসিয়েও তিনিই রাখেন।

বড় জিতেন — ক্ষুধায় লোক ছট্‌ফট্‌ কেন করে তা হলে?

শ্রীম — তিনিই এ ছটফটানি দিচ্ছেন অন্নের জন্য ব্যাকুলতা।

মহেন্দ্র ডাক্তার ঠাকুরকে বললেন, ‘তুমি তাহলে বক্‌ছো কেন?’ ঠাকুর বলতেন কিনা, মা-ই সব করছেন। ঠাকুর ঝট্‌ করে উত্তর দিচ্ছেন, ‘তিনি বকাচ্ছেন তাই।’ বস্‌, এক কথায় ঠাণ্ডা। কেমন ready answer (তৈরী জবাব)।

আগুন আছে বলে নিচে, দুধ ভুস্‌ ভুস্‌ করছে। আগুন টেনে ন্যাও। তখন আর ভুসভুসানি থাকবে না।

ব্রহ্মচারী — তাহলে ভালমন্দ সবই তিনি করছেন।

শ্রীম — তাঁর কাছে ভালমন্দ নাই, সব ভাল। কারণ সব তিনি যে করছেন। আবার সব তিনিই হয়ে রয়েছেন। ভালমন্দ এ সব আমাদের কাছে। তিনিই আবার মানুষ হয়ে এসে বলে যান, তোমরা এই ভালটা ন্যাও, খারাপটা মন্দটা ছেড়ে দাও। তাহলে আমার কাছে শীঘ্র যেতে পারবে। বস্তুতঃ ভালমন্দ নাই ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ (ছান্দোগ্য উপনিষদ — ৩/১৪/১)। ঠাকুর বলতেন, ‘মা-ই সব হয়ে রয়েছেন, আমি দেখছি, এতে আর কি বিচার করবো।’ কেউ কাটতে পারে এ কথা?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শুনতে পাচ্ছি, চিকাগোতে রোজ এক ঘন্টা শূয়রের বাচ্চা কাটা হয়। অত সব বাচ্চা কোত্থেকেই বা আসছে, আশ্চর্য। এও তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে — এতো সব জীব হত্যা। তা

তিনি ইচ্ছা করলে এইক্ষণে বন্ধ করে দিতে পারেন। সব তাঁর ইচ্ছা। ঠাকুর রামপ্রসাদের গান গেয়ে এ কথাটি বলতেন, ‘তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।’ এই যে অতবড় যুদ্ধটা (প্রথম বিশ্বসমর, 1914) হলো তা কি আর মানুষের ইচ্ছায় হয়েছে? তাঁরই ইচ্ছায় হয়েছে। কি গানের প্রথম লাইনটা?

অন্তেবাসী — সকলই তোমার ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥

ব্রহ্মচারী (শ্রীম-র প্রতি) — তা হলে, মনে করতে হবে সবই তিনি করছেন?

শ্রীম — শুধু তা করলে কি হবে? রোজ প্রার্থনা করতে হবে এটি বুঝিয়ে দেবার জন্য ধারণা যাতে হয়। বাজনার বোল সকলেই মুখস্থ করতে পারে, কিন্তু হাতে আনা বড় শক্ত।

ব্রহ্মচারী — এখনতো ভক্তিযোগই ভাল?

শ্রীম — কি আর করা, ‘আমি’ যখন যাবার নয়। যার আমি গেছে সে পারে অন্য রকম। কিন্তু কটা লোকের ‘আমি’ গেছে বা যায়? আমরা ঠাকুরকে দেখেছিলাম বলে বুঝতে পারছি ‘আমি’ যাওয়া ব্যাপারটা কি — এ বোঝা পণ্ডিতদের কর্ম নয়। ওরা শুধু self-delusion, self-deception (আত্মবিস্মৃতি, আত্মপ্রবঞ্চনা) নিয়ে আছে।

ডাক্তার বক্সী ও বিনয়ের প্রবেশ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য কয়দিন থেকেই ইচ্ছা হচ্ছে। আজ কুয়াসার জন্য সাহস করি নাই। স্টীমার বোধ হয় বন্ধ ছিল, ট্রাম হয়তো ছিল, থাকা উচিত। বিকালে বিচার করলাম, মন কেন এতো ব্যাকুল হয়েছে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য। বুড়ো মানুষ, প্রাণটি হয়তো বের হয়ে যাবে রাস্তায়। মনকে বোঝালাম কেন মনে মনে গেলেও তো হয়। সমানই দর্শন হয়। এরপরই analyse (বিশ্লেষণ) করে সব দেখে তারপর synthesise (একত্রে সমন্বয়) করলাম। তখন সবটা যেন ধপ করে মনে ভেসে উঠলো। এদিকার সাতটি সিঁড়ি (কালী মন্দিরে ওঠার), নাটমন্দির, রাধাকান্ত, কালী

মন্দির, অঙ্গন, গঙ্গার ঘাট, ন’বত, পঞ্চবটী, বেলতলা, পুকুর প্রভৃতি একে একে দেখে তারপর একসঙ্গে সমগ্র বাগানটি দর্শন হ’ল।

শাস্ত্রে তাই পরিক্রমার কথা আছে। তীর্থে গেলে অন্ততঃ তিনবার পরিক্রমা করা উচিত। পরিক্রমার মানে হলো, ঘুরে ফিরে দেখা। তাহলে ভাল করে মনে থাকবে। তিনবার possible (সম্ভব) সকলের পক্ষেই, যে কালে মানুষ মোটেই করতে চায় না। তার বেশী করলে দোষ নাই, বরং ভাল। তাই শাস্ত্রকাররা লিখে গেছেন অন্ততঃ তিনবার কর। একবার করলেও হয় কারো কারো, যাদের power of observation আর retentive faculty খুব strong (অবলোকন শক্তি আর ধারণা শক্তি অতি প্রবল)। আবার অনেকবার করলেও দোষ নাই। তবে তিনবার করা বিধান সকলের জন্য।

তীর্থে গিয়ে কি কি করতে হয়? প্রথম, চরণামৃত নিতে হয়। দ্বিতীয়, বসতে হয়। তৃতীয়, গান কি স্তোত্র পাঠ চেঁচিয়ে করতে হয়। দক্ষিণেশ্বর গেলে মা কালী ও ঠাকুরকে গান শোনাতে হয়। চতুর্থ, কোথাও কোথাও সাধু ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। (সহাস্যে) বেশ বলে, ‘তুমি কটি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছো?’ উত্তর হলো, ‘দশটি’। এসব করলে মনে হয় কিছু করলুম। এমনই আমাদের মনের constitution (গঠন)। পঞ্চম, পূজোর জন্য ফল কি মিষ্টি কিছু হাতে করে নিয়ে যেতে হয়। ষষ্ঠ, বিত্তশাঠ্য না হওয়া। ‘বিত্ত’ মানে ধন, ‘শাঠ্য’ শঠতা, কৃপণতা। টাকা পয়সায় ফাঁকি দিতে নেই। ইষ্টিক ঘুরিয়ে ধর্ম করা। বাড়িতে এসে আবার বলা — কি বাহাদুরী!

সুরেশবাবুকে ঠাকুর তিরস্কার করেছিলেন। বৃন্দাবন, প্রয়াগ এসব তীর্থে তিনি গিছলেন। ফিরে এসে ঠাকুরকে দর্শন করতে গেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন লাগলো তীর্থ। সুরেশবাবু বললেন, ভাল, কিন্তু সাধুরাও পয়সা চায়। এক জায়গায় বললুম, কাল দিব। তার আগেই চলে এলুম। শুনে ঠাকুর ভর্ৎসনা করলেন। বললেন, ছি ছি এমন করতে হয়! এ যে মিথ্যা কথা বলা হ’ল। ফাঁকি দেওয়া হ’ল। তাছাড়া ভক্তরা না দিলে ওদেরই বা চলে কি করে।

তীর্থে গিয়ে পাণ্ডাদের হাত করতে হয়। তারা এখানে নিয়ে

যায়, ওখানে নিয়ে যায়। বলে, দাও এখানে পয়সা দাও, ওখানে পূজো দাও। লোকে ভাবে ঠকালে বুঝি। ভাবে না কি জিনিষ পেলে। পাণ্ডারা কত যত্ন করে — যেন home comfort (নিজ গৃহের সুখ) দেয়। আজকাল বাবুরা তীর্থে যায় ইষ্টিক হাতে করে। বলে, না আমাদের পাণ্ডা চাই না। ফাঁকি দিয়ে ধর্ম। আবার ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বলে, আমরা তীর্থ করে এলাম (হাস্য)। কি দুর্দশা!

যাদের পয়সা আছে তাদের দেওয়া উচিত। যাদের নাই যেমন সাধু ফকির, তাদের মনে মনে স্তব করলেই হলো।

ব্রহ্মচারী — আচ্ছা, ঠাকুর কতক্ষণ থাকতেন সমাধিতে?

শ্রীম — অনেকক্ষণ। কেশববাবুর বাড়িতে প্রায় একঘন্টা ছিলেন।

জোড়াসাঁকোতে হরিসভায়ও দীর্ঘকাল ছিলেন। অনেক জায়গায় এই হতো।

ব্রহ্মচারী এইবার বিদায় লইবেন। তাঁহাকে পরমাত্মীয়ের মত জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তাঁহার কল্যাণের পথ বলিয়া দিতেছেন।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — কিছুদিন মঠে থাকা উচিত। প্রাচীন সাধুরা সব রয়েছেন। তাঁদের সেবা করতে হয়। তাঁদের কাজকর্ম, চলনবলন watch (দর্শন) করতে হয়। গীতায় আছে, 'স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা'। কিছুদিন মঠে থেকে রং ধরলে তারপর অন্যত্র যাওয়া। কাজকর্ম, কি তপস্যা নিয়ে থাকা। প্রথম মঠে থাকা দরকার। গুরুর কাছে হাতজোড় করে নিবেদন করা যায়, আমার কিছুদিন মঠে থেকে সাধুসেবা করার ইচ্ছা, আপনি কৃপা করে অনুমতি দিলে হয়। তপস্যা করতে চাইলেও, গুরুকে বলতে হয় বিনীতভাবে, আমার কিছুদিন নির্জনে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। গুরুর অনুমতি নিয়ে করা, যা করা। কিন্তু প্রথম কিছুদিন মঠে থেকে রং ধরিয়ে নিতে হয়।

২

মর্টন স্কুল। নিচের প্রাঙ্গন। এখন অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম বেঞ্চেতে ফটকের সামনে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য, সম্মুখে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীম-র তিনদিকে ভক্তগণ বসিয়াছেন বেঞ্চেতেই। এখন অনেকগুলি

ভক্ত একত্রিত হয়েছেন। ডাক্তার, বিনয়, ছোট জিতেন, বড় অমূল্য, দুর্গাপদ, বলাই, ছোট অমূল্য, জগবন্ধু, সদানন্দ, ছোট নলিনী প্রভৃতি বসা।

শ্রীম আজ ক্লান্ত। বয়স সত্তরের উপর। আবার হার্ট খারাপ। কয়দিন থেকে দক্ষিণেশ্বরের জন্য মন ব্যাকুল। গতকালও মনোরথে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। আজ সকালে কোনও বাধা না মানিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একলাই ট্রামে চড়িয়া বাগবাজার যান। সেখান থেকে ষ্টীমারে চড়িয়া শিবতলা যান। অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ একটা experiment (পরীক্ষা) করা গেল। ষ্টীমারে চড়ে মঠ আর দক্ষিণেশ্বর দর্শন হ'ল। কোথাও নামি নাই। ঐখানে বসে দর্শন ও প্রণাম করলাম। ফিরবার সময় বড় কষ্ট হচ্ছিল। ঠাকুর বুদ্ধি দিলেন, তাই ফার্ষ্ট ক্লাশে গিয়ে বসলুম। হাওয়াতে প্রাণ এলো।

আজ শচীনন্দন মঠে গিয়েছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্র-শিষ্য। শেষের দিকে দীক্ষা নেন। তিনি আজ মঠের অধ্যক্ষের নিকট তিরস্কৃত হয়েছেন। মন খারাপ। তাই পাঁচটার সময় শ্রীম-র নিকট আসিয়া দুঃখ নিবেদন করিতেছেন। শ্রীম নানাভাবে তাঁহাকে বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, 'গুরুজনদের নিকট তিরস্কার লাভ যে পরম সৌভাগ্য। মহাপুরুষগণের তিরস্কার লাভ না হলে, শাসন না পেলে চরিত্র গঠিত হয় না। আপনার লোক যে! তাইতো অন্যায় দেখলে তিরস্কার করেন। কেন, জানেন? তাতে তার কল্যাণ হবে। মহাপুরুষদের তিরস্কার লাভ করলে বুঝা গেল, তাঁদের কৃপা হয়েছে।'

শচী ছেলেমানুষ। মনের ভার এখনও নামে নাই। তাই তাঁর সঙ্গে কখনও ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন। বাড়িতে যেমন পিতা তিরস্কার করলে খুড়া এসে আদর করে। শ্রীম-র ব্যবহারও সেইরূপ।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — 'বেঙ্গল ক্লাব' worldly man-দের (সংসারী লোকদের) কাছে যেমন, মঠ ভক্তদের কাছে তেমন। 'বেঙ্গল ক্লাবে' থাকতে গেলে চার শ'টাকা মাসে বিল। (সহাস্যে)

তুমি, ক'টাকা দিতে পার? বার টাকা, চৌদ্দ টাকা — তাহলে কি করে হয়? দাও টাকা, তবে থাক। টাকা দিবে না, তবে কেমন করে থাকবে?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমি একবার গিছলাম 'বেঙ্গল ক্লাবে' — উড্রফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। এই উড্রফ (তন্ত্রের অনুবাদক) নন, তাঁর বাবা। তিনি তখনও এড্‌ভোকেট জেনারেল হন নাই — খুব roaring practice (খুব পসার)। আমায় তিনি খুব sound advice (উপদেশ) দিছলেন। বললেন, try to rise on your own legs (নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর)। আরও বললেন, 'আমি যখন প্রথম এদেশে এলুম তখন আমায় স্মল-ক্যজ-কোর্টের চিফ্ জজ করতে চাইলেন। আমি তখনকার এড্‌ভোকেট জেনারেলের কাছে পরামর্শ চাইলাম। তিনি বললেন, 'না, না, তোমার খুব prospect (ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল) আছে। Try to stand on your own legs (নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর)।'

ওখানে সব যেন mechanically (যন্ত্রচালিতবৎ) চলছে, শব্দটি নাই। যেমন যোগে আছে সব। একশ লোক বাড়িতে, মনে হয় কেউ নাই। প্রত্যেক দরজায় কোথাও একজন, কোথাও বা দুজন চাপরাশী দাঁড়িয়ে আছে। গদাধর আশ্রমে যেতে ট্রাম থেকে দেখি, বেঙ্গল ক্লাব, আলেকজাণ্ডার ক্লাব।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — মাঠাকরুণ বলেছিলেন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে, 'ওখানে (জয়রামবাটী) বেশী ভক্ত না যায়। আমার বড়ই কষ্ট হয়।' বড় কষ্ট হতো মা'র। ভক্তরা কত কষ্ট করে রৌদ্রে হেঁটে হেঁটে যেতো। দেখলেই মা তাদের সেবা করতেন। আহারাদি সব নিজে প্রস্তুত করতেন। এমন করে খেটে খেটে শরীর যাবার মত হয়ে যায়। অন্য লোক দিয়ে বাজার করাতে হতো। কেউ তো নাই যে করে দেয়। তাই ষ্টেশনে গিয়ে বললেন, ওখানে বেশী ভক্ত না যায় এখান থেকে।

সাধুর আশ্রমে যেতে হয় সেবা করতে, সেবা নিতে নয়। সাধুরা একটা পাল্কী কাঁধে করে চালাচ্ছেন। এখন তুমি তাতে চাপতে যাচ্ছ।

বল, তুমি চাপছো কিনা। তাহলে কখনও তাঁরা রেগে একটু বললেনই বা। ওঁদের কথায় venom (বিষ) নাই, সংসারীদের কথায় যেমন থাকে। আর এঁরা মনে রাখেন না (অপ্রীতিকর ঘটনা) ওরা (গৃহীরা যেমন রাখে।

(সহাস্যে) সিন্দবাদের গল্প জান? এরেবিয়ান নাইটসে আছে। সিন্দবাদ একজন নাবিক। সে ship-wrecked-এ (জাহাজ-ডুবিতে আশ্রয়হীন) হয়েছিল। একটি island-এ (দ্বীপে) গেল সেখানে কেউ নাই। কেবল একটি বুড়োকে দেখতে পেল। বুড়ো ইসারা করলে তাকে নদী পার হতে হবে। শেষে দুজনেই নদী পার হল। বুড়োকে ঘাড়ে করে বয়ে পার করলে। কিন্তু বুড়ো আর ঘাড় থেকে নাবছে না। অনেক চেষ্টা করলে, তবুও নাবছে না। অনুনয় বিনয়, ধমক কত কি হল। কিছুতেই নাবছে না। আবার ঐখানে বসে বসে গাছের ফল পেড়ে খাচ্ছে। একবার ফেলে দেবার চেষ্টা করলে অমনি আরো চেপে বসে গেল। শেষে কি একরকম গাছের ফল খেয়ে যেই নাচতে লাগলো অমনি নিচে ফেলে দিল। তারপর পাথর দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেলল (দীর্ঘ হাস্য)। তেমনি এই। ছাড়ছে না যে। বড় মুস্কিল। মঠে রোজ পঞ্চাশজন করে খাচ্ছে। এই তো কলকাতা। এতো সব বড় লোক আছে। কে খাওয়ায় রোজ পঞ্চাশজন লোক?

ভক্ত সেবা বড় শক্ত। অন্য লোকদের সেবা করা বরং সহজ। কিন্তু ভক্তসেবা বড় মুস্কিল। এক আধদিন চলে বেশী হলেই বিপদ।

বড় জিতেন — কি করা উচিত মঠে প্রসাদ পেতে হলে?

শ্রীম — একটা good sense (সুবিবেচনা) থাকা উচিত। Invite (নিমন্ত্রণ) করলে খাওয়া উচিত। তা হলেও পূজার জন্য দিতে হয় কিছু। কিছু মিষ্টি নিয়ে যেতে হয় — হাতে করে। যদি আহার করতে হয় তবে পূজোর জন্য অন্ততঃ তিনগুণ দিতে হয়। যদি দশ টাকা খাওয়ার খরচ হয় তা হলে ত্রিশ টাকা দেওয়া উচিত। তা নইলে তো বোর্ডিং-এর অভাব নাই। যাওনা সেখানে। নিজের খাওয়াটাও পূজার অঙ্গ। পূজা মানে, প্রথম নিজের খাওয়া। দ্বিতীয়, establishment (পরিচালন) খরচ। তৃতীয়, পূজা। এই তিনটাই

পূজার অঙ্গ।

একদিন খেলে, হয়তো সাধুরাও invite (নিমন্ত্রণ) করেছেন। পয়সা কড়ি সঙ্গে নাই। তা অন্য এক দিন গিয়ে দিয়ে এলে। তবে উৎসবাদিতে যখন অনেক লোক যায় তখন অন্য কথা। তাতেও সাধ্যমত কিছু দিতে হয়।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — 'He will not come' (সে আর ফিরে আসবে না) — এই কুকুরের গল্পটি জাননা বুঝি? পূর্ণ প্রেম আর পূর্ণ সন্ন্যাস, এই দুইয়ের example (দৃষ্টান্ত)। কিছুই আর নিলে না, সব ত্যাগ। শুধু তা নয় আবার শরীর পর্যন্ত দিলে। প্রভু মরে যাওয়ায় একটি কুকুর তার কবরের উপর গিয়ে বসলো। আর নড়ছে না। ওখানেই বসে বসে শরীর দিলে। স্কুলের ছেলেরা কখনও খাবার দিত আর প্রবোধ দিয়ে বলতো, 'He will not come' (সে আর ফিরে আসবে না)। গ্রীষ্ম গেল, শীত এল, কুকুরটি ঐখানেই বসে রইল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, অধর সেনকে বলেছিলেন ঠাকুর। আজও সে কথা মনে জাগছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। বলেছিলেন, 'তাড়াতাড়ি সেরে ন্যাও, তাড়াতাড়ি।' অধর সেনও তাই করলেন। ছ' মাস ধরে আফিসের পর রোজ দক্ষিণেশ্বর যেতেন। আড়াই টাকা করে গাড়ী ভাড়া প্রতিদিন। ছ'মাস এরূপ করে তারপর শরীর গেল।

যারা এখনও জন্মায়নি ঠাকুর তাদের জন্যও provision (ব্যবস্থা) করে গেছেন। বলেছেন, 'যার যেটি ভাল লাগে সে সেটি চিন্তা কর — নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে।' 'ল'তেও বুঝি এরূপ provision (ব্যবস্থা) আছে। Unborn-দের (অজাতদের) জন্য উইল (will) করে সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারে।

বড় জিতেন — অতীনবাবু চলে গেলেন।

শ্রীম — তাই, 'তাড়াতাড়ি সেরে নাও, তাড়াতাড়ি'। অতীন চলে গেল আবার ডাক্তার কাঞ্জিলালও গেলেন।

রাত্রি সাড়ে দশটা। জগবন্ধু ও বিনয় ময়দা লইয়া ঠাকুরবাড়ি গেলেন। শ্রীম, শ্রীবাসানন্দজীকে পত্র লিখিতেছেন। উনি একদিন

আসিয়া দেখা পান নাই, তাই লেখা।

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন, উত্তরাস্য। ভক্তরা অনেকেই সম্মুখে ও পাশে বেঞ্চেতে বসা। সন্ধ্যাপ্রদীপ আসিল। প্রদীপ দেখা মাত্রই শ্রীম-র পা থেকে কাল বার্ণিশ চটিজুতা যেন আপনি খসিয়া পড়িল। আর মুখে, ‘হরি বোল হরি বোল, হাতে মৃদু করতালি। তারপর আধঘণ্টা ধ্যান।

ছোট জিতেনের প্রবেশ, হাতে কালীঘাটের মায়ের প্রসাদ। শ্রীম আলোতে প্রসাদ দর্শন, মস্তকে ধারণ ও কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট প্রসাদের ভাগ পাইলেন ভক্তগণ।

বড় জিতেনের প্রবেশ। শরীর ঘর্মাক্ত, শ্বাস চঞ্চল — স্থূলকায়। আবার বয়স পঞ্চাশের উপর। চারতলা বাহিয়া ছাদে ওঠা খুবই কষ্টকর — আবার গ্রীষ্মের মুখে। শ্রীম-র দয়া হইয়াছে। তাই সস্নেহে কষ্টের লাঘব করিতেছেন সহানুভূতি দ্বারা।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — আমি একতলা উঠি আর পনর মিনিট বিশ্রাম করি। খুব উঁচু কিনা।

বড় জিতেন (হাঁপাতে হাঁপাতে) — তাই ভাল। কলটাকে তার ভোগ দেওয়া উচিত। নয়তো কখন আবার বেরিয়ে যায়।

শ্রীম — কী আশ্চর্য! এই পঞ্চভূতের দেহ, তার ভিতর আবার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার। এই যে ‘আমি আমি’ করে, এ ‘আমি’টা কে গা? এই দেখে analogy (সাদৃশ্য জ্ঞান অনুমান) দ্বারা ঋষিরা এই universe-টার, এই ব্রহ্মাণ্ডের ও একটা ‘আমি’ আছে, তা ধরে নিলেন। তারপর যা analogy (অনুমান) ছিল, শেষে তাই revealed (প্রকটিত) হলো তাঁদের নিকট। তাই বলে, ‘যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে’। যা microcosm-এ (শরীরের ভাণ্ডে) আছে, তা এই macrocosm-এ (ব্রহ্মাণ্ডে) আছে। এই শরীরটা একটা ব্রহ্মাণ্ড in miniature (ক্ষুদ্ররূপে)। তাই ক্রাইষ্ট বলেছিলেন, 'Before Abraham was I am'. (এব্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকে আমি রয়েছি)। আবার তা থেকেই সব জিনিষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েছে সব দেশেই। তা আবার দর্শন হয়েছে, যেমন হিমালয়।

বড় জিতেন — ঠাকুর বলতেন, ('আমি'টা) পেঁয়াজের খোসার মত দেখাচ্ছে।

শ্রীম — তা নয়। সে বিচারের দিক দিয়ে। এখানে বিচার নয় 'these things were revealed unto us' (এ সব তত্ত্ব আমাদের নিকট স্বতঃ প্রকাশিত)। এ যে revelation (প্রত্যক্ষ দর্শন)।

তাই সাধুসঙ্গ করতে হয়। সাধুসঙ্গ না করলে তা বোঝা যায় না। দেখুন না, নারাণ আয়াঙ্গার সাধুসঙ্গ করে সাধু হয়ে গেলেন। সাধুসঙ্গ করলে এমন সবও দেখা যায়। তিনি ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙ্গেন। এঁদের দেখলে তবে গৃহে যারা আছে তাদের চৈতন্য হবে। গৃহীদের মধ্যে এই বিচার আপনি আসবে — এই লোকটির সব ছিল। বেশ আরামে থাকতে পারতেন। কেন তবে এই সব ছেড়ে এই কঠোর জীবন নিলেন। এ সব লোককে দেখতে হয়। মাধবাচার্য শোনা যায় কোন দেশের মন্ত্রী ছিলেন। তারপর সাধু হয়েছিলেন। এই যে আয়াঙ্গার মশায়, তাঁর ত্যাগ কত! সব আছে আবার বড় রাজকর্মচারী, সব ত্যাগ। ঈশ্বরই এইসব করাচ্ছেন। তবে অপরের চৈতন্য হবে।

ডাক্তার কার্তিক বক্সী — গুরুই তো সব করাচ্ছেন। তিনিই তো ধাক্কা মেরে নিয়ে যাবেন ঠিক পথে।

শ্রীম (ধমক্ দিয়া) — 'তোমায় ডেপোমি করতে হবে না', এই বলে একজন হাইকোর্টের উকীলকে ঠাকুর তিরস্কার করেছিলেন এরূপ প্রশ্ন করায়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁর পাদপদ্মে মন থাকে যাতে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে) — একটা গল্প আছে। একজন লোক একটা গরু মেরেছে। তা হাত দিয়ে মেরেছে কিনা, তাই সে বলছে 'ইন্দ্র গোহত্যা করেছে।' হাতের দেবতা ইন্দ্র। এখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে এসে সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বাড়ি কার? ঐ ব্যক্তি উত্তর করলে আমার। 'এ বাগান'? উত্তর হল, আমার। এই জমিদারী? আজ্ঞে, এও আমার, ঐ ব্যক্তি বললে। ছদ্মবেশী ইন্দ্র তখন হেসে প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি শুধু গো হত্যাটাই আমার? তারপর তিরস্কার করে বললেন, 'ন্যাও তোমার পাপ তুমি।

সবেতেই 'আমি' আর পাপের বেলায় 'তুমি' (সকলের উচ্চহাস্য)।

বড় জিতেন (হতাশভাবে) — এখন এই আলুনী কর্ম রুচিকর হয় কিসে?

শ্রীম — তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে করলে। তা হলেই নিষ্কাম হবে। সব কর কিন্তু তাঁর জন্য কর। তা ছাড়া উপায় নাই। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাই বললেন, 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্' (গীতা ৯/২৭)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দুজন পালোয়ানের কুস্তী হবে। একজন পনর দিন আগে থেকে খুব মাংসাদি খাচ্ছে যাতে শরীরে বল আসে। আর একজন খাওয়া কমিয়ে দিচ্ছে দিন দিন। আর সর্বদা 'মহাবীর, মহাবীর' জপ করছে। কুস্তীর দিন একেবারে উপোষ। শেষে দেখা গেল যে মাংস খেয়েছিল সে-ই হারলো। আর এর জয় হলো। কেন? না, তার মন victory-তে (বিজয়ে) ছেয়ে গেছে। যে চৌদ্দ বছর ফলমুল খেতে পারে কেবল সে-ই (লক্ষ্মণই) ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে পারে।

ওয়েলিংটন ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলির ভাই। তখন তিনি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করেন। নিজাম প্রধান মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি গিয়ে তাঁকে বললেন, 'এই নিন পনর লক্ষ টাকা, মিষ্টিমুখের জন্য। শুধু আমাদের একটু সুবিধে করে দিন।' তিনি তাঁকে 'গুড বাই' দিলেন — মানে বললেন, পথ দেখ।

এদিকে তো এই। আর অন্য দিকে কি? ইংলণ্ডে এক পরমাসুন্দরী যুবতীর সঙ্গে কোর্টসিপ হয়ে আছে, কিন্তু টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না। কি দৃঢ় চিত্ত, কি সততা। এদেশে এয়েছেনই টাকার জন্য। টাকা রোজগার করে বিয়ে করবেন। সেই টাকা হাতে পেয়েও অন্যায় বলে নিলেন না। শুধু কি এই goodness (মহত্ত্ব) আরও আছে। দেশে গেলেন ফিরে, অনেক টাকা উপায় করে নিয়ে। সেই মেয়েদের বাড়ি গেলেন। সকলে তাঁর কাছে এলো, কিন্তু ঐ মেয়ে এলো না। কি করে আসে? Pox (বসন্ত) হয়ে তার মুখশ্রী গেছে। তাই লজ্জায় আসে নাই। উনি তখন জিজ্ঞাসা করে সব ঘটনা শুনলেন। জেদ করায় তখন মুখে ঘোমটা পরে মেয়ে এলো। তিনি তখন ঘোমটা

টেনে ফেলে দিয়ে বললেন, আমার বিয়ে হবে তোমার গুণের সঙ্গে, রূপের সঙ্গে নয়। মেয়েটি যত বলছেন, তুমি অন্যত্র বিয়ে কর। তিনি তত ঐ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে লাগলেন। শেষে বিয়ে হল।

এমন সব লোক না হলে কি নেপোলিয়ানকে হারাতে পারে? কি ত্যাগ! অবশ্য এ ঈশ্বরের জন্য নয়, দেশের জন্য। তা হলেও ভাল। কারণ, যার এ বিষয়ে ত্যাগ আছে, ইচ্ছা করলে সে ঈশ্বরের জন্যও ত্যাগ করতে পারে। ঠাকুরের মহাবাক্য রয়েছে কিনা — যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। এই যে ব্রিটিশরা এতো বড় সাম্রাজ্য লাভ করেছে এমন সব মহৎ লোক না থাকলে কি তা কখনও সম্ভব হতো!

যে জিতেন্দ্রিয়, যে চৌদ্দ বছর ফলমূল খেয়ে আছে, আবার বিনিদ্র, কেবল সেই মহাবীর লক্ষ্মণই, অত বড় বীর ইন্দ্রজিৎকে হারাতে পারে। যারা জিতেন্দ্রিয় তাদের head cool (মাথা ঠাণ্ডা) হয়। তারাই খুব বড় organisation (প্রতিষ্ঠান) চালাতে পারে।

উকীল ললিত ব্যানার্জীর প্রবেশ, হাতে ঠনঠনের মা কালীর প্রসাদ। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শচীনন্দনের প্রবেশ। তার হাতেও দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর প্রসাদ। শ্রীম-র আনন্দের সীমা নাই। কাল ষ্টীমারে দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু প্রসাদ পান নাই। তাই আনন্দে বলিতেছেন, 'দেখ, মা কেমন প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর ও ঠনঠনের প্রসাদ — তিনই মায়ের প্রসাদ। আনন্দে এক একবার উঠিতেছেন, প্রসাদ দর্শন, মস্তকে ধারণ ও কণিকা গ্রহণ করিতেছেন। ভক্তরা কিন্তু, কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ ওঠাতে অত প্রসন্ন নন। শ্রীম তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, ঔষধ প্রয়োগ হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অমন জীবন্ত প্রসাদ। তাতেও বিরক্তি। কি বিপরীত সংস্কার।

ঠাকুর বিবেকানন্দের বুকে হাত দিতেই প্রায় সমাধির অবস্থা। কিন্তু কেঁদে দিলেন আর বললেন, ওগো, তুমি আমার এ কি করলে। ঘরে যে আমার বাপ মা রয়েছেন। পূর্ব সংস্কার জাগ্রত হয়েছে।

এমনি কাণ্ড। বয়স তখন আঠার উনিশ। এঁরা সব Type of man (আদর্শ মানুষ) এঁদেরই এই অবস্থা। তা অপরের ‘কা কথা’।

ঠাকুর বলেছিলেন তাই, আমার কাছে একটা মাদুর ফেলে রেখে দাও। (ভক্তরা) ঘুমুবে এসে। তা নইলে হয়তো আসবেই না। তিনি জানেন কিনা human infirmities (মানুষের দুর্বলতা)। বাইবেলে আছে, 'Jesus knew what was in man'. মানুষ দুর্বল, একথা যীশু বিলক্ষণ জানেন। তাইতো তিনবার প্রসাদ নিতে হলেই অরুচি।

শ্রীম-র হাতে কথামৃত। তৃতীয় ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড বাহির করিলেন। জগবন্ধু পাঠ করিতেছেন — শ্রীরামকৃষ্ণের দেবেন্দ্র ভবনে শুভাগমন।

মর্টন ইনস্টিটিউশান, পঞ্চাশ নম্বর আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬শে মার্চ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ। ১২ই চৈত্র, ১৩৩০, বুধবার।

সপ্তম অধ্যায়

আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই

১

মর্টন স্কুলের চারতলা। শ্রীম নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন বিছানায় উত্তরাস্য। তাঁহার পিছনে বেঞ্চেতে বসা ছোট জিতেন, বিনয় ও জগবন্ধু। শ্রীম 'ব্রাহ্মধর্ম' পাঠ করিতেছেন সুর করিয়া। এখন সকাল সাতটা। আজ ২৭শে মার্চ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

প্রথম স্তোত্র পাঠ করিলেন, 'ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়।' তারপর প্রার্থনা — 'অসতো মা সদ্গময়' (বৃহ ১/৩/২৮)। তারপর স্বাধ্যায় — 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' (তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্ল্য ১ ও ৬) — ইত্যাদি। এইবার শান্তি পাঠ করিয়া বৃহদারণ্যকের অক্ষর ব্রাহ্মণ পাঠ করিতেছেন — 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত....' (বৃহ ৩/৮/৯)।... যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ (বৃহ ৩/৮/১০)। ....তদনন্তর বাংলায় সংক্ষেপ অর্থ বলিয়া পাঠ শেষ করিলেন। এখন নিজ মন্তব্য বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি আশ্চর্য। এই বাক্যমনাতীত পুরুষ, যাঁকে অক্ষর বলে নির্দেশ করলেন ঋষিগণ, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মানুষ হয়ে আসেন। এটা কথার কথা নয়, সত্য। আমাদের সঙ্গে যে বাস করে গেলেন। একত্রে থাকা গেছে, কথা কওয়া গেছে। খাওয়ানো পরানো, মান অভিমান, স্নেহযত্ন, কত ভালবাসাবাসি হয়েছে। মানুষ হয়ে এলেন তো ঠিক মানুষের ব্যবহার ষোল আনা একেবারে।

একি ভক্তদের বানান ঈশ্বর? তা নয়। তিনি নিজেই নিজকে ঈশ্বর বলে প্রকাশ করেছেন। বলেছিলেন, এর ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ

বের হয়ে একদিন বললেন, 'আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।' আবার বললেন, দেখলাম সত্ত্বগুণের পূর্ণ আবির্ভাব।

ঋষিরা কত কষ্ট করে কত তপস্যা করে তাঁকে পেয়েছিলেন। আর আমরা ঘরে বসে তাঁকে পেয়েছি। কি আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য!

আবার ঈশ্বর ছাড়া কে বলতে পারে with full conviction and authority (পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রভুত্বের সহিত) 'আমাকে চিন্তা করলেই হবে।' 'তোমাদের আর বিশেষ কিছু করতে হবে না। আমি কে আর তোমরা কে জানলেই হলো।'

যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই ঈশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তিনিই মানুষ, অবতার হয়ে আসেন। আবার তিনিই অন্তর্যামীরূপে সকলের ভিতরে রয়েছেন, সকল চালাচ্ছেন। তিনি ভিতরে আছেন বলেই আমরা সব বেঁচে আছি। কিন্তু তাঁর মায়া এ সকল কথা বোধ হতে দেয় না সকলকে। কখনও একটু বোধ হল অমনি আবার ঢেকে দেয়।

আবার এরও উপর আছে। বেদে বলেছেন ঋষিরা, তিনিই এই সব হয়ে রয়েছেন নাম ও রূপে, চতুর্বিংশতি তত্ত্বে। ঠাকুর এটি দেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'মা-ই এইসব হয়ে রয়েছেন।' ঋষিরা দর্শন করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন দুই উপায়ে — একটা 'নেতি নেতি'র পথ, আর একটা 'ইতি ইতি' — negative and positive, both ways.

সূর্য, চন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্যু — এসব দেখে, এঁদের clocklike precision (ঘড়ির মত নিয়মানুবর্তিতা) দেখে, প্রথমে ঈশ্বরের কথা অনুমান করেন। এই বিশাল প্রকৃতিকে দেখে তার চালকের বিশাল বুদ্ধির কথা ভাবেন, আর বিরাট শক্তির কথা। তারপর ধ্যানযোগে তাঁর সাক্ষাৎকার করেন। তখন অনুমান সত্যে পরিণত হয় — theory became fact — তাঁরা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর কথা নানাভাবে describe (বর্ণনা) করেছেন। তাঁর ঠিক ঠিক স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। আকার ইঙ্গিতে খানিকটা প্রকাশ করা চলে। তাতেই কাজ হয়ে যায়। তিনিই

সুখ শান্তি ও আনন্দের খনি। জীবের চরম লক্ষ্য তিনি — 'এষা অস্য পরমাগতি।' (বৃহদারণ্যক ৪/৩/৩২)

অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম দোতলার ঘরে বসিয়াছেন — মাদুরে পূর্বাস্য। অনেকগুলি ভক্তও বসিয়া আছেন। সতীশবাবু প্রবেশ করিলেন। শ্রীম আহ্লাদে তাঁহাকে কাছে বসাইলেন। ইনি 'বসুমতী' প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত উপেন্দ্রবাবুর ছেলে। পারিবারিক কুশল প্রশ্নাদির পর কথা হইতেছে।

সতীশ — আজ এসেছি একটা প্রার্থনা নিয়ে। মাসিক বসুমতীতে ঠাকুরের কথা বের হলে লোকের খুব উপকার হয়। অনেকে আমাকে অনুরোধ করছেন আপনাকে বলতে।

শ্রীম — সে তাঁর ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছায় তো কাজ হবে না তিনি ইচ্ছা না করলে। আমরা তো কতদিন থেকে ভাবছি আর একটা পার্ট বের করলে হয়। কিন্তু হয়ে উঠছে কই। আমরা মনে করি আমরা সব করি। তা নয়, তিনিই সব করেন। ভিতরটা দেখতে পাই না কিনা, তাই বলি আমরা করি।

আজ সকালে পড়ছিলাম, ঋষিরা বলছেন, সূর্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি মৃত্যু, এইসব তাঁর ইচ্ছায় ও তাঁর ভয়ে কাজ করছে। মানুষ মনে করে তাদের ইচ্ছায় হচ্ছে। যদি তা হয়, তবে দুঃখে পড়ছে কেন, কাঁদছে কেন? পুত্রশোক করছে কেন? ইচ্ছে করে বিপদ কে নিতে চায়? যদি বল, কর্মফলে করছে। তার উত্তর, কর্মফলদাতাটি কে? কার ইচ্ছায় কর্মফল দিচ্ছে? তা নয়, সব হচ্ছে তাঁর ইচ্ছায়। এইটি বোঝাবার জন্যই শোকদুঃখ দেন তিনি। ক্রমে বোঝে। তখন নিশ্চিন্ত, শান্ত।

বড় জিতেন (প্রার্থনার স্বরে) — করিয়ে দিন না এটি!

শ্রীম — সময় হলে আপনিই হয়। অসময়ে করতে গেলে মুস্কিল আছে। অর্জুন অতবড় লোক তিনিই সইতে পারলেন না — একেবারে, 'বেপথুঃ'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — What is the first thing for spiritual advancement? It is Sadhu-sanga (The

company of the holy men). What is the second thing? It is also Sadhu-sanga. And the third thing? The same Sadhu-sanga. ধর্ম জীবনের প্রথম সহায় সাধুসঙ্গ, দ্বিতীয় তৃতীয় সহায়ও সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ বৈ ভগবান দর্শন হয় না। সাধুসঙ্গই একমাত্র পথ।

শ্রীম (সতীশের প্রতি) — তুমি খুব বড় কাজ করতে পার। যে 'বসুমতী' চালাতে পারছে, সে আরো বড় কাজ করতে পারে। বসিয়ে দিলেই হলো। দেখ না, লর্ড রিডিং — ভারতের কর্তা করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। এর আগে জজ ছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। শ্রীম-র হাতে বাঁধান কথামৃত চারপার্ট একত্রে। পাতা উল্টাইয়া প্রথম ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড বাহির করিয়া দিলেন।

অন্তেবাসী পড়িতেছেন — একজন ভক্ত (শ্রীমকে) বলিতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে — শুনেছি, মশায় ঈশ্বর দর্শন করে থাকেন। তা হলে আমাদের দেখিয়ে দিন। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, 'কর্ম চাই তবে দর্শন হয়।... ধ্যান জপ এই সব কর্ম। তাঁর নাম-গুণকীর্তনও কর্ম; আবার দান যজ্ঞ, এ সবও কর্ম।'

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — দেখুন ঠাকুর বলছেন, কর্ম চাই। পুরুষকার দরকার। চেষ্টা ছাড়া কোনও কিছু হয় না। ধ্যান জপ কীর্তন প্রার্থনা, এসব করতে করতে তাঁ'তে ভক্তি হয়। ভক্তির পরই ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার পরই দর্শন। বলতেন, যেমন অরুণোদয়ের পর সূর্যোদয় তেমনি ব্যাকুলতার পরই তিনি দর্শন দেন। কিছু না করে হয় না। কিছু করা চাই। (সহাস্যে) কিছু করতে বললেই চুপ।

পাঠক (পড়িতেছেন) — শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন — বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ — তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বই-টই তো গাইড বুক। তাঁকে দর্শনের পর কি দরকার এ সবের। তাই খড়কুটো বলতেন ঠাকুর,

মানে অনাবশ্যক বস্তু, তুচ্ছ জিনিস নিজের জন্য আর প্রয়োজন নাই। তবে লোকশিক্ষার জন্য দরকার হয়। তাও আবার বলতেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, জ্ঞানের কমতি হয় না। তিনি রাশ ঠেলে দেন। Cart load of books (গাড়ী গাড়ী বই) পড়ার চাইতে দশবার 'রাম রাম' করা ভাল।

পাঠ চলিতেছে। শ্রীম দীর্ঘকাল নিবিষ্ট হইয়া সব শুনিতেছেন। কোনও কথা নাই মুখে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ শেষ হইলে পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এতক্ষণ যা পড়া হল তার সার, ঈশ্বর-কৃপাই মূল। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হবার যো নাই। চেষ্টাও তাঁর কৃপাতেই হয়। জপ ধ্যান প্রার্থনা, কেঁদে কেঁদে বলা — এসব করলে আরও কৃপা হয়। তখনই ব্যাকুলতা হয় যার পর দর্শন হয়। এই এক দিক।

আর এক দিক্ আছে। তিনি স্বতন্ত্র। জপ ধ্যানাদি করলেই যে তাঁর দর্শন হবে এমন কোনও কথা নাই। তবে করে যাওয়া, হয় বা না হয়। কারণ এই পথেই মহাপুরুষগণ তাঁর কৃপা লাভ করেছেন, দর্শন পেয়েছেন। এর ব্যতিক্রমও আছে। হঠাৎ সিদ্ধ, স্বপ্নসিদ্ধ এ সবও আছে ঠাকুর বলেছেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসল কথা, তাঁর কৃপাতেই তাঁর দর্শন হয়, অন্য পথ নাই। নিশ্চয় করে বলতে হলে শুধু এই কথাই বলা চলে। তবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছু করা দরকার। কেমন বললেন, 'মাখন তুলতে হলে দইকে মন্থন করতে হবে, তবে মাখন পাওয়া যাবে।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এর মানে হলো individualityটাকে, বজ্জাত 'আমি'কে, eliminate (অপসারিত) করতে হবে। অথবা sublimate (সংস্কার করিতে অর্থাৎ ভক্তের 'আমি'তে পরিণত) করতে হবে। দুই-ই পথ। জ্ঞান পথেই যাও। কিম্বা ভক্তি পথেই যাও। কিছু করতে হবে।

একজন গৃহী ভক্ত — ঠাকুর বললেন, 'মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না।' আমরা কি তা পারি? আমাদের উপায়

তা হলে কি?

শ্রীম — শরণাগত হওয়া। চেষ্টা করা উচিত, চেষ্টা করেও করতে পারছি না এ অবস্থাতে শরণাগত হয় মানুষ। বলেছেন, সংসারে তিনি যখন রেখেছেন তখন সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর। তাঁ'তে আত্মসমর্পণ করে বড় লোকের বাড়ির দাসীর মত হয়ে কাজকর্ম কর। তখন দেখা যায় সবই তিনি করছেন, সব রামের ইচ্ছা! ব্যাকুল হয়ে ভার দিলে তিনি ভার লন।

আহা, ঠাকুরের কি অবস্থা! হাত মাটি করবেন, তা যেখানে বসবেন সেখানেই করতে হবে। এক টুকরো মাটি হাতে করে নিয়ে যাবার যো নাই। এমনি ত্যাগ। একি তিনি ইচ্ছা করে করেন, যেমন লোক করে থাকে? সাধকের অবস্থায় কিছু সঞ্চয় করে না কি না! তা নয়, তাঁর সঞ্চয় করবার যো নাই, মা করতে দেন না। মায়ের হাতে যেন যন্ত্র। যেমন করান তেমনি করেন।

ভক্তরা পাছে এ অবস্থা দেখে ভয় পায়, হতাশ হয়ে যায়, তাই আর একটু নামিয়ে সুরটি বেঁধে দিলেন — বড় লোকের বাড়ির ঝিয়ের মত থাক। এর উপরে আর একটা অবস্থা আছে সেটাও ত্যাগের অবস্থা। বলেছেন, ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থাক। আরও সোজা পথ বলেছেন, 'আমার চিন্তা কর।' বলছেন, 'মাইরি বলছি যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।'

শ্রীম (গৃহস্থ ভক্তের প্রতি) — দেখুন কেমন ভরসা সব। আবার বলছেন, 'সংসার করা, সন্ন্যাস করা সব রামের ইচ্ছা।' তাই তাঁর উপর ভার ফেলে দিয়ে সংসারের কাজ করে যাওয়া।

ভক্তি লাভ করে, জ্ঞানলাভ করে সংসারে থাকা যায়। কেশব সেন, উপাধ্যায় এঁরা সব ছিলেন। ঠাকুরের ভক্তরাও অনেকে গৃহে রয়েছেন। তবে ঠিক ঠিক ত্যাগ বাইরে না ছাড়লে অনেকেরই হয় না।

২

বসন্ত প্রভাত। পূর্বাকাশ অরুণ রঙে রঞ্জিত। সূর্য এখনও উঠে নাই। মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে বসিয়া শ্রীম ধ্যান করিতেছেন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। ছোট জিতেন, বিনয় ও জগবন্ধু শ্রীম-র সম্মুখে মাদুরে বসা। সকলেই ধ্যান করিতেছেন। এক ঘন্টার পর শ্রীম 'ব্রাহ্মধর্ম' পাঠ করিতেছেন বৈদিক সুরে।

শ্রীম পড়িতেছেন, 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো' (কেনো ১/২) —; 'যন্ মনসা ন মনুতে' (কেনো ১/৫) —; 'যস্যামতং তস্য মতং' (কেনো ২/৩) —; 'ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি (কেনো ২/৫)' ইত্যাদি। এইবার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চতুর্বিংশতি তত্ত্ব দিয়ে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে এ সকল তত্ত্বের অতীত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। কাজেই, এগুলি তাঁকে জানায় না। মানুষ, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভ করে — রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদির। পাছে কেউ মনে করে ঈশ্বরকেও এই সাধন দিয়ে জেনে ফেলবে, তাই সাবধান করছেন। ঋষিরা বললেন, তিনি এ সবেরও কারণ। এই উপকরণগুলি তাঁকে জানবার সহায় হলেও তারা তাঁকে জানাতে পারে না। ঠাকুর তাই বলেছেন, এক সেরা-ঘটিতে দশ সের দুধ ধরে না।

এমনি করে তিনি আমাদের এই দেহ-যন্ত্রটি বানিয়েছেন ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়ে, যে এই দেহেই তাঁর দর্শন হয়। এই নশ্বর বস্তুর সহায়ে নিত্য বস্তু লাভ হয়। ঠাকুর তাই বলতেন, এই পাঁকের ভিতর থেকে পদ্মফুল ফোটে।

শক্ত বটে, কিন্তু হয় — তাঁর কৃপায় হয়। যে ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে বদ্ধ করে মানুষকে তাঁর কৃপা হলে সেইগুলিই আবার সহায় হয় — মিত্রের কাজ করে। 'আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ত্বমিচ্ছন্' (কঠোপ. ২/১/১) — তাঁর কৃপায় বহির্মুখীন মন অন্তর্মুখীন হয়। যে বিষে প্রাণ যায় অভিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে পড়লে সেই বিষই প্রাণ রক্ষা করে।

বিষয়লিপ্ত মন বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর — 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' (কঠোপ. ১/৩/১২)। ঠাকুর বলতেন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকে জানা — 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুন্ডক ৩/২/৯)। ঠাকুর বলতেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর খবর দিলে না। অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেল।

মোহন — ওয়েষ্টের ওঁরা যে বলেন কেউ কেউ, ঈশ্বর unknown and unknowable (অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়)?

শ্রীম — ঠিকই তো বলেন ওঁরা। মলিন বুদ্ধির কাছে তো তাই। ঋষিরাও তো তাই বলেন, 'মনসা ন মনুতে' (কেনো ১/৫), 'মতং যস্য ন বেদ সঃ' (কেনো ২/৩), 'অতর্ক্যং' (কঠো ১/২/৮)। কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় when the mind is stripped of its sensuous nature (যখন মন ইন্দ্রিয়াসক্তি বিবর্জিত হয়), হেগেলের কথা। বিচার করে, মানুষের বিষয় বুদ্ধিদ্বারা তাঁকে জানা যায় না। ক্যান্টের unkown and unknownable-এর (অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের) অর্থ এই। স্বামীজীর কথাও তাই, 'অবাঙমনসগোচরং বোঝে প্রাণ বোঝে যার।'

শ্রীম (একজন যুবকের প্রতি) — 'মহতী বিনষ্টিঃ' (কেনো ২/৫) — বেদ বলছেন, মহাসর্বনাশ এই শরীরে ঈশ্বরকে জানতে না পারলে! এর অর্থ হ'ল এই — তা না হলে, জন্মমরণচক্রে পড়তে হবে। কবে আবার মানুষ-দেহ হবে তার নিশ্চয়তা নাই। কেবল মানুষ-দেহেই আত্মদর্শন হয় কি না। তাই বলছেন, এই দুর্লভ দেহ পেয়ে তাঁকে না জানতে পারলে মহাসর্বনাশ। ঠাকুর এইজন্য অধরবাবুকে সাবধান করে বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি সেরে ন্যাও। কখন দেহ চলে যায় তার ঠিক নাই। ছ'মাস পরেই অধরবাবুর দেহ গেল।

যাঁর ব্রহ্মদর্শন হয়েছে তিনি সর্বভূতে তাঁকেই দেখেন। এই নাম-রূপবান জগৎ চোখের সামনে ভাসলেও মন তাতে যায় না। মন যায় যিনি জগতের অধিষ্ঠান তাঁ'তে। ঠাকুরের এইরূপ দর্শন হয়েছিল। বলেছিলেন, সব মোম দিয়ে (শুদ্ধচৈতন্যে) ঢাকা — বাগান, গাছপালা,

ফুলফল, মালি সব মোমের তৈরী। সমাধির পর, point of contactএ (চৈতন্য আর জগতের সংযোগ স্থলে) এসে একথা বলেছেন। দু'টি circle (বৃত্ত), একটি ব্রহ্মচৈতন্য অপরটি জগৎ। যখন একেবারেই জগতের জ্ঞান থাকে না এই অবস্থার নাম সমাধি। সমাধি থেকে নেমে অনেকটা নিচে এলে তখন দেখা যায় তিনিই নামরূপ হয়ে রয়েছেন। ঠাকুর এ অবস্থাকে বিজ্ঞানীর অবস্থা বলতেন। সমাধিতে সব একাকার তারপর সেই একই নামরূপে বহু হয়েছেন এই অবস্থা। এ অবস্থায় তিনি ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন। এটা ছিল তাঁর normal state (সাধারণ অবস্থা)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে পড়া হল — বেদ বলছেন, 'প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি' (কেনো ২/৫), তার মানে এই নয় মৃত্যুর পর অমৃত হয়। তাঁর দর্শন হলেই মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ হল। 'মৃত্যু' মানে জন্ম-মৃত্যু দুইই। মৃত্যু থাকলেই জন্মও আছে। মৃত্যুঞ্জয় যিনি তিনি জীবিত থেকেও মুক্ত, জীবন্মুক্ত।

এখন সোওয়া আটটা। শ্রীম নিজ কক্ষে বসিয়াছেন বিছানায় উত্তরাস্য। বিছানা পূর্ব-পশ্চিম লম্বমান তক্তাপোষের উপর। শ্রীম মোহনকে গীতা শুনাইতেছেন — পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসে কখন কখন নিজে নিজে আবৃত্তি করতেন — 'ব্রহ্মমায়াজীবজগৎ, ব্রহ্মমায়াজীবজগৎ'। শুনে মনে হত যেন তাঁর চোখের সামনে এই চারিটি পদার্থ জ্বল জ্বল করে ভাসছে। যেন পৃথক পৃথক ভাবে অথচ একসঙ্গে এই কাণ্ডটা দর্শন হচ্ছে। ব্রহ্মশক্তি মহামায়া এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বেদবেদান্ত সর্বশাস্ত্রের সার এই কথা। তাঁর মায়া জীবজগৎ নিয়ে খেলছেন। (দুই হাত প্রসারণ ও সঙ্কোচন ইঙ্গিত করিয়া) একবার এমন করছেন আবার অমন। যেন হারমোনিয়ামের 'বেলৌজ্' কিম্বা কামারের হাপর। একবার expand (প্রসারিত) করছেন আবার contract (সঙ্কুচিত) করছেন।

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই সব কথাই বলা হয়েছে। উপায়,

উদ্দেশ্য, সব কথা আছে এতে। এ অধ্যায়টি গীতার সার। শুধু গীতা কেন সর্বশাস্ত্রের সার। সংসারের মোহ যেতে চায় না কিনা, তাই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়ে দিচ্ছেন। বুদ্ধিটাকে টেনে উপরে উঠিয়ে দিচ্ছেন। যেমন মানুষের হওয়া স্বাভাবিক তেমনি অর্জুনের মোহ উপস্থিত। নিজের আত্মীয় কুটুম্বকে কি করে মারেন? দেহ বুদ্ধি থেকে মনকে টেনে আত্মস্থ করিয়ে দিচ্ছেন। এর স্বাদ পেলে আর নিচে নামবে না। আত্মজ্ঞান ছাড়া, ব্রহ্মদৃষ্টি ছাড়া দেহ বুদ্ধি যায় না। অর্জুনকে দিয়ে কাজটি করাতে হবে — ধর্মযুদ্ধটি। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এ ঘটনা অহরহ হচ্ছে। This is conflict between what we do and what we should do (আমরা যা করছি আর আমাদের যা করা উচিত, এই দ্বন্দ্ব)।

ঠাকুর বলতেন, 'ব্রহ্মমায়াজীবজগৎ'। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অশ্বত্থ-ক্ষর-অক্ষর-পুরুষোত্তম, — অর্থাৎ জগৎ জীব মায়াব্রহ্ম, বিলোম প্রণালীতে। অর্জুনের মন দেহে আছে। আত্মীয় কুটুম্বের দেহ বিনাশ হবে বলে শোকমোহ। তাই নিচে থেকে উপরে উঠাচ্ছেন, দেহ থেকে ব্রহ্মে। বহির্মুখীন দৃষ্টি অর্জুনের, জগতের উপর স্থূল দেহের উপর। তা থেকে উঠিয়ে প্রথম রাখলেন জীবত্বে — 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ' (গীতা ১৫/৭)। সেখান থেকে কুটস্থ চৈতন্যে, অক্ষরে, মায়োপহিত ব্রহ্মে। তারপর নিরুপাধিক ব্রহ্ম। তাঁকেই পুরুষোত্তম বলেছেন।

এই পুরুষোত্তমকে জানতে পারলে এই জীবই শিব হয়। এইজন্য অর্জুনের চোখের সামনে এই আদর্শটি ধরলেন — concrete (স্থূল) রূপে। গুণাতীত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ বললেন শ্রীকৃষ্ণ —

'নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

তবে তো ভরসা হবে অর্জুনের। শ্রীকৃষ্ণ নিজের অবস্থাটি প্রকারান্তরে বললেন। নিজে প্রচ্ছন্ন রইলেন। অর্জুন কিন্তু তখনও ধরতে পারেন নাই। একবার একটু বুঝতে পারছেন, আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। এই আলো আঁধারের খেলা চলছে। এতেই কাজ হয় কিনা। একেবারে

অজ্ঞের দ্বারা কিছু হয় না, আবার অতি বিজ্ঞের দ্বারাও হয় না। এসবই তাঁর মহামায়ার কাজ। এরপর একটা অবস্থা হলো অর্জুনের যখন বললেন 'স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ' (গীতা ১৮/৭৩)। কিছু সময়ের জন্য নিশ্চয়রূপে বুঝতে পেরেছিলেন। সেই সময়টিতে কাজ করিয়ে নিলেন। এর অব্যবহিত পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা ১৮/৬৬)। ঠিক ঠিক শরণাগত হলেই কাজ হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনটি দেখ না। তাঁর মানও নাই, মোহও নাই। দুর্যোধনরা এত অপমান করছে তবুও সেধে সেধে যাচ্ছেন শান্তি স্থাপনের জন্য। নিজের পুত্রপৌত্রাদি ঝগড়া করে মরছে তিনি সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। মানুষ যেরূপ সঙ্গে থাকে তার রং লেগে যায়। এঁর তা নাই। যেখানেই যাচ্ছেন সকলেই মনে করছে আমাদেরই লোক তিনি। কিন্তু কারোও নন্ তিনি। বৃন্দাবনে গোপীরা মনে করেছিলেন, আমাদের কান্ত শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তাদের ছেড়ে মথুরায় চলে গেলেন, তারপর দ্বারকায়, কুরুক্ষেত্রে কত কি করলেন, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত।

'অধ্যাত্মনিত্যা' মানে নিজের স্বরূপের জ্ঞান থাকে যাদের সর্বদা। শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণরূপে তা দেখতে পাওয়া যায়। নইলে কি যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বশাস্ত্র সার গীতা বলতে পারেন? নিজের জন্য কোনও কামনা নাই। একদিনের জন্যও রাজা হন নাই নিজে। কিন্তু অপরকে রাজা বানিয়েছেন। সুখদুঃখে আবার সমান। সুখদুঃখ হয় নাই তা নয়। মানুষের শরীর যখন নিয়েছেন তখন সবই ছিল। কিন্তু তাতে অভিভূত নন। পাণ্ডবদের কোর্টেও যে ভাব বিদুরের কুটীরেও সেই ভাব। কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে আর রাজসূয় যজ্ঞে একই ভাব। জীবত্ব মানে the doubting self (সংশয়াত্মা)। তাঁকে দেখলে শিবত্ব মানে beyond all doubts (সংশয়াতীত)। তাঁকেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' 'ব্রাহ্মীস্থিতি' 'গুণাতীত' বলেছেন।

ঠাকুরেরও এই অবস্থা, মান মোহ বোধ নাই। কত কটু কথা বলেছে কালীবাড়ির লোকেরা, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নাই। কিসে তাদের ভাল হয় উল্টে তা করতেন। 'নন্দনবাগানে'র ব্রাহ্মসমাজে আদর

করে নাই, কিন্তু নিজে চেয়ে খেয়ে এলেন। মোহও ছিল না। রামলালদের কত কষ্ট খাওয়াপরার। কিন্তু জগন্মাতাকে একদিনের জন্যও বলেন নাই তা দূর করবার জন্য। অক্ষয়ের জন্য শোক করেছিলেন। আবার অধর সেন, কেশব সেন এঁদের শরীর ত্যাগ হলেও কেঁদেছিলেন। কিন্তু ঐ অল্প কয়েকদিনের জন্য। তারপর ঐ কথাই আর তুলতেন না। শরীর ধারণ করেছেন কিনা তাই ভক্তদের জন্য এই শোক। 'জিতসঙ্গ-দোষা' — যেখানে ঠাকুর যান সকলেই ভাবছে আমাদেরই লোক। ব্রাহ্মসমাজের ওরা বলছে 'পরমহংস মশায় তো আমাদেরই লোক'। কর্তাভজারা মনে করতো তাদের লোক। দেশে গেছেন, গ্রামের লোকেরা মনে করছে আমাদের গদাই এলো, এবার গৃহস্থ ধর্ম করাব। মেয়েরা মনে করছে, ইনি আমাদেরই একজন। মথুরবাবুর বাড়িতে অন্দরে মেয়ে মহলে মেয়েদের সঙ্গে থাকতেন। তখন মধুরভাবে সাধন চলছে। স্ত্রীর পোষাক, চালচলন সব তাদের মত। (সহাস্যে) বলতেন, 'মেয়েদের মত এই আঙ্গুল দিয়ে (তর্জনী) কয়লার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজতাম।' সকলের সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু অন্তরে কারো সঙ্গে নাই — শুধু মায়ের সঙ্গে আছেন — সর্বদা 'মা, মা'। নিত্য আহারবিহার শরীর রক্ষা এসব বিষয়েও দেখছেন, মা-ই সব করছেন। তাই কোনও কামনা নাই নিজের জন্য। কিন্তু ভক্তদের জন্য, দুঃখী দরিদ্রের জন্য জগতের লোকের জন্য ভাবছেন। মথুরবাবুর জমিদারী লিখে দেওয়ার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন, মারোয়াড়ীর দশ হাজার টাকা নিলেন না। শরীরের সুখদুঃখ বোধও নাই। মনটা সর্বদা মগ্ন ঈশ্বরে। মথুরবাবুর অত আদরেও অন্তরে ও মুখে মা। আবার তাঁর শরীর গেলে যখন বড় কষ্ট সেবার, তখনও ঐ 'মা, মা'।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন ঠাকুরও নরেন্দ্রকে তাই বললেন। বাপ হঠাৎ মারা যাওয়ায় নরেন্দ্রের বড় কষ্ট হলো। মন বড়ই উদ্বিগ্ন, ঘরে টাকা নাই। মা ভাইবোনদের খাবার নাই। অত কষ্টেও মনকে নিচে নামতে দিলেন না। অর্জুনের ন্যায় নরেন্দ্র মা কালীর কাছে চাইলেন জ্ঞানভক্তি বিবেক-বৈরাগ্য। টাকাকড়ি, খাবার এসব চাইতে

পারলেন না। ঠাকুরের কথায় চাইতে গেলেন এসব, কিন্তু মায়ের মন্দিরে গিয়ে চাইলেন জ্ঞানভক্তি। তিন তিনবার পাঠালেন, তিনবারই চাইলেন ঐ জ্ঞানভক্তি বিবেক-বৈরাগ্য। ভাত-কাপড়ের কথা ভুলে গেলেন! মন যে ঠাকুর উপরে তুলে রেখেছেন। ঠাকুর তখন বললেন, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা মা করে রেখেছেন। ওর জন্য ভেবো না। তুমি আত্মস্থ হও।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে পুরুষোত্তমের কথা বললেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ রূপে, নররূপে সম্মুখে উপস্থিত। অর্জুন বুঝতে পারলেন না যতক্ষণ না তিনি বুঝিয়ে দিলেন। বোঝবার যো নাই। এই পুরুষোত্তমই এখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেছিলেন, 'একদিন সচ্চিদানন্দ এর (নিজের) ভিতর থেকে বের হয়ে বলছেন, আমিই যুগে যুগে অবতার হই'।

কে বুঝতে পারে এ প্রহেলিকা? যাকে বোঝান সে বোঝে।

সন্ধ্যা অতীত। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। সম্মুখে পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হইয়া ভক্তগণ বেঞ্চেতে উপবিষ্ট সামনাসামনি। গ্রীষ্মের আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীম কষ্ট অনুভব করিতেছেন।

শুকলাল, মনোরঞ্জন, ছোট জিতেন, শান্তি ও জগবন্ধু বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, ডাক্তার চারুবাবু ও ইটালীর কুঞ্জবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর অন্য ভক্তগণ। ডাক্তার চারুবাবুর বাড়ি পশ্চিমে মির্জাপুরে। তিনি পুত্রশোকগ্রস্ত। শ্রীম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তার চারুবাবুর প্রতি) — শোকতাপ এ থাকবেই। অবতারকেও সহ্য করতে হয়। যাঁরা জগতে বড় হয়েছেন প্রায় সকলকেই এ সবের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। তাই পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। বশিষ্ঠের শতপুত্র গেল। গান্ধারীরও তাই, শতপুত্র শোক। দ্রৌপদী হারালেন পাঁচটি অপোগণ্ড পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত পরিবার, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র চক্ষের সামনে ধ্বংস হলো। ঠাকুর তাই ভক্তদের শিখিয়ে দিতেন, 'আমার পুত্র বলতে নেই। বলবে, ভগবানের পুত্র। আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন।' কেন এইরূপ শিখাতেন? জানেন কিনা, কে কখন চলে যায়। তখন ভয়ানক শোক

হবে। আগে থেকেই প্রস্তুত করিয়ে নিতেন। যদি চলে যায় তবে শোকে অত অভিভূত করতে পারবে না। এতো সাবধানে যারা প্রস্তুত হয়ে চলে, শোকের সময় তাদেরই বিচার টিচার ভাসিয়ে নিয়ে যায় কিছুকালের জন্য। অবশ্য পরে তারা ground recover (পুনঃ প্রকৃতিস্থতা লাভ) করে। আর যারা মনে কর, ষোল আনা দাবী রেখে সন্তান পালন করে তাদের কি দুর্বিষহ অবস্থা! তিলে তিলে পলে পলে মানুষ করেছে — আমার ছেলে, এই বলে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত' (গীতা ২/১৪) — শোক দুঃখ সহ্য কর। এছাড়া উপায় নাই। এগুলি আছে বলেই মানুষ ঈশ্বরের সন্ধান করে। নয়তো কেউ যেতো ওপথে? তাই আদর্শটি সামনে ধরলেন, 'দ্বন্দ্বৈ বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সঙ্গৈঃ' (গীতা ১৫/৫)। সুখদুঃখ দুটোই সমানবোধ হলে তবে শান্তি। ভক্তরা তাঁর প্রসাদ বলে মনের সাম্য আনতে চেষ্টা করে। জ্ঞানীরা কর্মফল বলে সহ্য করে। আর একদল আছে এরা বলে সংসারে এসব হয়, এই বলে প্রবোধ আনে।

সুখদুঃখ, এর নামই সংসার। সংসার দ্বন্দ্বক্ষেত্র। তত্ত্বদৃষ্টিতে বিষয়সুখকেও দুঃখ বলে দেখা যায়। কারণ এই সুখের পরই দুঃখ আসবে। দুটো একসঙ্গে চলছে। তাই এ দুটোই ত্যাজ্য। এর উপর একটা সুখ আছে। সেটা একটানা সুখ। তার সঙ্গে দুঃখ নাই। তত্ত্বজ্ঞগণ কেবল ঐ সুখ চান। তারই নাম ব্রহ্মানন্দ। এই সুখের জন্য, এই শাশ্বত সুখের জন্য বিষয়সুখ ছাড়তে হয়। তাঁর কাছে এ তুচ্ছ; যেমন মিছরীপানার কাছে ওলাগুড় তুচ্ছ।

শ্রীম ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ওলাগুড় ছেড়ে মিছরীপানার আস্বাদ পেয়েছেন এমন একজন লোক এখানে এসেছিলেন। তাঁর নাম নারাণ আয়াঙ্গার মশায়। এখন হয়েছেন স্বামী শ্রীবাসানন্দ। সন্ন্যাস হয়ে গেছে মঠে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ধন-ঐশ্বর্য, আত্মীয়-স্বজন, কুলশীলমান, উচ্চরাজপদ — এ সব ছেড়েছেন। কত বড় ত্যাগ! সকলের দেখা উচিত। চলে যাবেন বলেছিলেন দিন পনর ষোল পর।

শ্রীম (সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি) — আমরা আয়াঙ্গার মশায়কে বললুম, আপনার ছেলেকে বলেছি, আজকালের সন্ন্যাস যেন কলেজের বোর্ডিংয়ে থাকা। কলেজের বোর্ডিংয়ে থাকলেও চিন্তা থাকে examination (পরীক্ষা) দিতে হয়, আবার কর্মের জন্য চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু এখানে এ সব বালাই কিছুই নাই। তা তোমাদের ভাল লাগবে। ওরা পরের দিন এসে বললে, আপনার কথা আমরা রাত্রে আলোচনা করেছিলাম। খুব আহ্লাদ হলো। ছোট ছেলে ও জামাই এসেছিল যদি ফিরিয়ে নিতে পারে।

নারাণ আয়াঙ্গার মশায় বললেন, ছেলেরা আমাকে selfish (স্বার্থপর) বলে। তা বলবে না? ওদের কত আশা ছিল। কিন্তু কি ধন যে তারা পেয়েছে তা তো বুঝতে পারছে না। এটি greatest riches, অমূল্য ধন পাচ্ছে। বাপ সাধু হয়েছেন। তাঁকে ভাবতে গিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা মনে পড়বে। এইজন্য শাস্ত্রে আছে, বংশে একজন সাধু হলে উপরের দশ পনর পুরুষ ও নিচের দশ পনর পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। তার মানে, সর্বদাই ঈশ্বরের চিন্তা হয় কিনা তাঁর চিন্তা করতে গিয়ে। এখন, ঈশ্বর চিন্তায় মুক্তি।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — শ্রীকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা দিবেন। গুরু বললেন, আমার মৃত ছেলে এনে দাও। এই তোমার দক্ষিণা। কি আর করেন, অগত্যা যমালয়ে যেতে হল। এখন, তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তারা হরিনাম শুরু করে দিল। তা শুনে আর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে যত সব পাপী ছিল তারা সব উদ্ধার হয়ে গেল। চিত্রগুপ্ত, যমের সেক্রেটারী কিনা, তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে যমকে সংবাদ দিলেন। বললেন, আপনার কর্ম এবার উঠে গেল। হরিনাম শুনে সব পাপী মুক্ত হয়ে গেছে, যমালয় শূন্য (হাস্য)। যম এসে তখন হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন, 'তবে, প্রভো, আমায়ও মুক্তি দাও' — কেন আর এ কর্মে রাখা? (সকলের হাস্য)। বেশ বলে কিন্তু কীর্তনীয়ারা।

হরিনামের এমনি মাহাত্ম্য। আয়াঙ্গার মশায়ের ছেলেরা ক্রমে বুঝবে কি অমূল্য ধন তারা পাচ্ছে পিতার কাছ থেকে। তখন আর বলবে না পিতা selfish (স্বার্থপর)।

তাই এঁকে দেখা উচিত, object lesson (আদর্শ শিক্ষা) কিনা! ঠাকুর বলতেন, পড়ার চাইতে শোনা ভাল, শোনার চাইতে দেখা ভাল। এ মনে কর প্রত্যক্ষ ত্যাগ-দর্শন, ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ।

শ্রীম কুঞ্জবাবুর সঙ্গে ইটালীর (*কলিকাতার এন্টালী এলাকা*) ‘অর্চনালয়ের’ সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছেন। অর্চনালয় ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের স্থাপিত। ঠাকুরের নিত্যসেবা রহিয়াছে। সম্প্রতি ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে।

কুঞ্জ — আশ্চর্য, আমাদের ওদিককার খ্রীষ্টানরা পর্যন্ত এতে যোগদান করেন। ওদের খুব উৎসাহ ও আনন্দ দেখা যায়। এইবার উৎসবে অনেকে এসেছিলেন, স্ত্রী-পুরুষ সব রকম বয়সের ভক্ত।

শ্রীম — ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা শুনেছেন কি না, তাই তাঁরা আসেন। ‘যত মত তত পথ’ — একথা শুনলেই মনে সাহস আসে, প্রীতির ভাব আসে। আমরা গিছলাম কঠোপনিষদের ড্রামা দেখতে বিশপ কলেজে। ললিত মহারাজ (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) সঙ্গে ছিলেন। রেভারেণ্ড পেলি খুব ভাল লোক। তিনি ভাইস প্রিন্সিপাল ঐ কলেজের। ঠাকুরের কথা শুনতে কত আহ্লাদ ও আকাঙ্ক্ষা। শুনেছেন, আমরা সেই সময়কার লোক। আমাদের কাছে তাঁর কথা শুনে কত আনন্দ। আমাদের মনে করতে লাগলেন যেন আপনার লোক। তিনিই নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিছলেন। কি energy (উৎসাহ)। তাড়াতাড়ি কঠোপনিষদের translation (অনুবাদ) করে, বম্বে গিয়ে বই ছাপিয়ে নিয়ে এলেন। আমাদের একখণ্ড আবার উপহার দিয়েছেন। খুব ভাল লোক তাঁরা। বিশপ ওয়্যলস্, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তিনিও খুব ভাল লোক। হপ্তায় (সপ্তাহে) একদিন কোনও বাগানে চলে যান। সারাদিন fast (উপবাস) করেন আর নির্জনে ঈশ্বরের নাম জপ করেন। কত মহৎ লোক ঠাকুরের কথা শুনে আসছেন আজকাল।

রাত্রি আটটা। শ্রীম নৈশ ভোজনের জন্য তিনতলায় যাইতেছেন। বাঁধান কথামৃতখানা ঘর হইতে আনাইয়া পাঠ করিতে বলিলেন। তৃতীয় ভাগ, দশম খণ্ড নিজে বাহির করিয়া দিলেন। অন্তেবাসী পাঠ করিতেছেন। দুই অধ্যায় পাঠ শেষ না হইতেই শ্রীম ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — কি পাঠ হলো?

পাঠক — ঠাকুর বলছেন, উত্তম ভক্ত দেখেন সবই ঈশ্বর দেন। আকবরকে ফকির বললেন, দেখছি সব ভিখারী। চাইতে হয় খোদার কাছেই চাইব।

আর তিন রকম সাধুর কথা হল। ঠাকুর বলছেন, উত্তম সাধুর অজগর বৃত্তি। তিনি দেখেন ঈশ্বরই সব ঠিক করে রেখেছেন আগে থেকে। ছেলে হবার আগেই ঈশ্বর মায়ের স্তনে দুধ রেখে দিয়েছেন শুনে ব্রহ্মচারী আর ভিক্ষা করতে গেলেন না। ভাবলেন, যিনি এতো ভাবেন তিনিই আমার আহারের কথা ভাবছেন। মধ্যম সাধুর চেষ্টা আছে, 'নারায়ণ হরি' বলে গৃহস্থের দরজায় দাঁড়ায়। অধম সাধু, ভিক্ষা না দিলে ঝগড়া করে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, সহাস্যে) — বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বললেন কিনা, ভক্তরা না দিলে কে দিবে জামাটামা! তাই ঠাকুর protest (প্রতিবাদ) করলেন। তিনি বললেন, না ঈশ্বর দেন, মা দেন।

পাঠক — ঠাকুর পূর্ণিমার দিন হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি অমাবস্যা? হলধারী শুনে মনে করলেন, এতো একেবারে অব্যবস্থিত চিত্ত। এমন লোককে সবে মানছে। কি বোকা সব লোক (সকলের হাস্য)।

শ্রীম — এটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। হনুমানেরও ওই অবস্থা হতো। তখন তিথি নক্ষত্রের জ্ঞান থাকতো না। দিবারাত্রির জ্ঞান থাকে না। তখন অন্য কর্ম নাই মন ঈশ্বরে প্রায় লীন। এসব ঠাকুর নিজে বর্ণনা করেছেন নিজের অবস্থা, পড়ে বা শুনে বলেন নাই। হলধারী কি করে বুঝবেন এ অবস্থা!

বেদে যাকে বলা হয়েছে 'আপ্তকামঃ,' 'আত্মারাম' 'আত্মতৃপ্তঃ' এসব অবস্থা ঠাকুরে দেখা গিয়েছে। একেবারে ষোল আনা মন ভগবানে। জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এসব চোখেই পড়ছে না। দেখছেন কেবল তাঁকে। নামরূপের জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতো কখন কখন। একবার ছ মাস একটানা এই অবস্থা ছিল। এর একটু নিচে মন এলে নাম-রূপ দেখছেন, কিন্তু তাতে অভিনিবেশ নাই,

ভাসা ভাসা সব, যেমন নিদ্রার পূর্বে লোকের হয়ে থাকে। তখনও দেখছেন তাঁকেই, সচ্চিদানন্দ এই নাম-রূপে বিদ্যমান — এই সব হয়ে রয়েছেন। বলতেন, যার পূর্ণজ্ঞান হয় তার মন প্রাণ আত্মা সব তাঁতে সমর্পন হয়। এইরূপ ব্যক্তি ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলবেনও না, শুনবেনও না।

পাঠক — একটি কাকের গল্প বললেন। একটি কাক জলের কাছে যায় আর ফিরে আসে। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এ মহাজ্ঞানী। জল খেতে গেলে ঈশ্বরের নাম বন্ধ হয়ে যায়। তাই ফিরে আসে। এদিকে তৃষ্ণার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

শ্রীম — যেমন চাতক। ফটিক জল খাবে। ফটিক জল মানে বৃষ্টির নির্মল জল। অর্থাৎ ভগবানের প্রেমরস। অন্য জল ছোঁবেও না। এও ঠাকুরের অবস্থা। আর কি হলো?

পাঠক — কুম্ভের কথা হলো। 'আমি' কুম্ভ যায় না।

শ্রীম — বেদান্তবাদীদের এই ভাব — আমি সেই 'সোঽহং' সমাধিতে যায়, নিচে নেমে এলেই আবার ঐ 'আমি'। ন্যাংটা, ঠাকুরকে বলেছিলেন — 'মন বুদ্ধিতে লয় কর, বুদ্ধিকে আত্মায়। তা হলেই স্ব-স্বরূপে থাকবে।' ঠাকুর হরিশকে বলেছিলেন, সোনার উপর কতক মাটি পড়েছে। সেই মাটি ফেলে দেওয়া।

বলতেন, 'আমি' যায় না। হাজার চেষ্টা কর আবার এসে পড়ে। তাই ব্যবস্থা দিলেন, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। ভক্তরা এই 'আমি' রেখে দেন, যেমন হনুমান, প্রহ্লাদ। এঁদের ব্রহ্মজ্ঞানও ছিল আবার ভক্তের 'আমি'ও ছিল। নারদ, শুকদেবেরও 'দাস আমি', 'বিদ্যার আমি' ছিল। শঙ্করাচার্যেরও 'বিদ্যার আমি' ছিল। ঠাকুরের ছিল 'শিশু আমি', 'সন্তান আমি', 'নাবালক আমি'। 'বিদ্যার আমি'ও কখনও দেখা যেতো।

মোহন — আচ্ছা, সমুদ্রে কুম্ভ ভাসছে। তার ভিতর বাহির জল। যদি ভেঙ্গে যায় তা হলে তো আর কুম্ভ রইলো না। জলে জল হয়ে গেল — সব জল।

শ্রীম — এ সব বিচার করে বোঝা যায় না। ঐ অবস্থা হলে

বোঝা যায়। কুম্ভ যে ভাঙ্গছে না! সমাধিতে এক একবার ভাঙ্গে। আবার জোড়া লেগে যায়। (হাস্য) তার কি করলে? অহংকার যেতে চায় না। তাই তাঁর অধীন হয়ে থাকা। ব্রহ্মজ্ঞান হলে শরীর ঠিকই থাকে, মনের আসক্তি থাকে না। বলেছিলেন, বজ্রপাত হলে কালীঘরের কপাট ঠিকই ছিল, কিন্তু স্ক্রুগুলির মাথা খসে গেল। মানে ব্রহ্মজ্ঞানের পর মনে আসক্তি থাকে না। অহংকারের লেশ থাকে, নয়তো শরীর থাকে না। তাতে জ্ঞানের কোনও ক্ষতি বা কমতি হয় না।

'আমি তাঁর' এও জ্ঞান, 'আমিই তিনি' এও জ্ঞান। একটিকে ভক্তি বলে অপরটিকে বলে জ্ঞান। ঠাকুর বলতেন, শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান এক।

ঠাকুরের অবস্থা যেন শুকনো দেশলাই। একটু ঘষলেই আগুন বেরোয়। একটুতেই ভগবানের উদ্দীপন। একটু কথা কি গান, কী কীর্তন হলো, অমনি বেহুঁস, সমাধিস্থ। এমনটি কি আর দেখা যায়!

ভক্তরা প্রায় সকলে বিদায় লইলেন। ডাক্তার, জগবন্ধু, বিনয় রহিয়াছেন। ডাক্তার কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার (শ্রীম-র প্রতি) — পুত্রশোকে ডাক্তার চারুবাবুর বৈরাগ্য হয়েছে।

শ্রীম — দেখলেন, এই বাইরেরগুলি (শোকাদি) রেখেছেন এদিককার চৈতন্য হবে বলে। আর ভিতরকার কামক্রোধাদি রয়েছে এরা majestic height-এ (অতি উচ্চ ভূমিতে) তুলবে বলে — দমন করতে পারলে। তিনি এসব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি যে মা সর্বমঙ্গলা।

২৮শে মার্চ, ১৯২৪,
১৪ই চৈত্র ১৩৩০ শুক্রবার,
মর্টন স্কুল, ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টম অধ্যায়

আমেরিকার ফক্স ভগিনীদের দৃষ্টিতে স্বামীজী

১

মর্টন ইনষ্টিটিউসন। দোতলার বৈঠকখানা। অপরাহ্ন সাড়ে ছয়টা।

আজ ২রা এপ্রিল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, ১৯শে চৈত্র ১৩৩০ সাল, বুধবার। আমেরিকা নিবাসিনী পরম ভক্তিমতী ফক্স ভগিনীদ্বয় আসিয়াছেন। এঁরা সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর আশ্রমে সর্বদা যাতায়াত করেন। স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হন।

স্বামী সারদানন্দ ‘উদ্বোধন’ হইতে একজন সন্ন্যাসী সেবককে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। সন্ন্যাসী দোতলার ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ‘শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন আমেরিকার ভক্তরা এসেছেন।’

শ্রীম শশব্যস্ত উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া প্রতীক্ষমানা ভগিনীদ্বয়কে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ন্যায় আনন্দে আহ্বান করিলেন, 'come in please, Namaskar!' তাঁহারা নত হইয়া দুই হাতে শ্রীম-র পাদস্পর্শ করিয়া হাস্যমুখে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভগিনীদ্বয় চেয়ারে উপবিষ্ট পশ্চিমাস্য। শ্রীম ও সন্ন্যাসী তাঁহাদের সম্মুখে পূর্বাস্য বসিয়াছেন — শ্রীম ডান হাতে।

ভক্তগণও কেহ কেহ আসিয়াছেন পূর্বেই। সকলেই দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সদানন্দ ও মনোরঞ্জন মেজেতে মাদুরে বসিয়াছেন। জগবন্ধু শ্রীম-র পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই ছোট অমূল্য ও শান্তি গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম পূর্বেই ইঁহাদের সংবাদ পাইয়াছেন; মঠে আছেন। সান্‌-ফ্রান্‌সিস্‌কোর অধ্যক্ষ স্বামী প্রকাশানন্দ সম্প্রতি মঠে আসিয়াছেন।

তাঁহারই আহ্বানে এঁরা আসিয়াছেন। উভয়েই শিক্ষয়িত্রী। শ্রীম আনন্দে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন। মঠের দেওয়া নাম প্রেমিকা ও রাধিকা। প্রেমিকা জ্যেষ্ঠা।

M (to Premika) — When did you meet Swamiji (Vivekananda) and where?

Premika — I met him twice : once at San Francisco and the second time at Aukland.

M (to Radhika) — And you?

Radhika — Only once at San Francisco.

M (to Premika) — Were you young then? I suppose very young!

Premika (with a smile) — No, not very young.

সন্ন্যাসী (শ্রীম-র প্রতি) — এঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টি। আর এঁর —

শ্রীম (বিস্ময়ে কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই) — কত হবে? — এই চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ?

Sisters are smiling.

M (to Radhika) — What is your present age?

শ্রীম (প্রেমিকার প্রতি) — আপনারা কখন এবং কোথায় স্বামীজীর দর্শন লাভ করেছিলেন?

প্রেমিকা — আমি দুবার তাঁকে দর্শন করেছিলাম — একবার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে, দ্বিতীয়বার ওকল্যাণ্ডে।

শ্রীম (রাধিকার প্রতি) — আর আপনি।

রাধিকা — একবার মাত্র সানফ্রানসিস্কোতে।

শ্রীম (প্রেমিকার প্রতি) — আপনার বয়স তখন হয়তো কম ছিল — মনে হয় খুবই কম ছিল?

প্রেমিকা (সহাস্যে) — না তত কম নয়।

সন্ন্যাসী (শ্রীম-র প্রতি) — এঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টি। আর এঁর

শ্রীম (বিস্ময়ে — কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই) — কত হবে — এই চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ?

ভগিনীদ্বয় হাসিতেছেন।

শ্রীম (রাধিকার প্রতি) — আপনার বয়স এখন কত হবে?

Radhika (joyfully smiling) — The spirit was never born!

M — Oh, I see, you live and speak in terms of the Absolute! Very good. Yes, we are all the same spirit, partitioned through Maya or ignorance into infinite bodies. সন্ন্যাসী (আস্তে আস্তে) এঁর ষাট প্রায়।

M — How did you both get interested in religion?

Premika — Our mother was very devoted. We got inspiration from her! She wouldn't go so much to the church. But she would pray at home closing the door for long hours. That impressed us very much. This impression ultimately led us to Swamiji.

M — Do you remember what did you find in Swamiji that impressed you most?

Both sisters — His snow-white purity and dynamic spirituality.

রাধিকা (সাহ্লাদে) — আত্মা অজন্মা।

শ্রীম — বেশ বেশ, দেখতে পাচ্ছি আপনি পরমাত্ম চিন্তায় সদা নিমগ্ন আর ঐ ভাবেই কথাও কন। সত্যিই তো আমরা সকলেই এক অদ্বিতীয় সত্তা — কেবলমাত্র মায়াতে অজ্ঞানে অনন্তরূপে প্রতিভাত।

সন্ন্যাসী (আস্তে আস্তে) — এঁর বয়স প্রায় ষাট।

শ্রীম — আপনারা কি করে ধর্মপথে আকৃষ্ট হলেন?

প্রেমিকা — আমাদের মা খুব ভক্তিমতী ছিলেন। আমরা তাঁর কাছেই প্রথমে প্রেরণা পাই। তিনি চার্চে তত যেতেন না। কিন্তু দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে দীর্ঘকাল ঈশ্বরচিন্তা করতেন। এতে আমরা খুব আকৃষ্ট হই ধর্মের প্রতি। এই আকর্ষণের ফলেই শেষে আমরা স্বামীজীর দর্শনলাভে ধন্য হই।

শ্রীম — আপনাদের কি মনে পড়ছে স্বামীজীর ভিতর কি গুণ দেখতে পেয়ে এত আকৃষ্ট হন?

উভয় ভগিনী (সমস্বরে) — স্বামীজীর চরিত্রের তুষার ধবল পবিত্রতা, আর তাঁর প্রচণ্ড জীবন্ত ধর্মের মূর্তিমানতা।

Premika (Radhika supporting) — When we heard him we felt his spirit was lifting our soul perforce much against all our intellectual barriers, to a serene and beatific stage. This living religion we hankered after. And Swamiji quenched that long thirst. So pure, so high and yet so humble, he was.*

এইবার ভক্তরা মিষ্টিমুখ করিবেন। সন্দেশ, রসগোল্লা, কমলালেবু তিনটি প্লেটে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। আর তিনটি কাঁচের গ্লাসে ডাবের জল। শ্রীম-র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসবাবুর ছেলেরা অরুণ, অজয়, অজিত ও অনিল আর মেয়ে শোভা আসিয়া দর্শন করিতেছে। শোভার বয়স নয় বৎসর, হাতে এক প্লেট খাবার। সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে লজ্জায়। শ্রীম সস্নেহে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন, "এস না; দেও এঁদের খাবার। এঁরা দেবী।" শোভা প্রেমিকার হাতে খাবারের প্লেটটি দিল। প্রেমিকা শোভাকে থালা হইতে একটি সন্দেশ তুলিয়া হাতে দিলেন। রাধিকা ও সন্ন্যাসী তাঁহাদের থালা হইতে মিষ্টি উঠাইয়া অজিত ও অনিলের হাতে দিলেন।

আহারান্তে শ্রীম ভগিনীদের সহিত পুনরায় মধুরালাপ করিতেছেন।

M (to sisters) — We will be very glad to hear a song from you. (আপনাদের একটি গান শুতে পেলে বড়ই আনন্দ হবে)।

দুই ভগিনী মিলিয়া গাহিতেছেন Nativity of Christ ক্রাইষ্টের জন্মসঙ্গীত। গানের শেষ চরণের স্বর উচ্চ হইতে ক্রমে মৃদু হইয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল — 'Oh, Jesus –— o —— h, Je—

---

*প্রেমিকা (রাধিকার অনুমোদনের সহিত) — তাঁর কণ্ঠস্বর আমাদের কর্ণে প্রবেশ করলেই মনে হত, বিচার বুদ্ধির সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া কে যেন আমাদের মনকে সবলে আকর্ষণপূর্বক এক দিব্যোজ্জ্বল প্রশান্ত গম্ভীর আনন্দময় রাজ্যে লইয়া যাইতেছে। এই মূর্তিমান জীবন্ত ধর্মই ছিল আমাদের একান্ত চির কাম্য। স্বামীজী আমাদের সেই তৃষ্ণা নির্বাপণ করেন। তাঁর কথা কত বলবো — যেমনি শুদ্ধ পবিত্র ছিল তাঁর চরিত্র তেমনি ছিল তাঁর হৃদয়টি সুমহান, তেমনি ব্যবহারে ছিলেন তিনি বিনম্র ও অমায়িক।

— su — — s!

শ্রীম নিজে একটি গান গাহিতেছেন।

গান। চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
কি অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত-হৃদয় রঞ্জন॥
নবরাগে রঞ্জিত কোটি শশী-বিনিন্দিত
কিবা বিজলী চমকে সে রূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন॥
হৃদি কমলাসনে, ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে প্রেমনয়নে অপরূপ প্রিয় দরশন॥
চিদানন্দ-রসে ভক্তিযোগাবেশে হওরে চির মগন॥

(কথামৃত ৪র্থ ভাগ/৩০শ খন্ড/২য় পরিচ্ছেদ)

প্রেমিকা গানের অর্থ না বুঝিয়াই প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। ভাবের আবেগে শ্বেতবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইল। আর নয়নদ্বয়ের কোণ বহিয়া শুভ্র অশ্রুকণা মুক্তার মালার মত অজস্র নির্গত হইতেছে।

শ্রীম-র আননে প্রতিফলিত গানের দিব্য ভাব আর সুমধুর কণ্ঠস্বর বুঝিবা ভক্তিমতী ভগিনীকে অভিভূত করিল!

এইবার শ্রীম গানের সংক্ষেপ অর্থ ইংরাজীতে বলিতেছেন।

M — Oh my mind, think on Him who is the essence of spirituality, and is stainless. Of lustre unparalleled is He, charming and sweet to the heart of the devotee. His lustre has dimmed thousands of moons. My mind, meditate on Him in the lotus of your heart with love and devotion. And then shall you have peace everlasting and love divine!

*M (to Sisters) Narendra (Swami Vivekananda) sang this song in the northern verandah leading to the Master's chamber. And the Master was plunged

*শ্রীম (ভগিনীদের প্রতি) — নরেন্দ্র এই গানটি গেয়েছিলেন ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায়। ঠাকুর গান শুনেই দাঁড়িয়ে একেবারে সমাধিস্থ। আমি ইতিপূর্বে

in *samadhi*, standing. I had not seen *samadhi* before. So I stood bewildered. A gentleman whispered to me, 'This is *samadhi'*. Narendra was the only nineteen years old. He was connected with the Brahmo Samaj. And there he had learnt this song.

কিছুক্ষণ শ্রীম নীরব রহিলেন। হয়তো সেই অপরূপ দিব্য দৃশ্য দেখিতেছেন। ঠাকুর বারান্দায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দণ্ডায়মান প্রস্তরবৎ নিশ্চল। কিন্তু মুখে কি প্রশান্তি আর সজীব আনন্দ!

শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

M — Do you know the parable of two men entering into a mango garden?

Radhika — Yes, yes.

M — One man is eating mangoes to his heart's content; and another counting the trees, different varieties and so on. He is engaged in superficial matters. 'But one thing is needful : and Mary has chosen that.......' (St. Luke 10:42)

Radhika — But a man lives even without this question.

সমাধি দেখি নাই। তাই নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। একজন ভদ্রলোক আমার কানে কানে বললেন, এরই নাম সমাধি। নরেন্দ্রের বয়স তখন উনিশ। ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত ছিল। সেখানে এই গানটি শিখেছিলেন।

শ্রীম — আপনারা কি ঠাকুরের ঐ গল্পটি জানেন — আম খেতে দুটি লোক আম বাগানে প্রবেশ করলো?

রাধিকা — হাঁ, হাঁ।

শ্রীম — একজন বাগানে প্রবেশ করেই প্রাণভরে আম খেতে আরম্ভ করলো। আর একজন হিসাব নিচ্ছে কত গাছ, কত রকমের আম এইসব। সে অনাবশ্যক বিষয়ে মনোনিবেশ করেছে। কিন্তু জীবনে একটি জিনিষই মাত্র কাম্য (ভগবৎ প্রেম) আর মেরী ঐটি নিয়ে মগ্ন।

রাধিকা — কিন্তু মানুষ এ প্রশ্নটি ছেড়ে দিয়েও বেঁচে আছে সংসারে!

M — Yes, In the impurest state such a question does not come in. If a man wants everlasting peace then this question does arise. That means he is not satisfied with the changing states of the mind — now joy, now sorrow! and so on. He wants a changeless stage. That is what Mary has chosen Love of God.

Sri Ramakrishna said, pure love and pure knowedge are one and the same thing.*

ভগিনীরা বিদায় লইতেছেন। ভারতীয় প্রথায় তাঁহারা পুনরায় শ্রীমকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীমও তাঁহাদের জানু স্পর্শ করিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। গ্রীষ্মে ইহাঁদের কষ্ট হইতেছে। শীঘ্রই আলমোড়া পাহাড়ে চলিয়া যাইবেন। বর্ষায় ঠাণ্ডা হইলে আবার নিচে নামিবেন।

শ্রীম নিম্নতলে তাঁহাদের সঙ্গে নামিলেন। স্কুল বাড়ির সামনে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাথে দাঁড়াইয়া শ্রীম তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেছেন। শ্রীম-র ইঙ্গিতে ভক্তগণ ভগিনীদের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেছেন। প্রভাসবাবু ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণ ঐরূপ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভগিনীদ্বয় চলিয়া গেলেন।

২

সন্ধ্যা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণও বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। শ্রীম সম্মুখে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে আজ শুধু আমেরিকার ভক্তগণের প্রসঙ্গ চলিতে

*শ্রীম — হাঁ অজ্ঞানাবস্থায় এ প্রশ্নের কথাই উঠে না। কিন্তু মানুষ যখন শাশ্বত সুখশান্তি চায় তখনই এর প্রয়োজন। অর্থাৎ যখন মানুষ সুখদুঃখের নিয়ত আবর্তনে উদ্বেলিত হয় তখনই সে চায় এই শাশ্বত শান্তিময় আশ্রয়টি। এইটিকেই মেরী আশ্রয় করেছে — এই ভগবৎ প্রেম।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, শুদ্ধ প্রেম আর শুদ্ধ জ্ঞান — বস্তু একটি।

লাগিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যে সব ভক্তরা স্বামীজীকে দর্শন করেছেন তাঁরা ধন্য। তাঁকে যাঁরা ভালবেসেছেন, আদর করেছেন, শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়েছেন তাঁরা আমাদের পরমাত্মীয়। আমরা তাঁদের নিকট ঋণবদ্ধ, কেন? না, স্বামীজী আর ঠাকুর অভেদ। শুনেছি, ঠাকুর সর্বদা ছায়ার মত স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন ঐ দেশে। এক একবার স্বামীজী কর্মক্লান্ত হয়ে যেই সমাধিস্থ হতে চেষ্টা করেছেন অমনি ঠাকুর এসে সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মানে তাঁকে সমাধিস্থ হতে দিলে কে তাঁর নাম প্রচার করে আর নাম প্রচার না হ'লে ভক্তদের শান্তি লাভ হয় কি করে? স্বামীজীর এই সব কাজ একটা master plan-এর (বৃহৎ পরিকল্পনার) অঙ্গ। ঠাকুর অবতার কিনা! তাঁর ভাবনা জগতের জন্য। পাশ্চাত্য জগতের জন্য বিশেষ করে। কারণ, তারা বিজ্ঞানের সহায়ে জাগতিক বিষয়ে খুব অগ্রসর হয়ে গেছে। ঐশ্বর্যে ভগবানকে ভুলে যাচ্ছে। তাই তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে ভগবানের কাছে। এই কাজে স্বামীজীকে লাগিয়েছেন।

আহা! কি ভালবাসা এঁদের স্বামীজীর উপর। অনেকে দেশ, আত্মীয় কুটুম্ব, রাজসুখ ছেড়েছেন। স্ত্রী পুরুষ ভক্তগণ কতভাবে ভালবেসেছেন। অজ্ঞাত কুলশীল স্বামীজী, কিন্তু ঠাকুর তাঁদের হৃদয়ে থেকে ভালবাসার প্রেরণা দিয়েছেন। কেউ ভাই বলে ভালবাসতেন, কেউ বন্ধু, কেউ পিতা, আবার গুরু — নানাভাবে এঁরা ভালবেসেছেন। ধর্ম ধর্ম করে লোক, মিশনারীরা কতই ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ধর্মের রূপটি কি তা তারা দেখাতে পারে না। সেই রূপ দেখেছিল স্বামীজীতে। আজও ভগিনীরা বললেন, তাঁর 'snow-white purity' (তুষারধবল পবিত্রতা), আর 'dynamic spirituality' অর্থাৎ তাঁকে ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ দেখে, তাঁরা স্বামীজীর উপর আকৃষ্ট হন। কত কোটিপতির বাড়িতে তাঁকে পরম আত্মীয়ের মত সেবা করেছে। অবতার লীলার ওঁরাও অঙ্গ। এসব আগে থেকে ঠিক করা ছিল।

এই ফক্স ভগিনীদের দেখুন না। কোথা থেকে এসেছেন ভারতে ধর্মের সন্ধানে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেছেন এখানে।

এঁরাই পূর্বজন্মে গোপিনী ছিলেন বৃন্দাবনে। ওঁদের গ্রাম তবুও পাশেই ছিল। কিন্তু এঁদের আট হাজার দশ হাজার মাইল দূরে বাড়ি। কি আকর্ষণ! তাই ঠাকুর বলেছিলেন, 'যারা আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তাদের এখানে আসতে হবে।' 'এখানে' মানে ঠাকুরের কাছে, অর্থাৎ তাঁর ভাব নিতে হবে। তবে পূর্ণকাম হবে। তিনি এসেছেনই এইজন্য — ভক্তদের তুলতে। সারা জগৎ জুড়ে যেখানে যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকছে সকলকেই ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে। আর ব্যাকুলতা। বলেছিলেন, যে ভাবেই ডাক, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। কত ভক্ত তাঁর কাছে এসেছিলেন, নানা সম্প্রদায়ের, সকলে পূর্ণকাম হয়ে ফিরেছেন। এখনও আসছে ভবিষ্যতেও আসবে। আবার অবতার না হওয়া পর্যন্ত ঠাকুরের ভাবই যুগধর্ম।

ইদানীং শ্রীম নূতন কথামৃত লিখিতেছেন — পরিশিষ্টরূপে মাসিক বসুমতীতে বাহির হইতেছে। পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বেলুড় মঠের স্বামী মাধবানন্দ শ্রীমকে কয়েকদিন পূর্বে কথাপ্রসঙ্গে অনুরোধ করিয়াছিলেন 'কথামৃত' পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম-সংবাদ দিতে। উহা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছিল পঞ্চমবর্ষে। এই বিষয় বিশেষভাবে 'উদ্বোধনে' অনুসন্ধান করিবার জন্য পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীম অন্তেবাসীকে স্বামী মাধবানন্দের নিকট অদ্বৈতাশ্রমে পাঠাইলেন। অদ্বৈতাশ্রমে 'উদ্বোধন' নাই। শ্রীম তাই অন্তেবাসীকে উদ্বোধন অফিসে গিয়া ঐ প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিয়া আনিতে বলিলেন। অন্তেবাসী রাত্রি ১০টার সময় প্রবন্ধের অর্ধেক লিখিয়া লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম ভক্তগণকে নূতন 'কথামৃত' পরিবেশনের লোভে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। অন্তেবাসী অনুলিপি পাঠ শেষ করিলেন রাত্রি এগারটায়। পরদিন শুক্রবারও উদ্বোধন অফিস হইতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইলেও ভক্তগণ বসিয়া রহিলেন। আজ অন্তেবাসীর সঙ্গে বিনয় গিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম বলিলেন, "এতে লোকের খুব উপকার হবে। বঙ্কিমবাবু একজন বিখ্যাত লোক। তাঁর সঙ্গে অমন সব কথা হয়েছে লোকে ইহা জানলে ঠাকুরের উপর দৃষ্টি পড়বে। (সহাস্যে) ঠাকুর বলেছিলেন, বাবুরা যখন খেয়েছে তখন আমড়ার

চাট্‌নী ভাল (সকলের হাস্য)। হাঁ, বড় লোকরা গ্রহণ করলে সাধারণ লোক নেয়।”

তার পর দিন শনিবার। শ্রীম বিকালে ডাক্তার বক্সীর ঘোড়ার গাড়ীতে কাঁকুড়গাছি গিয়াছিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য, একজন পীড়িত বৃদ্ধ সাধুকে সেবা। দ্বারকাদাস বাবাজী একটা বাগানে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীম ভক্তদের দ্বারা নিত্য সংবাদ লন ও তাঁর জন্য ওষুধ, পথ্য ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন। তাই আজ ডাক্তারের গাড়ীতে তাঁর সঙ্গেই গেলেন। এইসঙ্গে ঠাকুরের সমাধিস্থান যোগোদ্যান আর সুরেশবাবুর বাগানও দর্শন হইয়া গেল। ফিরিলেন রাত্রি তখন প্রায় নটা। দারুণ গরম। ঘোড়া অতিশয় ক্লান্ত। শ্রীম গাড়ী হইতে নামিয়া সইসকে দিয়া দেড় বালতি শীতল জল আনাইয়া ঘোড়াকে পান করিতে দেওয়াইলেন। যতক্ষণ না ঘোড়ার জল পান শেষ হয় ততক্ষণ শ্রীম দেহকষ্ট হইলেও দাঁড়াইয়া আছেন। জল পানের পর ঘোড়াকে ঘাস দেওয়াইলেন খাইতে।

ছাদে নিত্যকার ভক্তগণ অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীম উপরে উঠিতে উঠিতে ভক্তদের বলিতেছেন, ঠাকুর পশুদের উপর বড়ই দৃষ্টি রাখিতেন। আবার সইসদের উপরও। বলতেন, তারা মুখে বলতে পারে না। তাদের সেবা নিলে সেবা করতে হয়। তা বলবেন না? তিনিই যে অন্তর্যামীরূপে পশুদের ভিতরও রয়েছেন। তাদের সুখ-দুঃখ সব জানেন। ঘোড়ার গাড়ীতে বেশী লোক উঠতে দিতেন না, ঘোড়ার টানতে কষ্ট হবে বলে। করুণাময় ভগবান যে তিনি।

শ্রীম ছাদে বসিয়াছেন রাত্রি প্রায় দশটা। অনেক ভক্ত শ্রীম-র অপেক্ষায় বসা। কথামৃত পাঠ করিতে বলিলেন, কিন্তু পরে কি ভাবিয়া উহার অনুবাদ Gospel of Sri Ramakrishna, প্রথম ভাগ পড়িতে বলিলেন। বড় অমূল্য পড়িতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁকুড় গাছিতে সুরেন্দ্রের বাগানে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া শুনিতেছেন। পাঠ শেষ হইলে পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই সব বিবরণ literature-এ landmark (সাহিত্যে দিক্ দর্শন) হয়ে রইলো। যত কাল যাবে

ততই লোক বেশী পড়বে। আর ঐ সব স্থান দর্শন করতে যাবে। আবার এই সব খণ্ড লীলার অভিনয়ও হবে, যেমন যাত্রায় হয়ে থাকে। এইসব স্থান এখন ভক্তদের কাছে অতি পবিত্র। কিন্তু পরে সমগ্র দেশের কাছে পবিত্র বলে গৃহীত হবে। এইসব পরে national property (জাতীয় সম্পদ) হবে।

কেন যেতেন ছুটে ছুটে? ভক্তদের ভিতর ঢুকিয়ে দিতেন নিজের ভাব। ব্রাহ্মভক্তরা তাঁকে ভালবাসতেন, কিন্তু অত আসতেন না। তাই নিজে কলকাতায় গিয়ে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে আনাতেন। সুরেশবাবুর বাগানে প্রতাপ মজুমদারকে ডাকিয়ে আনালেন। ভালবাসতেন কিনা খুব। এই কথাটি বলরাব জন্য ডাকালেন — বক্তৃতা, প্রচার, ঝগড়াঝাঁটি তো অনেক হল। এখন দিন কতক সব ছেড়ে তাঁকে ডাক — Dive deep into the immortal sea of his love.

মানুষের দৃষ্টি কতটুকু! এই যে নরেন্দ্রের প্রশংসা করলেন। এর মানে আছে। তিনি জানতেন নরেন্দ্র জগৎপূজ্য হবে। প্রতাপ মজুমদারকে তখনকার দিনে এক বিখ্যাত ধর্মবক্তা বলে ওয়েষ্টের লোক জানতো — তাই এইখানে বিশেষ পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরপর আমরা দেখতে পাই, নরেন্দ্র ও প্রতাপ মজুমদার পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ানস্-এর সদস্য। এই সবই যোগাযোগ তাঁর জানা ছিল। পূর্ব থেকেই সব ঠিক করা ছিল।

(সহাস্যে) আর একটি ভক্ত, কিছুদিন দক্ষিণেশ্বর যেতে পারেন নাই কাজের ভীড়ে। তাঁকেও সংবাদ দিয়ে আনালেন। বললেন, 'অনেক দিন যাও নাই, তোমার জন্য মন কেমন করছিল'। দেখুন, কি প্রেম। এই অহেতুক প্রেম দিয়েই তো ভক্তদের বেঁধেছেন। ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন। একেবারে মানুষের ব্যবহার। যিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ তাঁর আবার মন কেমন করা কি? কিন্তু এখন লীলার জন্য অবতীর্ণ কিনা, তাই ঠিক মানুষের ব্যবহার।

আর একজনকে লক্ষ্য করে শুনালেন, 'March on until you see God, the greatest ideal of your life, এগিয়ে পড় যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে।

৩

মর্টন স্কুল। চারতলার কক্ষ। সকাল আটটা। শ্রীম নিজের বিছানার উপর বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। শ্রীম-র বামপাশে বেঞ্চেতে বসা ছোট অমূল্য ও ছোট জিতেন। জগবন্ধু ঘরে প্রবেশ করিয়া — বাবুর সম্বন্ধে সমালোচনা শুনিতে পাইলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভারি কুঁড়ে লোক — বাবু। ওর সঙ্গে যারা থাকে তারাও কুঁড়ে হয়ে যাবে। আমার ভরসা হলো না বলি ঠাকুরদের বাসন মাজার কথা। বললে হয়তো না-ই করে বসবে। পুজোটুজো হবে না ওর দ্বারা। তাই বললাম ওরা সব তৈরী করে দিবে, তুমি খালি নিবেদন করবে ফলমিষ্টি। আপনারা ব'লে ক'য়ে পারেন ওটি, তো বুঝি। (হাস্য)। কয়বার মাজা হয় বাসন?

ছোট অমূল্য — সকালে বাল্যভোগ ও আরতির বাসন, আবার দুপুর, বিকাল ও রাত্রির ভোগের বাসন।

শ্রীম — কেন, সকালে পাতায় দিলে হয় না? ভক্তিই সার। ভক্তি থাকলেই হলো। আর একবার যে মাজা হবে তাই চলবে সারা দিনরাত। অন্য সময় কেবল গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দিলেই হলো। গঙ্গাজল তো ওদিকে খুব পাওয়া যায়। তবে আর কি? কাজ সংক্ষেপ করে নিতে হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর বাড়ীর কাছে একটি বউ আছে। পাঁচ বছর হয় বিয়ে হয়েছে। এখন বয়স চৌদ্দ। ভারি ঝগড়া করে শাশুড়ীর সঙ্গে। স্বামীর বয়স ত্রিশ ছিল বিয়ের সময়। তার আবার রাঁড় আছে। (সহাস্যে) শাশুড়ী বলে, 'তুই কেমন বুঝবো যদি মা ডাক বন্ধ করাতে পারিস'। (উচ্চ হাস্যে) আর যদি রাঁড় বন্ধ করতে পারিস (সকলের হাস্য)। আমরা শুনি কিনা ঐখানে ঠাকুরবাড়িতে থেকে। রোজ ঝগড়া। হাঁ, ওকে (ভক্তকে) দিয়ে ওটি (পূজা) করাতে পারেন, তবে বুঝি আপনারা কেমন (হাস্য)।

কাশীপুর ডাক্তার বকসীর বাড়িতে ঠাকুরের নিত্য সেবা আছে। লোকের অভাবে ইদানীং সেবার কষ্ট হইতেছে। ছোট অমূল্য দেশ

হইতে আসিয়া ওখানে রহিয়াছেন। সেবার অসুবিধা দেখিয়া উনি পূজা করেন। তাঁর সঙ্গে তাই ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন।

ভক্তদের চরিত্রগঠন করবার অদ্ভুত প্রণালী শ্রীম-র। ইহাকে double operation (দুইটি কাজ) বলা যাইতে পারে। একটি অপারেশন নিজেই করেন — হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে অপরাধীকে তার দোষের কথা ব'লে। অপর অপারেশন করান অপরাধীর বন্ধুদের দিয়ে। এই ডাবল অপারেশনে ভক্তদের মনের রক্ত পূঁজ শীঘ্র বাহির হইয়া যায়। শীঘ্রই চরিত্র সংগঠিত হয়। শ্রীম-র হৃদয় শত মাতৃস্নেহের নির্ঝর।

সতীশের প্রবেশ। ইনি বড় জিতেনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। তিনি এম.এ. পাশ। হাতে করিয়া একটি নূতন মাদুর আনিয়াছেন। বলিতেছেন, 'বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা ভক্তদের বসবার জন্য।' শ্রীম বলিলেন, 'রাখ এখানে বিছানাটার উপর।' ইনি আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার সহিত কথা হইতেছে।

শ্রীম (সতীশের প্রতি) — এই ঘড়িটা দিয়েছেন একজন আমেরিকান ভক্ত। এটার নাম ইয়াংকি রেডিও লাইট। Yankee is a slang term (for the American); ইয়াংকি কথাটার অর্থ গ্রাম্য ভাষায় আমেরিকান।

খুব লোক। ডাক্তার (ই.ডব্লিউ. হামেল) এম. ডি পাশ। Elderly — বয়স ফরটি এইট। বললেন, 'ক্রাইস্টকে কি ওয়েষ্টের লোক বুঝতে পারে? তাঁকে বুঝতে হলে আগে ঠাকুরকে বোঝ। নচেৎ নয়।' খুব sound man, cool head (বিজ্ঞ লোক, আর ঠাণ্ডা মাথা)। আবার মাঝে মাঝে নির্জনে কুটীরে বাস করেন।

ফক্স সিস্টারস্‌রা এসেছিলেন তিন চারদিন হয়। তাঁরাও বললেন, 'আমাদের মা চার্চে যেতেন না। ঘরে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করতেন।'

ডাউলিং বলে একটি সাহেব ভক্ত আসেন। ইনিও বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন, 'চার্চে ওরা সব যায় মেয়েমানুষ দেখতে।' এ ওর দিকে ইসারা করছে, ও এর দিকে। এই চলে চার্চে।

জে. চৌধুরী ব্যারিষ্টার। তিনি বলেছিলেন, আমরা যখন পড়ি

তখন হাক্‌সলি (Huxley) লেকচার দিয়েছিলেন একদিন। আমার নিজের কানে শোনা। বলেছিলেন, 'এদেশের সায়েন্স দিয়ে যতটা হবার হয়েছে — agnosticism (ঈশ্বর থাকে থাকুন আমার প্রয়োজন নাই, উদাসীনতা-বাদ) এই পর্যন্ত। অর্থাৎ এই বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরতত্ত্ব জানতে হলে আস্তিক্য বুদ্ধি নিয়ে ইণ্ডিয়ার দিকে আমাদের চেয়ে থাকতে হবে। ওরা ওদিকে অনেক দূর এগিয়েছেন।' রামমোহন রায় লাইব্রেরীতে বলেছিলেন, জে. চৌধুরী।

দেখনা, পার্শি সাহেব খুব highly educated attorney আবার সূর্যের উপাসক। এঁরাও ঠাকুরকে নিচ্ছেন। এর নাম জিনওয়ালা। এম-এ পাশ। সেদিন আমাদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন, টাকা (প্রণামী) দিলেন, কপালেও সিন্দুরের টিপ নিলেন, আর হাতে চরণামৃত। আবার এক হাঁড়ি উত্তম রসগোল্লা ঠাকুরের ভোগে দিলেন। ঠাকুরের ভাব কত ছড়াচ্ছে।

পার্শি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, এম.এ-তে কি নিয়েছিলেন? বললেন, হিষ্ট্রী আর Economics (অর্থশাস্ত্র)। আমরা বললাম, বেশ। ফিলজফিতে কিচ্ছু নাই — হিষ্ট্রী বেশ। Philosophy makes darkness visible.

সতীশ উঠিবেন। তার বয়স ত্রিশ বছর। তিনি বি-এলও পাশ করিয়াছেন। বিবাহ করেন নাই।

শ্রীম (সতীশের প্রতি) — বড় মুস্কিল সংসার। ঠাকুর বলতেন, 'সংসার জ্বলন্ত অনল। মা-ঠাকরুণও তাই বলতেন। ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের বলেছিলেন, বিয়ে করিস না। বিয়ে করা জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দেওয়া।

রাত্রি আটটা। চারতলার ছাদে শ্রীম ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। কখনও দুই একটা কথা হইতেছে, কখনও নীরব। বেশ গরম পড়িয়াছে। শ্রীম-র গরমে বড় কষ্ট হয়। নিম্নতলে দক্ষিণদিকের বাড়িতে খুব সংকীর্তন হইতেছে। খোল, করতাল ও কণ্ঠের শব্দ ক্রমশঃ উঁচুতে উঠিতেছে — ধূম লাগিয়াছে। শ্রীম-র মন ঐদিকে। কিছুক্ষণ পর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আপনারা যদি নবদ্বীপের echo (প্রতিধ্বনি) শুনতে চান তবে ঐ শুনুন কীর্তন হচ্ছে খুব উৎসাহের সঙ্গে — 'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ'। এমন কীর্তন নবদ্বীপে হতো, চৈতন্যদেবের সময়।

যারা কর্ম নিয়ে আছে তাদের এসব ভাল লাগে না। কাজের অনেক ক্ষতি হয়। যাদের তা নাই তাদের বেশ। ওরা তাই বলতো কাজীর নিকট নালিশ করবে।

আহা, এই জিনিষ শুধু বাংলায় পাবেন — অন্য দেশে নাই। এমন নিয়ম করেছেন, চব্বিশ ঘন্টা কীর্তন। নাম তো নেবে না ইচ্ছা করে। আচ্ছা, অনবরত চব্বিশ ঘন্টা ধরে কীর্তন হচ্ছে তাই। অনিচ্ছায়ও কানে ঢুকবে নাম। তখন হয়তো নাম নেবে লোক। কত ভাবনা ভগবানের, ভক্তদের জন্য। ঠাকুরবাড়ির পাশে হয়েছিল চব্বিশপ্রহর কীর্তন।

শ্রীম পুনরায় নীরব কিছুকাল। আবার কথা আরম্ভ হইতেছে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — বিদ্যেসাগর মশায়ের একটা কথা মনে হচ্ছে। চণ্ডীবাবু ওঁর খুব ভক্ত, সর্বদা যাতায়াত করতেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে লোকদের বসাবার জন্য ইন্সপেক্টার থাকে। চণ্ডীবাবু ছিলেন তাই। এখন, স্কুল-কলেজের ছেলেরা যায় ওখানে মেয়েমানুষ গান গায় তাই শুনতে। গানও শেষ হয় আর তারাও উঠে চলে যায়। কেউ কেউ আবার রুমালে ঢিল বেঁধে নিয়ে ওদের উপর ছুড়তো। একদিন বুঝি কি গোলমাল হলো। প্রথমে বচসা তারপর প্রহার। চণ্ডীবাবুকে এমন প্রহার করলে, একেবারে black and blue (গায়ে কালো দাগ পড়ে গেল)। বিদ্যেসাগর মশায় খবর পেয়ে সকালে তাঁকে দেখতে গেলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁর খুব অনুগত ছিলেন কিনা! তাঁর কাছে সর্বদা বসতেন। চণ্ডীবাবুই তো ওঁর life (জীবনী) লিখেছেন। পরে চণ্ডীবাবু বসে (হুক্কা টানার অভিনয় করে) এমন করে তামাক খাচ্ছেন। বুঝতে পেরেছেন গত রাতের প্রহারের কথা শুনে দেখতে এসেছেন। তাই বললেন, না, অমন কিছু বিশেষ হয় নাই এই সামান্য একটু (সকলের উচ্চহাস্য)। বিদ্যেসাগর মশায়

বললেন, ‘তা বাপু, আমাদের বাপ পিতামহের অমন ছিল না। তাঁরা একা একা বসে ঈশ্বরকে ডাকতেন। তোমরাই আজকাল এক সঙ্গে বসে প্রার্থনা করবার নিয়ম করলে। তা, বা হলো! কিন্তু, এ আবার কি? মেয়েমানুষগুলো আবার ঢোকালে কেন (হাস্য)?

ডক্টর হামেল, ফক্স সিস্টারস, ও মিষ্টার ডাউলিং এর কথা হইতেছে। সকালেও হইয়াছিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এঁরা বলেন, খ্রীষ্টধর্ম ওদেশে ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। ভাল লোক নেই এমন নয়। কিন্তু অধিকাংশের কাছেই ঐ, ফ্যাসান। অনেকে তাই যায় না চার্চে। ফক্স সিস্টারসদের মা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে ডাকতেন। ডক্টর হামেল বলেছিলেন, ওদেশের লোক ক্রাইষ্টকে মোটেই বোঝে না।

কি করে যায় লোক? চার্চে যারা শিক্ষা দেয় তারা যে মোটেই ত্যাগী নয়। কত আরামে থাকে। এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা, আসবাবপত্র, মোটর, দাসদাসী, উত্তম আহার ও পরিচ্ছদ। কি ভোগ! কিন্তু ক্রাইষ্টকে যে প্রচার করবে সে ত্যাগী না হলে হবে না। কেউ শুনছে না এদের কথা। তাই কিছু হচ্ছে না, এত করেও।

ক্রাইষ্টের আদর্শ ছিল .... 'but the son of man hath not where to lay *his* head.'(St. Matthew 8:20) আমার মাথা গুঁজবার স্থান নাই। এটি সর্বত্যাগীর আদর্শ। আর এখন কি দাঁড়িয়েছে!

'Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purse, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves.......' (St. Matthew 10 : 9 & 10) (ক্রাইষ্ট শিষ্যদের বলেছিলেন, একবস্ত্রে যাও প্রচার করতে — কাপড়, জামা, খাবার কিছু সঙ্গে নেবে না)।

এই ছিল প্রচারকের সম্পদ। এই আদর্শ। আর এখন কি হচ্ছে! ঐ আদর্শ আকাশ থেকে পড়ে গিয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। এতো নেমেছে। তাই কাজও হচ্ছে না, শুনছে না কেউ তাদের কথা।

ধর্মের এইসব গ্লানি অবশ্যই হবে। চেষ্টা করেও কেউ উহা রুদ্ধ করতে পারবে না। তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টা করা উচিত। সর্বদা

সচেষ্ট থাকলে কম হবে গ্লানি।

বুদ্ধদেবের সঙ্ঘেও ক্রমে ঐসব ঢুকেছিল। বাড়িঘর কত কিছু হলো। কোথায় গেল সব!

ধর্মে রাজনীতি ঢুকে সব উচ্ছেদ করে দেয় মূল ভাব। Power, politics, enjoyment (কর্তৃত্ব ভোগ) এগুলি ধর্মের মহাশত্রু।

এখন ওয়েষ্টের political organisation-এর influence (রাজনৈতিক দলের প্রভাব) ধর্মসঙ্ঘেও ঢুকেছে। কত বড় organisation, Vatican (পোপের বিরাট সঙ্ঘ) আবার প্রোটেষ্ট্যান্ট ও কত মত। এ সবই ক্রাইষ্টের নামে হচ্ছে। কিন্তু ক্রাইষ্টের মাথা গুজবার স্থান ছিল না।

Organisation (সঙ্ঘ) না হলে কাজ হয় না। আবার organisation-এ (সঙ্ঘ) ধর্মের spirit (ব্যাকুলতা) থাকে না। ক্রমে hollowness and rottenness (শূন্য গর্ভতা ও মলিনতা) ঢোকে।

ঠাকুর এইমাত্র এসেছেন ধর্মের স্বরূপ দেখাতে। তাঁরও বাড়ি নাই, ঘর নাই, পরবার কাপড়খানা পর্যন্ত রাখতে পারছেন না — অমন ত্যাগ। মাটির ঢেলাটা পর্যন্ত হাতে থাকছে না। একেবারে ত্যাগ, হাড়েমাসে পর্যন্ত ত্যাগ। অজ্ঞাতেও অপবিত্রতা তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারে নাই। করলেই skin (চর্ম) পর্যন্ত উহা resist (প্রতিরোধ) করতো। মন সদা নিমগ্ন ব্রহ্মানন্দে। এতো তেজ তাঁর যে হাড়মাস পর্যন্ত যেন চেতন হয়ে পড়েছিল — চেতন পবিত্র ও বিশুদ্ধ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৬ই এপ্রিল, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল।
রবিবার।

নবম অধ্যায়

জড়চেতনভেদ বিলুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে

১

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। ছাদের দক্ষিণপ্রান্তে শ্রীম চেয়ারে বসা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ করিয়া। শ্রীম-র সম্মুখে টিনের ঘর। এই ঘরে অন্তেবাসী থাকেন। শ্রীম-র বাঁদিকে সর্বদাই দুই তিনটা পুরাণো ভাঙ্গা বেঞ্চি থাকে। সেই বেঞ্চিতে উত্তরাস্য বসিয়াছেন অন্তেবাসী, মনোরঞ্জন, শান্তি ও গদাধর। শ্রীম-র হাতে কথামৃতের ডায়েরী। তিনি নিবিষ্ট হইয়া ডায়েরী দেখিতেছেন।

আজ ২২শে এপ্রিল ১৯২৪; ৯ই বৈশাখ ১৩৩১ সাল কৃষ্ণা চতুর্থী, মঙ্গলবার, এইবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এইটিন-এইটিফোর ফোরটিনথ্ জানুয়ারী কি বার ছিল? পঞ্জিকা পাওয়া যায় কোথায়?

অন্তেবাসী — ভাটপাড়ার ললিতবাবুর কাছে খবর করা যেতে পারে। কিম্বা গুপ্তপ্রেসে দেখবো।

শ্রীম — তিথির সবটা। বাংলা তারিখ ও বারটা চাই।

শ্রীম পুনরায় ডায়েরীতে নিমগ্ন। ভক্তরা শ্রীম-র মুখপানে চাহিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীম ডায়েরী পড়িতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শুনুন, ঠাকুর বলছেন, 'নিরাকার', 'নিরাকার' কল্লে কি হয়? কলিতে অন্নগত প্রাণ — আয়ু কম। এখন তাঁর নামগুণকীর্ত্তন করা, ডাকা, প্রার্থনা করা।

(সহাস্যে) কিন্তু দয়ানন্দ বলেছিলেন, তার (ঈশ্বরের নাম করার) চাইতে 'সন্দেশ সন্দেশ' করলেও হয় (হাস্য)। কাপ্তেন বসে 'রাম রাম' করছিলেন। তাতেই দয়ানন্দ ঐ কথা বললেন (হাস্য)।

নিরাকারের ধ্যান কেমন? — আমি সূর্য নয়, চন্দ্র নয়, নক্ষত্র নয়, জগৎ নয়। খালি, 'নেতি নেতি'। আর একটি আছে, কি সেটি? না, আমি দেহও নয়। এইতো বিচার হলো। এর পরই জল পিপাসা পেল। অমনি বিচার ফেলে জল খেতে গেল। যদি তাই হলো তা হলে কি করে বলা চলে আমার দেহ কিছু নয়। কিংবা, ঘরে আপেল রয়েছে। তার কথা মনে পড়লো। আর তক্ষুনি উটি খেতে গেল। তা হলেও তো হলো না, 'আমি দেহ নয়।' খালি মুখে বললে কি হয় আমি 'নিরাকার নিরাকার'।

তাই ঠাকুর বলছেন, কলির জন্য উটি নয়, কলিতে ভক্তিযোগ। তাঁকে ডাকা, তাঁর নাম গুণকীর্তন করা, প্রার্থনা করা। এ বৈ আর উপায় নাই। কখনও গান করলে কি কখনও নাম করলে। আর প্রার্থনা খুব দরকার। ক্রাইষ্টও প্রার্থনার কথা খুব বলে গেছেন। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবও এই ভক্তিযোগের কথাই বলেছেন। তিনি ভক্তিযোগ প্রচার করেছেন।

শ্রীম (জনৈকের প্রতি) — সারাদিন চোখ বুজে থাকলেই কি হলো?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — জ্ঞানযোগ দ্বারা আগে হতো। এখন বড় শক্ত। আগে লোক বাঁচতো কত! শোনা যায়, ঋষিরা আগে এক হাজার, দেড় হাজার বছর বাঁচতেন। তাঁরা পারতেন। ছয়মাস হয়তো না খেয়েই বসে রইলেন। কিম্বা একটা কদবেল খেলেন।

জগবন্ধু — ধ্রুব রোজ একটি কদবেল মাত্র খেতেন।

শ্রীম — হাঁ। তখন iron constitution (সুদৃঢ় দেহ) ছিল। কয়মাস রইলেন, শুধু হাওয়া খেয়ে। জলের কথা উল্লেখ যখন নাই তখন infer (অনুমান) করা যায় তাও খেয়েছিলেন। (রহস্য করে) দশরথ ন' শ' বছর বেঁচেছিলেন, তাতেই বলে তাঁর অকাল মৃত্যু (হাস্য)।

শ্রীম পুনরায় ডায়েরী দেখিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, এখন মনে হচ্ছে কেন রোজ ঠাকুরের সঙ্গে রইলুম না। তখন কত ওজর আপত্তি। বলতেন, 'আজ

থেকে যাও, কোথায় যাবে!’ ‘আজ্ঞে না, এটা আছে, ওটা করতে হবে’ — এইরূপ সাত পাঁচ কথা আমরা বলতুম। এখন বুঝছি, করলুম কি! কথায় বলে, ‘সাধলে জামাই না খায় কোশ। পরে জামাই ভুতুরি চোষ’॥ (সকলের হাস্য)। হাঁ, জামাইকে সাধলে বলে না না এখন কাঁঠাল খাব না। কিন্তু তার পরই ইচ্ছা হলো খেতে। তখন কাঁঠাল শেষ হয়ে গেছে। কি করে — বলছে আচ্ছা, ভুতুরিই দাও। তাই চুষছে (হাস্য)।

শ্রীম চেয়ার হইতে উঠিয়া ছাদের উত্তর প্রান্তে একা পায়চারী করিতেছেন।

ভক্তরা মুড়ি আনিয়াছেন। তেল দিয়া মাখিয়া তাতে আদা কুচি ও লবণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু খাইতেছেন না। শ্রীমকে দিয়া তবে খাইবেন। কিয়ৎক্ষণ পর শ্রীম আসিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। তাঁহার সামনে মুড়ি ধরা হইলে দুই এক মুঠ গ্রহণ করিয়া খাইতেছেন। ভক্তরা আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন।

পাশে একটি বেঞ্চের উপর একটি কুঁজাতে ঠাণ্ডা জল রহিয়াছে। সারা গ্রীষ্মকাল শ্রীম এই জল রাখান। ভক্তরা গরমে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া ঐ জল খান। মাঝে মাঝে ঠাকুরের মত হাতে লইয়া জল পরীক্ষা করেন ঠাণ্ডা কি না। আবার কখনো অন্তেবাসীকে বলিয়া শরবতের ব্যবস্থা করান ভক্তরা আসিয়া পান করিবেন।

শ্রীম-র দাঁত নাই, মুড়ি খাইতে কষ্ট হয়। তথাপি ভক্তদের প্রার্থনায় মুড়ি চিবাইতেছেন।

একটি কাক মুড়ি দেখিয়া অন্তেবাসীর ঘরের টিনের চালে আসিয়া বসিল। শ্রীম এক মনে উহা লক্ষ্য করিতেছেন। বলিতেছেন, “এই জীবটি আহার অন্বেষণ সারাদিন করছে। মানুষও করে। কিন্তু মানুষের উচ্চ চিন্তাও হতে পারে — ভগবানের চিন্তা।” কাকটিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। আবার বলিতেছেন, “আহা, কি করেছেন, দেখ। ডানা, পা, ঠোঁট যেখানে যা দরকার সব করে রেখেছেন। অত দেখেও চৈতন্য হয় কৈ আমাদের। জন্মের আগের খবর তিনি জানেন। আবার মৃত্যুর পরের খবরও জানেন। নিত্য দেখছি, কিন্তু

বিশ্বাস হয় কৈ? কর্তাগিরিটাই যত গোলমাল করছে।

আবার ডায়েরী পড়িতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মোটা বামুন ঠাকুরকে বলছেন 'ওরা ছেলেমানুষ — নরেন্দ্ররা। এদের জন্য আপনি অত পাগল কেন? পড়াশোনা করছে তাই করুক।' মহিমা চক্রবর্তী বলতেন, 'নরেন্দ্রের এখন যে অবস্থা, বার বছর আগে আমার সে অবস্থা ছিল' (হাস্য)। তাঁর বয়েস তখন ত্রিশ বছর আর নরেন্দ্রের ঊনিশ। বলবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তখন তো আর এখনকার স্বামীজী ছিলেন না। ছোকরা পড়াশোনা করে। (শান্তির প্রতি) মনে কর, তুমি যদি এরপর আমেরিকা গিয়ে লেকচার দাও আর তাতে খুব সুনাম হয়, তখন সকলে তোমার পূজা করবে। এখন তো তোমায় কেউ আদর করছে না। (জগবন্ধুর প্রতি) কি বলেন মশায়? (হাস্য)।

ভক্তরা সকলে মৌন।

শ্রীম (স্বগতঃ) — নরেন্দ্র ছোকরা, এর আর আছে কি, — এরূপ ভাবা আর আশ্চর্য কি! ঠাকুরকেই বিশ্বাস হয় না। বলছেন, 'উনি আগে খুব উঁচু ছিলেন, এখন নেমে গেছেন' (হাস্য)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর আবার একথা শুনতে পেয়েছেন। তিনি হাসতে হাসতে মহিম চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করছেন, 'কি গো, তুমি নাকি বলেছ আমি নেমে গেছি' (হাস্য)। কিন্তু তার প্রতি রাগ হল না। প্রকৃতিই ঐ রকম। আবার উল্টে ভাবছেন, যেকালে এখানে এয়েছে, আমার প্রতি ভালবাসা আছে। গীতায় আছে —

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' (গীতা ৯/১১)। আবার কি আছে,

'মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্' (গীতা ৭/২৫)।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — 'মামজমব্যয়ং' — অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। এইক্ষণ আবার এই শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ। তাঁকে জানা কি চারটিখানি কথা। তাঁর কৃপা হলে তবে জানা যায়। তাঁকে জানলে তো সাঙ্গপাঙ্গদের জানবে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভগবান দর্শন হলে তখন বোঝা যায়

তিনি বিভূরূপে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু আধার বিশেষে বেশী প্রকাশ। তাদের তো আর তা হয় নাই, কি করে জানবে নরেন্দ্রকে! ঠাকুরই কেবল নিজেকে নিজে জানতেন আর অন্তরঙ্গদের জানতেন। তাই এঁদের এত ভালবাসতেন — 'নরেন্দ্র নরেন্দ্র' করতেন।

জগবন্ধু — ঠাকুরকে তো তাঁরা সামনেই দর্শন করছেন। তাহলে ভগবান দর্শনের বাকী রইল কি? 'লংকা না জেনে খেলেও ঝাল'; এও যে ঠাকুরের মহাবাক্য।

শ্রীম — হাঁ। এই দর্শনের ফল অবশ্যম্ভাবী, ফলবেই। মৃত্যুকালে তাঁর দর্শন পাবেন স্বরূপে। শরীরটার জন্যে মাঝে ব্যবধান। তাঁরা ভাগ্যবান। তবে অন্তরঙ্গরা একটি স্বতন্ত্র ক্লাশ। তাঁরা এই শরীর নিয়ে প্রথম থেকেই তাঁকে জানেন।

শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীম তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। পরিচয়াদির পর শ্রীম নিজে নিজে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বগতঃ) — কি আর করবে লোক তাঁর নাম গুণকীর্তন ছাড়া। নাম গুণকীর্তন করতে থাক।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — পাড়ার একজন আজ মরেছে দেখলাম। রোজই তো লোক মরছে। কিন্তু মনে থাকে না আমরা মরবো। সব ভুলিয়ে দেন মা। কেন ভুলিয়ে দেন? বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত হয়, অন্য বিষয়ে অর্থাৎ সংসারে আঁট হবে বলে। কাজ কর্ম দান টান এসবে টান হবে বলে। যদি কেউ ভাবে, আমি মরে যাব তবে কে করে তোমার কাজকর্ম? তখন খালি ঈশ্বরকে ডাকবে। এই সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে — সংসার-বন্ধন আবার মোক্ষের বাঞ্ছা।

একদিন দেখলাম, কালী বাড়িতে অনেকগুলি ছাগল ঘাস খাচ্ছে। একজন খরিদ্দার জিজ্ঞেস করলে, এটির দাম কত? সেটি একটু রোগা। পরক্ষণে বললে, না এটি। সেটি একটু মোটা। দাম চুকিয়ে ওটাকে ধরে এনে হাঁড়কাটে ঢোকাচ্ছে। তখন একবার আর্তনাদ করলে। অন্য ছাগলগুলি খাচ্ছিল। আর্তনাদ শুনে মাথা তুলে একবার চাইলো। ওটা মুহূর্তে দু'ভাগ হয়ে গেল। আর ওগুলিও আবার খেতে

শুরু করলো। এমনি কাণ্ড, সব ভুলিয়ে দেন মা।

ছোট জিতেনের প্রবেশ। প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ছোট জিতেন সরকারী কর্ম করেন।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — বাড়ির খবর সব ভাল তো?

ছোট জিতেন — আজ্ঞে না, অসুখ।

শ্রীম — কার?

ছোট জিতেন — স্ত্রীর।

শ্রীম — কি অসুখ?

ছোট জিতেন — Asthma (হাঁফানি) একা সব করতে হয়, আবার ছেলেগুলি। আবার জ্বর!

শ্রীম (উদ্বেগের সহিত) — তাহলে আপনি শীঘ্র ছুটি নিন্। তাঁকে help (সাহায্য) করা উচিত। অন্ততঃ সাতদিনের ছুটি নিন্। Casual leave (সাময়িক ছুটি) তো পাওনা আছে। তাই নিন্। ওঁকে rest (বিশ্রাম) দেবার বড্ড দরকার। যদি শরীর চলে যায় তাহলে কি বিপদ! আপনার ঘাড়ে এই সব ছেলেগুলোর মানুষ করার ভার পড়বে। হয়তো, দু একটা সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। সচরাচর দেখা যায় মা গেলে সঙ্গে দু একটি শিশুও চলে যায়।

শ্রীম — রান্না কে করে?

ছোট জিতেন — ওই। থালাবাসন ধোয়ার জন্য একটা ঠিকা মেয়েমানুষ আছে। সে জল তোলে কাপড়ও কাচে।

শ্রীম — আপনি কাছে থাকবেন। আর ওঁকে rest (বিশ্রাম) দিবেন। ভাত চাপিয়েছেন, আপনি গিয়ে হাঁড়িটা নামিয়ে নিলেন; আপনার মনে ওঠে নাই এসব কথা?

ছোট জিতেন — বাড়ি ছিলাম সময়ে উঠেছিল। তারপরই এখানে এলাম (পরামর্শের জন্য)।

শ্রীম — হাঁ, হাঁ। আপনি কালই যান।

বড় জিতেনের প্রবেশ — ইনি উকিল হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — এঁর পরিবারের বড্ড অসুখ।

তাই এঁকে বলেছি বাড়ি গিয়ে ওঁদের help (সাহায্য) করতে।

বড় জিতেন (ছোট জিতেনের প্রতি) — হাঁ ভাই, তুমি কালই যাও। নয়তো মহাবিপদে পড়বে।

সকলে কিছুকাল নীরব। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, এই শ্রীম উচ্চ বেদান্তের উপদেশ করিতেছিলেন — ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ, মৃত্যু, অমৃত। আবার একি! ভক্তদের ঘরের খুটিনাটি সংবাদ লইতেছেন। অন্য উপদেশকগণের কাছে তো এরূপ দেখা যায় না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও এইরূপ করিতেন। দিবানিশি ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন। তথাপি ভক্তদের গৃহের সব সংবাদ লইতেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই শ্রীম-র এই শিক্ষা লাভ হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, বেদান্ত practical অর্থাৎ ব্যবহারে প্রযোজ্য হবে, দৈনন্দিন জীবনে আনতে হবে। তবেই উহা প্রকৃত ধর্ম।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — চারদিন আসতে পারিনি, একটু তাস খেলেছিলাম।

শ্রীম — কোথায়, ছাদে তো? হাওয়া লাগে বেশ?

বড় জিতেন — না, গরম।

শ্রীম — শরীর বেশ ঘামে?

বড় জিতেন — না, তেমন নয়।

শ্রীম (রহস্যের সহিত) — একটু ঘামে বৈকি, আহা! (সকলের হাস্য)।

বড় জিতেন — খানিকক্ষণ আনন্দে থাকা যায় তাস নিয়ে।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, ঘেমে (সকলের উচ্চ হাস্য)।

জনৈক ভক্ত (স্বগতঃ) — এই গভীর বেদান্ত। তারপরই পারিবারিক জ্ঞানোপদেশ। এখন আবার বালকের রসিকতা। এঁদের বোঝা মুশকিল, যেন বহুরূপী।

বড় জিতেন (নৈরাশ্য) — না মশায়, আর হলো না — ব্যাকুলতা।

শ্রীম (সস্নেহ গাম্ভীর্যে) — আপনি, জানলেন কি করে? আপনি যে ঘুমন্ত, গাড়ীতে যে রয়েছেন। গাড়ী যে বেনারস এসে পৌঁছেছে। আপনি কেমন করে জানলেন? রিপ ভ্যান উইংকল্ (Rip Van

Winkle) বিশ বছর ঘুমিয়ে ছিল — একটানে। চুল দাড়ি তার পেকে সাদা হয়ে গিছলো। ওকি আর জানতো যে সাদা হয়ে গেছে!

(আকাশ দেখাইয়া) এই দেখুন না, আকাশে মেঘ গোঁ গোঁ করছিল, নিমেষে সব উড়ে গেল। তেমনি অজ্ঞান অন্ধকার গেলে জ্ঞান মুহূর্তে ফস করে দেখা দেয়।

শ্রীম (তিরস্কারের স্বরে) — অনেকে এরূপ বলে। তাদের লজ্জা করে না এরূপ বলতে? এত সব advantage (সুবিধা) রয়েছে তা দেখছে না তারা। ঈশ্বর কত সব সুযোগ করে রেখেছেন! একে তো ভারতে জন্ম। আবার বাংলাদেশে। এই সেদিন মাত্র এখানে অবতার এসেছেন। আবার তাঁর হাতে গড়া লোক দেখতে পাচ্ছে। তাদের মুখে তাঁর কথামৃত শুনতে পারছে — সব message of hope, অভয়বাণী। ভরসার বাণী সব। এত সব থাকতেও ও কথা। লজ্জা হয় না বলতে? Advantage (সুবিধাগুলো) দেখবে না, এমনি অন্ধদৃষ্টি লোকের!

ঠাকুর বলতেন, অবিদ্যার জোর বেশী বিদ্যার চাইতে। অবিদ্যা বিদ্যাকে ঠেলে ফেলে দেয়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে western civilization-এর (পাশ্চাত্য সভ্যতার) প্রভাবে লোকগুলি ভেড়া বনে গেছে। কিন্তু অত নির্যাতনের ভিতর থেকেও লোক সব উপরেই উঠছে। কেন এরূপ হচ্ছে? না, ভারতের লোকদের পেছনে tremendous spiritual force (প্রচণ্ড অধ্যাত্মশক্তি) রয়েছে। কত যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত এ শক্তি, এই ভিত্তি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি আকাশ দেখাইয়া) — এই দেখুন কেমন বিরাট দেখা যাচ্ছে। এত সব advantages (সুবিধা), তা দেখছে না। খালি বলছে, দাদার মত যদি ভাতার হতো (হাস্য)। যা আছে তা দেখতে হয় আগে। তারপর অন্য কিছু চাওয়া।

দুঃখ বিপদ আসে কেন? Majestic height-এ (উচ্চ শৃঙ্গে, ঈশ্বরে) তুলবে বলে। In a calm sea everyone is a pilot? কিন্তু যে তরঙ্গায়িত সমুদ্রে জাহাজ চালাতে পারে সে-ই পাকা ক্যাপটেন। এই যে দুঃখবিপদ সব দেখা যাচ্ছে এসব আমাদের কাছে,

ঈশ্বরের কাছে এসব কিছুই নয়। যাকে দুঃখ বল তাহা দুঃখ নয়। তাঁর play (লীলা) কে বুঝবে? অন্ধকারের experience (জ্ঞান) কেন দরকার? না, আলোর জ্ঞান হবে বলে। তেমনি একটু ওগুলোতে রেখে দিয়েছেন। তাঁর দর্শন হলে তখন জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হওয়া যায়।

বড় জিতেন — শুনতে পাই সাধুরা নিত্যানন্দ ভোগ করেন।

শ্রীম — হাঁ, যখন তাঁকে দর্শন করে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হয়, তখন ঐ হয়। আঁধার আছে বলেই আলো রেখেছেন। যখন দুঃখকে দুঃখ বলে জ্ঞান হবে না, হাজার বিপদেই পড় আর যাই হয়, তখন নিত্যানন্দ লাভ হয়।

ঠাকুর বলতেন, parent bird (মা) জানে, কখন ডিম ফোটাতে হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শিষ্যগুলো বলছে বৃদ্ধ ঋষিকে, উপনিষদ বল, উপনিষদ বল — 'উপনিষদং ভো ব্রূহি' (কেনো ৪/৭)। ঋষি উত্তর করিলেন, 'এই যা বললাম তারই নাম উপনিষদ।' যা বলা হ'ল এইটিই সার বস্তু, এইটি উপনিষদ। শুনে কে? খালি উপনিষদ উপনিষদ করে মরছে।

এত সব আছে (মঠ, সাধু)। তারপর তিনি আবার যখন এতে (সাধুভক্ত সঙ্গে) রেখেছেন, আর এই সব করাচ্ছেন তখন কি করে বলে, হলো না।

বড় জিতেন — এতো সব কী?

শ্রীম — সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, সাধুদের সঙ্গে বাস, উৎসব, নিত্য তাঁর কথা শোনা, আবার পালনের চেষ্টা, এই সব।

গৃহস্থের আড্ডা মানে ভোগের আড্ডা। গায়ে বর্ম পরে, হাতে sword (তলোয়ার) নিয়ে সেখানে যেতে হয় — with a coat of mail and a sword in hand। তাহলে আর ভয় থাকে না।

(সহাস্যে) তা জিতেনবাবুর তো এসবের অভাব নাই। এখন যেতে আর ভয় কি? ভক্তদের ভয় কি? ছুরির ব্যবহার জেনে ছুরি চালালে আর ভয় নাই।

ডাক্তার, বিনয় ও বলাইয়ের প্রবেশ।

শ্রীম ডাক্তারের বাড়ির কুশল সংবাদ লইতেছেন। বিনয় ডাক্তারের ভাই। তাঁহাদের বাসা কাশীপুর। নিকটে প্রায় ভদ্রলোকের বাস নাই। ডাক্তার বিবাহিত।

শ্রীম (ডাক্তার ও বিনয়ের প্রতি) — আপনাদের alternately (একজন করে) আসা উচিত। একজনকে বাসা প্রহরী থাকতে হয়। খালি বাসা ফেলে আসা উচিত হয় নাই — মেয়েরা রয়েছেন কি না! আশ্রমে থাকলে তার মত কাজ করতে হয়। আশ্রমে থাকা অথচ তার মত কাজ করবো না, এ ব্যবহার ভাল নয়। যদি না কর সরে দাঁড়াও। দেখা যাবে কেমন সাহস। মঠ রয়েছে কত, যাও না থাক না গিয়ে সেখানে। কিংবা ভিক্ষা করে খেয়ে গাছতলায় পড়ে থাক না! দেখি কেমন বীর! (ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া বিনয়ের প্রতি) ভক্তের সেবা করা উচিত। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা, ঠাকুর বলতেন। তাহলে ভক্ত সেবা মানে ভগবানেরই সেবা।

ডাক্তারবাবুকে help (সাহায্য) করা উচিত। বাড়িতে কতকগুলি principles (নীতি) থাকা উচিত। তা না হলে যে সংসার চলবে না। এলোমেলো হবে। বাড়ির কর্তাকে সকলে মানবে।

২

সকাল ৬টা। শ্রীম পরদিন চারতলার ছাদে বসা, গীতা পড়িতেছেন পঞ্চম অধ্যায়। বেশ গরম পড়িয়াছে। শ্রীম-র কষ্ট হইতেছে।

আজ ২৩শে এপ্রিল, ১৯২৪ খ্রঃ অব্দঃ। ১০ই বৈশাখ, ১৩৩১ সাল, বুধবার। ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম ছাদে বসা। এখন সন্ধ্যা। কিছুক্ষণ ধ্যানের পর সকলে বসিয়া আছেন। শ্রীম ক্লান্ত। বড় জিতেন, যোগেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, যোগেনের ছেলে খোকা, মাখন, বলাই, রমণী, শান্তি, ডাক্তার, গদাধর, বড় অমূল্য, জগবন্ধু, মোটা সুধীর ও তাঁর সঙ্গী প্রভৃতি শ্রীম-র পাশে উপবিষ্ট।

ভক্তরা একথা সেকথার পর একজন সাধুর কথা কহিতেছেন। সম্প্রতি তিনি মধ্যভারত ভ্রমণে গিয়াছেন। সম্বলপুরে এক বক্তৃতায়

বলিয়াছেন, 'গো-মাংস খাওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে, পূর্বে খেতো হিন্দুরা।' এই কথা লইয়া সংবাদপত্রে বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে। ওখানকার পণ্ডিতগণ এই উক্তিকে challenge (প্রতিবাদ) করিয়াছেন, বিচারে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যান নাই।

শ্রীম — যাওয়া উচিত ছিল। দুটো দিকই বলতে হয়। পূর্বে গো-মাংস খেতো। আবার এখন কেন খাওয়া হয় না দুদিকই বলা উচিত ছিল। Tactful (বিশেষ চতুর) নন দেখ্‌ছি লোকটি। Followers (ভক্ত) হবে না। Cause (প্রচারকার্য) খারাপ করে দিবে। মঠের সঙ্গে যোগ হয়ে কাজ করলে ভাল হয়।

ঠাকুর বলতেন মাধবের গল্প। 'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।'

শ্রীম (মাখনের প্রতি) — কি গল্পটা?

মাখন — এক গ্রামে একটা পোড়ো মন্দির ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের লোক ঐ মন্দিরে শাঁকের ধ্বনি শুনতে পেলো। সকলে ছুটে এলো এই ভেবে, হয়তো ভগবানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এইবার আরতি হবে। উঁকি দিয়ে দেখে পাড়ার পদ্মলোচন শাঁক বাজাচ্ছে। তখন সকলে বলাবলি করে, ফিরে এলো — 'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আদেশ না পেয়ে বক্তৃতা দিলে শোনে কে? মাধব প্রতিষ্ঠা কর আগে, তার পর ফুঁক দাও। তাঁর আদেশ নিয়ে চললে সকলে শোনে, কাজ হয় তাতে। তা না হলে দু-একজন শুনবে।

পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনাতে হবে। শুকদেবের উপর আদেশ হলো। শুকদেব সমাধিমগ্ন। কি করে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায়? নারদ গিয়ে কানের কাছে হরিগুণগান কীর্তন আরম্ভ করে দিলেন। কত কীর্তন কত বাজনা। সমাধি আর ভাঙ্গছে না। অনেক চেষ্টার পর দেখা গেল চোখের কোণে প্রেমাশ্রু, আর শরীর রোমাঞ্চিত। তখন জোরে কীর্তন চললো। অত চেষ্টায় বাহ্য চেতনা তবে ফিরে এলো। তখন গেলেন শোনাতে ভাগবত। এমনি কাণ্ড আদেশের।

আদেশ পেলে না বলে উপায় নাই। আর লোকেরও না শুনে রক্ষা নাই। বলতেই হবে শুনতেই হবে — devine command, দৈবাদেশ।

পরদিন সন্ধ্যার পর শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন। অনেক ভক্ত শ্রীম-র তিনদিকে বসা। বড় অমূল্য, বড় জিতেন, মনোরঞ্জন, শান্তি, বলাই, সুরপতি, বিনয় ও জগবন্ধু উপস্থিত। ডাক্তার বক্সী অল্পক্ষণ থাকিয়া বাড়ি গেলেন। আজ 'ভাল' আসিয়াছে। ইনি কথায় কথায় 'ভাল' বলেন। তাই ভক্তরা তাঁকে 'ভাল' নাম দিয়াছেন। ইনি নূতন আনাগোনা করিতেছেন।

শ্রীম-র শরীর তত ভাল নয় আজ। তাই কথা খুব অল্প হইতেছে। পাঠই বেশী।

শ্রীম ('ভাল'র প্রতি) — আমাদের আকাশ দেখুন। দেখুন না কি কাণ্ডখানা চলছে। (সকলের প্রতি) এই দেখুন আমরা মায়ের দুধ পান করছি। এই হাওয়া, আলো, চন্দ্র, সূর্য, খাদ্য, জল এ সবই মায়ের দুধ। এসব না থাকলে শরীর থাকে না। কিন্তু লোক বুঝতে পারে না এ কথা। লক্ষ্য নাই অন্তরে। দু'চার জনকে তিনি বোঝান। এ একটি ডিপার্টমেণ্ট। তাঁর অনেক ডিপার্টমেণ্ট কিনা। একটি হচ্ছে সৃষ্টির ডিপার্টমেণ্ট। (কি ভাবিতেছেন, সহাস্যে) হাঁ। একবার আমরা কনখলে রয়েছি। রাস্তা দিয়া একটি ষাঁড় যাচ্ছে দৌড়ে। পেছন থেকে সব লোক চেচাচ্ছে, 'সর সর'। ওমা চেয়ে দেখলাম উনি procreation-এ (সৃষ্টি কার্যে) বেরিয়েছেন। তার mate (সঙ্গিনী) আগে আগে চলছে ডাকতে ডাকতে। ফলটান্ হয়েছে। গরুদের ফলটান্ হলে ডাকে। ফলটান্ মানে ফল অর্থাৎ সন্তান কামনা। এসব হলো সৃষ্টি ডিপার্টমেন্টের কাজ। আবার পাগলের ডিপার্টমেন্ট আছে, আবার বিনাশের ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীম পুনরায় দীর্ঘকাল ধরিয়া মৌন রহিলেন, কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন ঠাকুর, ঘরে বসা ছোট খাটটির উপর। কাছে আর কেউ নাই। একটি ভক্তকে ইসারা করে কাছে

ডেকে নিলেন। উনি বারান্দায় ছিলেন। বললেন, 'তুমি কাম জয় করতে পারবে।' বস্ এই একটি কথা। আবার চুপ হয়ে গেলেন। ভক্তদের ভিতর self-respect আনবার জন্য কত ফিকির তাঁর।

শুক্র-শনি-রবিবার শ্রীম অসুস্থ। তাই পাঠ চলিতেছে।

৩

মর্টনের ছাদ, সন্ধ্যা। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট উত্তরাস্য। সম্মুখে দুই পাশে ভক্তগণ বসিয়া আছেন বেঞ্চেতে — রমণী, শান্তি, কালিদাস, জগবন্ধু প্রভৃতি। এক ঘন্টা ধ্যানের পর শ্রীম উঠিয়া গিয়া উত্তরের ছাদে পায়চারী করিতেছেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণ বাহুতল দিয়া তালুতে চাপ দিতেছেন।

কিছুক্ষণ পর শ্রীম পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন — কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মানুষ জন্মাবার সময় যেমন চেয়ে সব দ্যাখে, তেমনি মৃত্যুর সময়ও (ফ্যাল ফ্যাল চক্ষু করিয়া) এমনি করে থাকে। সব ইন্দ্রিয় জবাব দিয়েছে। তবে যে একটু চেষ্টা ভিতরে ভিতরে থাকে সে কেবল আত্মরক্ষার জন্য। ঐটি অবিদ্যা।

জগবন্ধু — বুঝতে পারা গেল না কি চেষ্টা।

শ্রীম — অর্থাৎ যাতে মৃত্যু না হয়। এই চেষ্টা, যত্ন, কেন রেখেছেন? না, তবে দেহ রক্ষা হবে। সকল জীবই বাঁচবার চেষ্টা করে। তাই দেহের জন্য যত্ন নেয়। এও তিনিই দিয়েছেন। ছেলেটার জন্ম হল, আর তক্ষুনি হাওয়ার সঙ্গে যোগ হয়ে (ফুসফুসের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দেখাইয়া) এমন এমন করতে লাগলো। আর সারা জীবন এইটি চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে কখনও কখনও বন্ধ হয় বটে, যেমন মূর্চ্ছায়; কিন্তু তারপর আবার চলে। কি আশ্চর্য কল করেছেন!

এসব দেখেও কি করে বললেন ওরা (বাইওলজিষ্ট ও ইভলিউসনিষ্ট) এসব chance-এ (দৈবযোগে) করেছে। এমন well-organised mechanism chance-এ (সুসংবদ্ধ সৃষ্টি দৈবযোগে) হয় কি করে? ইভলিউসনিষ্টরা বলেন, কীট, পক্ষী, পশু, তারপর

মানুষ হয়েছে।

Struggle for existence (বাঁচবার চেষ্টা) জীবের ধর্ম। মানুষে দয়া, পরোপকার, ঈশ্বর চিন্তার শক্তি, এসব এলো কি করে? এও কি chance-এর (দৈবযোগের) কাজ? নিচের stage (অবস্থা) থেকে আপনা আপনি উপরে উঠে কি করে? পশু stage-এ (অবস্থায়) খালি আহার, বিহার, মৈথুন ও ভয় — এই প্রচেষ্টা থাকে। এ থেকে উপরে ওঠার চেষ্টাটা কেন এলো, কোত্থেকে এলো, কে দিলো? বলে, দশ লাখ বছর নাকি এই উপরে ওঠার চেষ্টা চলছিল। হঠাৎ দেখা গেল, এই চেষ্টার পর মানুষের ভিতর কতকগুলি morals, উচ্চ নীতি কাজ করছে। অতদিন ধরে মানুষ পশুর মত শুধু মেরে ধরে চুরি করে খেয়ে বেঁচেছে। দশ লাখ বছর পর কতকগুলি লোক ঠিক উল্টো পথে চলছে, দেখতে পাওয়া গেল। অপরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরছে। হত্যা, চুরি, ব্যভিচারকে পাপ বলছে। এই সৎগুণগুলি এলো কোত্থেকে। 'Chance' (দৈবযোগ) এবিষয় explain (ব্যাখ্যা) করতে পারে না।

তাই ঈশ্বরকে মানতে হয়। এসব তাঁর প্ল্যান। এসব তিনিই দিয়েছেন, এই দ্বন্দ্ব। এইসব বিরুদ্ধ tendency (ভাব) দ্বারা জগৎ চালাচ্ছেন।

বিড়ালের ছানা সবে কয়দিন হলো জন্মেছে। এরই মধ্যে নখ দিয়ে অমন অমন (খামচাচ্ছে) করছে। হয়তো বাহ্যে পেচ্ছাব এখনও করে নাই তবু অমন করছে. পরে করবে যে! তাই সে tendency (সংস্কার) তার ভিতর রয়েছে পূর্ব থেকে। এসব Automatic action (যন্ত্রবৎ কর্ম)। একটা পাঁঠা কেটে দুভাগ করা হলো। তবুও শরীরটা ছটফট করছে। এও তাই।

শান্তি — পাঁঠার অনুভূতি হয় কি তখন?

শ্রীম — তা কেমন করে হবে? Nervous centre (স্নায়ুকেন্দ্র) যে আলাদা হয়ে গেছে। তবে যে অমন ছট্‌ফট্ করছে এর কারণ তার tendency (সংস্কার) রয়েছে। Self preservation instinct (আত্মরক্ষার সংস্কার) বলে একে। এটা শরীরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে

গেছে। একটা লোক ঘুমুচ্ছে — নাক ডাকছে। গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। একটা মশা হাঁটুতে কামড়াচ্ছে, অমনি মশাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে হাতে হাঁটুটা ঘষে। কি কোমরের দাদে চুলকানি হলো অমনি নখ দিয়ে চুলকাচ্ছে। কি জন্য করছে এসব? তুমি কি জবাব দিবে? এসব automatic tendency-র (সহজাত সংস্কারের) কাজ। ভিতরে রয়েছে সব মনে। সেই মন শরীরের সহিত এক হয়ে গেছে। আত্মরক্ষার জন্য এই সব হচ্ছে অজ্ঞাতসারেও।

সাধারণ জীবের এই কাজ। ঠাকুরের শরীরে তার উল্টো দেখা গেছে। ব্রহ্মানুভূতি মজ্জা অস্থি শোণিত চর্মের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছে। তাই অজ্ঞাতেও মলিন স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন না। অত শুদ্ধ তাঁর শরীর। জড় বস্তু সব যেন চৈতন্যময় হয়ে গিয়েছিল।

মোহন — শাস্ত্রে আছে জড় চেতনের সত্ত্বা লয়। চেতন জড়ের সত্ত্বা লয়।

শ্রীম — হাঁ, এই শাস্ত্র প্রমাণ করতেই ঠাকুরের আগমন। এসব sealed books (অজ্ঞাত বিষয়) ছিল। তাঁর আগমনে এসবের আদর হচ্ছে। জড় চেতনের সত্ত্বা নিয়েছে ঠাকুরের শরীরে। আর সাধারণ জীবে চেতন জড়ের সত্ত্বা নিয়ে রয়েছে।

মনও জড় বস্তু। তাতে দেহ রক্ষার জ্ঞান রয়েছে। সেই জ্ঞান দেহের সঙ্গে এক হয়ে থাকে।

শ্রীম (শান্তির প্রতি) — তেঁতুল তোমার জিহ্বার সামনে ধর, জল আসবে। কেন আসছে? ঐ কারণ।

চীৎপুর দিয়ে সব লোক যাচ্ছে। বারান্দায়, ছাদে অনেক মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে খুব সুন্দরী সব মেয়ে। লোকগুলি ঘাড় বাঁকিয়ে এদের দেখছে। হয়তো ঘোড়ারগাড়ী পেছন থেকে ঘাড়ে চড়ছে, হুঁস নাই। ঘোড়া একেবারে মাথার উপর তবুও হুঁস নাই। কোচোয়ান চীৎকার করছে, তা'তেও হুঁস হয় নাই। কেন এরূপ হলো? এ কার দোষ? এর উত্তর কারও দোষ নয়। যৌবন বয়সে এসব হয়। ভিতরে sex (কাম ভাব) হয়েছে। বিষয় দেখে জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

মানুষ মানে, a bundle of tendencies, সংস্কারের একটি

গুচ্ছ। তবেই আর কি! মানুষের দোষ কি? যিনি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করছেন এ জগতের, এ তাঁর করা, তাঁর খেলা। এসব দিয়ে জগৎ রক্ষা হচ্ছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই সব নিম্ন ভাবনার নিবাসস্থল মন। বাইরের রূপরসাদি বিষয় সর্বদা টানছে মনকে। অবচেতন অবস্থায় টানাটানি চলছে।

ঠাকুর বলেছিলেন, এই মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে বেঁধে দাও। তবে আর বাইরে যাবে না। এছাড়া এ রোগ সারাবার অন্য পথ নাই। অন্য বৈদ্যও নাই তিনি ছাড়া। যিনি আষ্টেপিষ্টে বেঁধেছেন অন্তরে বাহিরে তিনি মুক্তির পথও বলে দিয়েছেন। মন তাঁর পাদপদ্মে বিকিয়ে দাও।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — গীতার শ্লোকটা কি?

ভক্ত — যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(গীতা ২/৫৮)

শ্রীম সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন। আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এরাই বীর। তাদের মন ঈশ্বরের পাদপদ্মে লগ্ন হয়ে রয়েছে। যেমন কচ্ছপ, কুড়োল দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো কর — মুখ হাত পা বার করবে না। তেমনি এরা। এদের বুদ্ধিই স্থির। এদের মন বুদ্ধি ব্রহ্মপর।

মানুষের মনের স্বভাবতঃই সেই গতি — বাইরে যাবে। বেদে আছে, এই কথা। ঈশ্বর মনকে বহির্মুখীন করে বানিয়েছেন — ‘পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ’। কিন্তু যারা বীর কেবল তারাই এই দুর্দমনীয় মনকে ব্রহ্মপদে বেঁধে রাখতে পারে ভিতরে। ঢাল তরোয়ালওয়ালা বীর, বীর নয়। এরাই যথার্থ বীর যে মনকে বশীভূত করেছে — যে মনের বশ নয়। দু চারজন হয় এরূপ।

বাহিরে আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে গর্জন হইতেছে। আর দুইচারি ফোঁটা জলও পড়িতেছে।

বড় জিতেনের প্রবেশ।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি — জল বন্ধ হয়ে গেল। যা পড়েছে তাও, evaporate (বাষ্প) হয়ে গেল...।

শ্রীম (বড় জিতেনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে) — তেমনি সাধুর মন। কাম ক্রোধ সাধুর মনে উঠলেও এমনি evaporate (বাষ্প) হয়ে যায়। নিচে আসতে দেয় না। উপরেই শুকিয়ে যায় মনে। মনেই ওঠে মনেই নাশ। কিন্তু অপর লোকের তা নয়। তাদের মনে উঠে — পরে body (শরীর) নেয়। সাধুর মনে তা হয় না। ব্রহ্মাগ্নিতে সব ভস্মীভূত!

যৌবনে এসব জোয়ার আসে। খুব সাবধানে সাধুসঙ্গে থেকে সাধু-সেবা করতে হয়। তাহলে ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার হয় আর জীবন মধুময় হয়।

কি দোষ তাদের যারা ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে থাকে মেয়েমানুষের দিকে? প্রকৃতিতে ঐ ভাব ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। বাইরে তার খাদ্য দেখে ঐদিকে মনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সদসৎ জ্ঞান হলে বিচার করে মনকে ভিতরে আটকে রাখতে পারে। এরজন্য মুনিরা কত তপস্যা, কত চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বরের সাহায্যে কেবল প্রকৃতির এই গতিকে রোধ করা যায়। শুধু বিচার চেষ্টা দিয়েও সম্পূর্ণরূপে বশ হয় না। ঠাকুর তাই বলতেন, 'এ কি আমার চেষ্টায় কাম দমন হয়েছে? মা টেনে রেখেছেন মনকে তাঁর পাদপদ্মে — তাই এ অবস্থা।'

শ্রীম কি ভাবিতেছেন! ক্ষণকাল পর আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — একবার শুনেছিলাম আফগানিস্থানে একটি নিয়ম করেছে, এই আমীর কি এর আগের আমীর। রাস্তায় যেতে যেতে কোন স্ত্রীলোকের উপর একবার নজর পড়লে দোষ হবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বার চাইলেই দোষ হবে। আর তখনি পুলিশ arrest (গ্রেপ্তার) করবে। বেশ নিয়মটি।

"সাধুরা দ্বিতীয় বার চেয়ে দেখে না মেয়ে মানুষদের। অন্য লোক অন্য রকম। তারজন্যই তো মনে কর, সাধুসঙ্গ দরকার। খারাপ প্রকৃতিতে যদি খারাপের দিকে মন যায়, তা হলে ভাল প্রকৃতি ভালর

দিকে নিয়ে যাবে। সাধুসঙ্গ করলে প্রকৃতি ভাল হয়। সেই ভাল প্রকৃতিদ্বারা খারাপকে জয় করা যায়।

সাধন মানে কি? প্রকৃতির সঙ্গে struggle (যুদ্ধ) করা with a view to realise God (ঈশ্বরদর্শনের জন্য)।

সব কথা কি সকলে নেয়? এখন যারা পেকে গেছে তাদের বললে কি নেবে? কথায় বলে, কাঠি উঠলে পাখী বোল শেখেনা। অনেক দিন সংসার করলে প্রকৃতি মলিন হয়ে যায়। আর নূতন করে ভাল হবার চেষ্টা কমে যায়। ঠাকুর তাই ছোকরাদের অত ভালবাসতেন। তারা ফস্ করে নিতে পারে। যাদের মন formed (গঠিত) হয়ে গেছে তাদের পক্ষে নেওয়া বড় কঠিন। ঠাকুর বলতেন, এক সের দুধে এক মণ জল মিশান আছে। এখন কে যায় বসে বসে উহা জ্বাল দিতে। বুড়োদের ঐ রকম। শীগগির কথা ঢোকে না। ছোকরাদের মন যেন পরিষ্কার স্লেট যা দাগ ফেল তাই পড়বে।

এমন লোকও তিনি করেছেন যাদের মন কচ্ছপের ন্যায় — ভিতরে থাকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে। ওখান থেকে মনকে বের করবে না। এদেরই বলে মহাত্মা।

শ্রীম ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, আহার করিবেন। বলাই ও ডাক্তার বক্সী আসিয়াছেন। শ্রীম-র আহার শেষ হইলে ঘরে ডাক্তার প্রবেশ করিলেন। ইনি দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনা করিতেছেন। ভক্তগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

রাত্রি সাড়ে দশটা।

কলিকাতা মর্টন ইনষ্টিটিউশন।
২৮শে এপ্রিল, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৩১ সাল।
সোমবার।

দশম অধ্যায়

চিত্রে 'কথামৃত'

১

মর্টন ইনষ্টিটিউশন। চারতলার সিঁড়ির ঘর। অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম চেয়ারে দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন সিঁড়ির সামনে। নিচে মাদুরে বসা দুর্গাপদ মিত্র (হিলিংবাম), বড় অমূল্য, শান্তি ও জগবন্ধু।

আজ ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ। ১৬ই বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার। কৃষ্ণা একাদশী, ৪৬।৪৬ পল।

বাহিরে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন। দুচার ফোঁটা জলও মাঝে মাঝে পড়িতেছে। ভক্তগণ বাহিরেই বসিয়াছিলেন। জলের জন্য ভিতরে আসিয়াছেন।

অমূল্য ঁজগন্নাথ দর্শনে পুরী যাইবেন ভাবিতেছেন। আবার ইহাও ভাবিতেছেন, অফিসে ছুটি পাওনা থাকিলেও পঁচিশ টাকা লোকসান হইবে। এই সব বিচার শুনিয়া শ্রীম কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর মাকে তাই বলেছিলেন, 'কেন আর বিচার করাও'। কোন্ বিষয়ে বিচার করবে, finite (জাগতিক) না infinite (ঈশ্বরীয়) বিষয়ে? বাজারে গেলুম, এই এই কিনলুম, এতে ছয় আনা খরচ হলো। এ বিচার বেশ চলে। কিন্তু, ও বিষয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে কি বিচার করবে? ঠাকুর তাই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এক সের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? কেউ তার জবাব দিতে পারে নাই আজও। বাক্যমনের অতীত যিনি, যার সম্বন্ধে তোমার কোনও জ্ঞান নাই, দেখ নাই, তাঁর সম্বন্ধে তুমি কি করে বলবে? বললেও অপরে নেবে কেন? এটা হলো অনধিকার চর্চা।

চিনির পাহাড়ে একবার একটা পিঁপড়ে গিছলো। একটা বড় চিনির দানা মুখে করে নিয়ে গেল। যেতে যেতে ভাবছে, আর

একবার এসে সবটা পাহাড় মুখে করে নিয়ে যাব।

এই সব ভাবনা যেমন ঈশ্বরীয় বিষয়ে ভাবনাও তেমনি। অনধিকার চর্চা। এ বিষয়ে কেবল expert opinion (অভিজ্ঞ লোকের মত) কার্যকরী।

Dialogue of Plato-তে (প্লেটোর কথোপকথন) আছে বেশ। সক্রেটিস্ বলছেন, যারা তর্ক করতে আসতো তাদের। মনে কর তোমাদের অসুখ হয়েছে। এখন কার advice (উপদেশ) নেবে? ডাক্তারের, না layman-এর (অনভিজ্ঞ লোকের)? আবার বলছেন, যখন কোন বিষয় সম্পত্তি রক্ষার পরামর্শ নিতে হবে তখন lawyer-এর (উকীলের) কাছে যাবে তো? তার কথা শুনবে। তেমনি Infinite (ঈশ্বর) সম্বন্ধে উপদেশ নিতে হলে অবতারের কথা শুনতে হয়। যে দেখেছে ঈশ্বরকে তার কথাই নিতে হয়।

এই বিচারধারাকে ম্যাক্সমূলার ডায়লেকটিক প্রসেস্ (কথোপকথন বিধি) বলেছেন। Questions and answers (প্রশ্নোত্তর) দিয়ে কোণঠাসা করা। যে expert (বিশেষজ্ঞ) তার উপদেশ নিতে হয়। অবতার আসেনই এইজন্য।

শ্রীম (অমূল্যর প্রতি) — অত হিসাব করলে ভগবান দর্শন হয় না। ঈশ্বর দর্শনের জন্য সর্বস্ব ছাড়তে বলেছেন। পঁচিশ টাকার আর দাম কত। ঠাকুর বলেছিলেন, পুরীর জগন্নাথ আমিই। বিশ্বাস করলে হয়ে গেল।

শ্রীম কিছুকাল মৌন হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর দুর্গাপদ কথা কহিতেছেন।

দুর্গাপদ (শ্রীম-র প্রতি) — মায়ের কথাও প্রচার হচ্ছে। রামানন্দ বাবু লিখেছেন।

শ্রীম — হাঁ, প্রবাসীতে উনি মায়ের জীবনী বের করেছেন। এতে লোকের খুব উপকার হবে। আর কোথায় পাবে অমন ideal (আদর্শ)। যত spread (প্রচারিত) হয় ততই ভাল। অমন সংযম আর সেবা কার আছে? আপামর সকলের উপর অমন মাতৃভাব আর কে দেখাতে পারে? সাক্ষাৎ জগন্মাতা। দেশ ক্রমে নেবে। ভারতীয়

নারীর আদর্শ মা।

জগবন্ধু — ‘আনন্দ বাজার’ও তুলেছে সে জীবনী।

শ্রীম (অতিশয় আহ্লাদে) — তুলেছে? বেশ বেশ। কত উপকার হবে লোকের। এই জটিল সময়ে, অবিশ্বাসের অন্ধকারে আলোর কাজ করবে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় মেয়েরা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। তারা আলোক পাবে। আহা, কত বড় ideal (আদর্শ); চৈতন্য হয়ে যাবে লোকের, স্ত্রীপুরুষ উভয়ের।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা চলিতেছে যোগেনের ছেলে খোকার সম্বন্ধে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — কালকে সে চলে গিছলো?

জগবন্ধু — আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গাপদ — কি পড়ছে।

শ্রীম — এবার মেট্রিক দিবে। (সহাস্যে) আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, $a^3 + b^3$, (এ কিউব প্লাস বি কিউব) ফরমুলাটা বলতো? সে উত্তর করলে, ‘আমি ওটা ভাল পড়ি নাই’ (সকলের হাস্য)। তারপর বললাম, আচ্ছা ‘অস্মদ্’ শব্দের রূপ বলতো? অনেক কষ্টে কোনও রকমে বললে।

দুর্গাপদ — তাহলে পাশ হচ্ছে না।

শ্রীম — না, হবে। আজকাল এমন সব পাশ করছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, আমি ওটা বাদ দিছলাম (সকলের হাস্য)। পাশ করে বটে, জ্ঞান হয় না। মুখস্থ করে খালি, বুঝতে পারে না। বোঝবার চেষ্টাও নাই।

এই যে অত পাশ করছে আজকাল, এর ভিতর ব্রিটিশ পলিটিক্স রয়েছে। ইউনিভারসিটির ওরা বুঝতে পারছে না। আমরা ধরে ফেলেছি। এর effect (পরিণাম) হলো বেশী গ্রেজুয়েট বের করা। বেশী পাশ করালে বেশী গ্রেজুয়েট হবে। তা থেকে মুসলমান গ্রেজুয়েটদের বড় বড় কাজ দিয়ে হাতে রাখবে গভর্ণমেন্ট। আপত্তি করলে বলবে, কেন, এরাও গ্রেজুয়েট। Divide and rule (ভেদ ও শাসন) নীতির কাজ এইটি। এখন গভর্ণমেন্টের এই favourable policy

(অনুকূল নীতি) হাতে আছে। ইউনিভারসিটি এটা foresee (অনুধাবন) করতে পারে নাই। আগের মত পরীক্ষা হলে একটাও পাশ করতে পারবে না।

লর্ড লিটন বড় tactful (অতিশয় চালাক) লোক। তার জন্যই ভাইসরয় হওয়ার উপযুক্ত লোক। এসেই tactics (কৌশল) দেখিয়েছে। ওদের সব parliamentary tactics (পার্লামেন্টারী কৌশল) জানা আছে কিনা। ওঁর বাপও ভাইসরয় ছিলেন। ওঁর দাদাও renowned writer (লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক), সদ্‌বংশ।

আজের খবরের কাগজে দেখলাম, মুসলমানদের দিয়ে গভর্ণমেন্ট একটি সভা করিয়েছে। একটা পার্টি তৈরী করাচ্ছে যেমন দাস মহাশয়ের স্বরাজ পার্টি। গভর্ণমেন্টের backing-এ (সহায়তায়) হচ্ছে এসব।

বাইরে প্রবল বৃষ্টি হইতেছে। উত্তরের দেয়ালে কাঁচের শার্শী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার ফাঁক দিয়া ঘরে জলের ছাট আসিতেছে। শ্রীম আসন হইতে উঠিয়া গিয়া একখানা চট আনিয়া অন্তেবাসীর হাতে দিলেন। ঐ চট দিয়া শার্শীর ফাঁক বন্ধ করা হইল। শ্রীম পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন চেয়ারে — এবার পূর্বাস্য। শ্রীম-র বাম হাতে ভাঙ্গা শার্শী। অতক্ষণ দক্ষিণাস্য ছিলেন। চেয়ারে বসিয়া শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া বড় জিতেন, বলাই, মনোরঞ্জন ও বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তদের ভিজিয়া আসায় আপ্যায়ন করিয়া শ্রীম পুনরায় ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি কাণ্ডখানা একবার দেখ না। সৃষ্টি রক্ষার জন্য বাইরে এসব হচ্ছে জলটল। তবে শস্য হবে। আবার species (জীবকুল) বাড়াবার কি কৌশল। অন্তরে sex (কাম) ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছেন।

প্রণয়ী প্রণয়িনীর love letter (প্রেমপত্র) বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে তাকে ভাবতে ভাবতে। তার মানে কি? In the nakedness (নগ্ন সত্য) এইতো, ছেলে হওয়া।

এই কাণ্ড সর্বত্র সৃষ্টিতে। গাছের পেষ্টিল আর ষ্টেম যোগ হয়ে তবে ফল হয়। এই স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণকে গিন্নীরা বলে 'ফলটান্', ফলের জন্য টান, ছেলে হওয়ার জন্য ইচ্ছা।

মানুষ তো জানে না, এটি কার ইচ্ছায় হচ্ছে। এই সৃষ্টি রক্ষার জন্য এটি তাঁর কাজ। লোকে বলে love (প্রেম)।

ঠাকুর দুভাগ করেছেন স্ত্রীলোক, বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি স্ত্রী পতিকে help (সহায়তা) করে ভগবানের পথে যেতে। আর অবিদ্যাশক্তি, পতিকে সংসারে বদ্ধ করে, ঈশ্বরের উল্টো পথে বিষয়ভোগে নিয়ে যায়।

ভারতীয় বিবাহের meaning (মর্মার্থ) কি? স্ত্রীর সাহায্যে ঈশ্বর দর্শন করার প্রচেষ্টা। মহাশক্তির অংশ কিনা। স্ত্রী আদ্যাশক্তির একটি রূপ। ঈশ্বর দর্শন পতির একা শক্তিতে কুলিয়ে উঠবে না। তাই পতি-পত্নীর সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। তাই বিবাহ।

বিয়ের সময় দেখা যায় বরটা বসে থাকে বোবার মত। আর কনে এদিক ওদিক করছে বেশ। শক্তি কিনা তাই একটু চঞ্চল।

পশ্চিমে বরের হাতে বিয়ের সময় sword (তরবারি) রাখে। ঠাকুর বলতেন, এর মানে কি জান? না, এই শক্তির প্রভাবে সংসারপাশ কচ্ কচ্ করে কেটে ফেলবে।

দেখ না, লোক কত খাটছে সারা দিন ধরে। বাড়িতে এসে পাঁচ মিনিট স্ত্রীর কাছে বসলেই শ্রান্তি দূর হয়ে যায় (জনৈক ভক্তের উচ্চ হাস্য)। Stimulus (উৎসাহ) পাচ্ছে কি না। নভেলে আছে, কে বলেছিল, একজন ladylove (প্রেমিকা) না থাকলে chivalrous (বীর) হওয়া যায় না।

সত্যিই তো শক্তি স্ত্রী। দেখ না সারা দিনের অত পরিশ্রম, একেবারে গলদঘর্ম। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাড়ি এসে যেই পাশে বসে দুটো কথা শুনছে অমনি একেবারে refreshed (সজীব) হয়ে যায় (বড় জিতেনের ম্লান হাস্য)। হাসির কথা নয়! এর উপর যদি স্ত্রী বিদ্যাশক্তি হয় তবে ঈশ্বর দর্শন করতে পারে তার সাহায্যে। শক্তি তো বটে — তা বিদ্যা শক্তিই হোক, কি অবিদ্যা শক্তিই হোক।

ভক্তদের স্ত্রী ভোগের জন্য নয়, ঈশ্বর দর্শনের জন্য!

ইতিহাসের বড় বড় যত কাণ্ড সব স্ত্রী নিয়ে। ট্রোজান war (যুদ্ধ) হেলেনকে নিয়ে, রামায়ণ-মহাভারত সব স্ত্রী নিয়ে। সংযুক্তাকে নিয়ে ভারতের নবীন ইতিহাস।

তবে selected few আছে যাদের তিনি একেবারে চৈতন্য করিয়ে দেন। তাদের সংসারে মোটেই ঢোকান না। একেবারে চৈতন্য। সে খুব কম। সকলকে করলে এদিককার খেলা চলবে কি করে! এ কেমন, যেমন কার্ড দিয়ে লোক ঢোকান — limited number of cards (অল্পসংখ্যক কার্ড)। লোক নেওয়া হয় বাছা বাছা কয়জন। বেশী নিলে ভেতরে গিয়ে সব গোলমাল করবে যে, তাই অল্প লোক। তাই গীতায় বলেছেন ভগবান, ‘কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।’ তাদের ভিতর আবার এক আধজনকে নিজের স্বরূপ দেখিয়ে দেন — ‘কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ’ (গীতা ৭/৩)।

ঠাকুর কাশীপুরে বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলে আরও গোটা কয়েক লোকের চৈতন্য হতো। তা আমি মুখ্যু। সকলকে মায়ের সব কথা বলে দি। তাই মা আমায় নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আর রাখবেন না।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। সব তিনি করাচ্ছেন। সকলের জন্য ভাত এক হাঁড়িতে চড়েছে। রান্না হলে মালিকের ইচ্ছামত বেটে দিবেন।

ক্রাইষ্টও ঠিক এই কথাই বলেছেন। কর্তার ইচ্ছায় সব হয়। একটি গল্প বলে এ’কথাটা বেশ বুঝিয়েছেন। অনেকগুলি লোককে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সারাদিন তারা খেটেছে। আবার কয়েকজনকে মাত্র দু এক ঘন্টা পূর্বে নিযুক্ত করেছেন। দিন ফুরোলে বেতন দেওয়ার সময় সকলকেই একই রকম বেতন দেওয়া হলো। যারা সারদিন খেটেছে তারা আপত্তি করলে মনিব বলবে, তোমাদের সঙ্গে কত দেওয়ার কথা ছিল? ওরা বললে, এই বেতনেরই কথা ছিল, কিন্তু —। মনিব জবাব করলো, এতে কিন্তু টিন্তু নাই। আমার অর্থ আমি দিব তোমাদের তাতে কি? তোমাদের প্রাপ্য তো

তোমরা পেয়েছ! তাই সবই তাঁর ইচ্ছা।

শ্রীম অন্যমনস্ক। কিছুক্ষণ পর জগবন্ধুকে 'কথামৃতে'র ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের দিনপঞ্জিকা (synopsis) পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। সম্প্রতি 'কথামৃত' চারিভাগের দিনপঞ্জিকা নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — আহা যদি ক্রাইষ্ট ও চৈতন্যদেবের ডেট-টেট দিয়ে minute details (খুঁটিনাটি বর্ণনা) থাকতো তাহলে কত উপকার হতো। 'কথামৃতে'র মত অমনটি আর পাবেন না কোথাও! লোকে আজকাল কত কথা কয় নিজেদের মনের মত। কেউ কেউ বলে ক্রাইষ্টই ছিল না। কিন্তু ঠাকুর যে দর্শন করলেন তাঁকে। আবার বলেছেন, আমিই ক্রাইষ্ট ছিলাম। আমিই চৈতন্য ছিলাম। তার কি হলো? তাঁর কথা কি তাহলে মিথ্যা? কার অত বড় বুকের পাটা তাঁর কথা মিথ্যা বলার। কত evidence (প্রমাণ) যে রয়েছে তাঁর। সব চাইতে বড় evidence (প্রমাণ) মানুষগুলি, যাদের তিনি তৈরী করেছেন। তাদের জীবন, তাদের কাজ দেখে, তিনি ছিলেন না — তাঁর কথা মিথ্যা, কে বলতে পারে? আর এক evidence (প্রমাণ) তাঁর বাণী। তাঁর কাছে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের দ্বারা কথিত। আবার তিথি নক্ষত্র বার তারিখ দিয়ে লিখিত। এই direct message (প্রত্যক্ষ বাণী) এই direct evidence (প্রত্যক্ষ প্রমাণ) আছে বলে ওকথা বলা অত সহজ নয়। ক্রাইষ্ট চৈতন্যদেবের কথার এরূপ রেকর্ডস থাকলে ওকথা বলা শক্ত হতো।

রাত্রি দশটা। ভক্তরা বিদায় লইতেছেন। দুর্গাপদ আনমনে বসিয়া আছেন। সকলের শেষে ইনি উঠিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া অনুতপ্ত স্বরে মনস্তাপ নিবেদন করিতেছেন।

দুর্গাপদ (শ্রীম-র প্রতি) — পঞ্চাশ বছর বয়েস হলো কিছুই হ'ল না। অত আপনাদের কথা শুনছি, সঙ্গ করছি। এমনি কঠোর প্রকৃতি।

শ্রীম (ভরসার সহিত) — জানলেন কি করে আপনার কিছু হয় নাই? গাড়ীতে ঘুমন্ত আপনি। গাড়ী যে কাশী চলে গেছে। আপনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। মনে করছেন, হাওড়ায়ই বসে আছি।

অবতার যে এসেছেন এখন। ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন। এই দক্ষিণেশ্বরে কত কাণ্ড করে সেদিন মাত্র গেলেন! আপনারা যে তাঁর আশ্রিত। তিনি তো এসেছেনই আপনাদের জন্য। তাঁর সঙ্গে যুতে দেওয়া হয়েছে গাড়ী। ইঞ্জিনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে goal-এ (গন্তব্যস্থলে)। ভাবনা কি? তাঁর নাম করুন আর আনন্দ করুন। ঠাকুর অবতার কি না, নিজে বলেছেন তিনি।

এই মহাবাক্য শুনিতে শুনিতে ভক্তগণ সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন। দুর্গাপদও সুপ্তোত্থিতের মত নামিতেছেন। শ্রীম সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে করুণার ছবি। শ্রীম-র ডান হাতে হারিকেন (লণ্ঠন) জ্বলিতেছে। সিঁড়ির পথ দেখাইতেছেন।

২

মর্টন ইনষ্টিটিউশন। চারতলার ছাদ। সকাল সাতটা। ছাদের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শ্রীম বসিয়া আছেন — প্রথমে চেয়ারে তারপর মাদুরে। ভোর বেলায় এই মাদুরে বসিয়া দীর্ঘকাল ধ্যান করিয়াছেন। চেয়ারে বসিলে রোদ লাগে তাই নিচে মাদুরে বসিয়াছেন। একা একা কি ভাবিতেছেন। অন্তেবাসী এতক্ষণ শ্রীম-র সম্মুখেই ছিলেন। এইক্ষণে দশ হাত পশ্চিমে তাঁহার বাসস্থান টিনের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

এখন আটটা। বরদা দাসের প্রবেশ। ইনি প্রণাম করিয়া শ্রীম-র পাশে মাদুরে বসিলেন। বরদার বয়স পঁচিশ হইবে, শ্রীহট্টে বাড়ি, ভক্তিমান লোক। তিনি এই প্রথম শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীম পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁহার যাবতীয় প্রয়োজনীয় পরিচয় সংগ্রহ করিলেন।

বরদা আর্টিষ্ট, অবনীবাবুর স্কুলে পড়িয়াছেন। এখন সমবায় বিল্ডিংএ থাকেন। শ্রীম তাঁহার সহিত আর্টের কথাই কহিতেছেন। যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীম তাঁহার সহিত সেই বিষয়ের কথা কহিয়া থাকেন।

শ্রীম — অবনীবাবুর পেইনটিং-এর মধ্যে আপনার কোনটা বেশী ভাল লাগে?

বরদা — ‘দিনের শেষ’ নামীয় উটের পেইনটিংটি আমার বড়

ভাল লাগে। আর একটি আছে ‘সাজাহানের প্রেম’।

শ্রীম — আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে শুনে। আহা, অমন ভালবাসা অমন প্রেম ঈশ্বরে হলে হয়। ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায় এতে। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। যে জাগতিক কোনও বিষয়ে বড় সে ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের পথেও বড় হতে পারে। মনটা তো একটা বস্তুই। এদিকে গেছে যতটা, মোড় ফিরিয়ে দিলে ওদিকেও ততটাই যাবে।

তাজমহল করবার আগে, শুনেছি, সাজাহান আকাশের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রইলেন। মমতাজের কথার হয়তো উদ্দীপন হয়েছিল। মমতাজে মন ডুবে আছে। মৃত্যুর সময়ও, শোনা যায়, সাজাহান তাজমহলের দিকে তাকিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সাজাহানের এই মধুর ভাব, আর তাঁরই পুত্র ঔরঙ্গজেবের কি উগ্র স্বভাব। পিতাকে বন্দী করে রাখলেন। আর ভাইদের উপর কত অত্যাচার। হিন্দুদের মনে করতেন কাফের। তাই এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে অসি রেখে নাকি বলেছিলেন — যেটি খুশী ন্যাও — কোরাণ নয়তো অসি। অসি নেওয়া মানে মৃত্যু; আর কোরাণ নেওয়ার অর্থ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করা। ব্যক্তিগত জীবনটি তাঁর ভাল ছিল — খুব সাদাসিদে। কিন্তু ধর্মের fanaticism-ই (পাগলামী) কলঙ্ক। একেবারে direct challenge (সুস্পষ্ট আহ্বান) — কোরাণ অথবা কৃপাণ।

সাজাহান আর ঔরঙ্গজেব, কি আশ্চর্য, একেবারে বিপরীত স্বভাব। ইনি builder (স্রষ্টা) আর উনি destroyer (বিনাশকারী)। ইনি মধুর আর উনি উগ্র। ইনি উদার আর উনি সংকীর্ণ। ইনি বিলাসী আর উনি তপস্বী।

শ্রীম (বরদার প্রতি) — আচ্ছা আপনি কিছু এঁকেছেন কি? শিবের সমাধির একখানা ছবি আপনি আঁকবেন। সমাধিতে মন একেবারে বিলীন। বুত্থিত হয়ে মন একটু নিচে নামতেই ‘আমি কে? আমি কে?’ বলে নৃত্য। সমাধিতে নাম, রূপের পার পরম ব্রহ্মে সচ্চিদানন্দে নিমগ্ন — যেমন নুনের পুতুল, সমুদ্রে নামলে তার যা হয়। সমাধি

ভেঙ্গে গেলে, নাম ও রূপে মন নেমে এলে দেখছেন, ঐ সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মই নামরূপবান জগৎ হয়ে রয়েছেন। যিনিই নিরাকার নির্গুণ, বাক্যমনাতীত তিনিই সাকার সগুণ বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন। মনের নিরানব্বই ভাগই সচ্চিদানন্দে মোড়া, মাত্র এক ভাগ নামরূপে নেবেছে, জগৎরূপে ভাসমান হচ্ছে। সেই অবস্থায় বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে নৃত্য করছেন, এ কি? একি? সঙ্গে সঙ্গেই বিচার এসে পথ রুখে দাঁড়াচ্ছে তাহলে 'আমি কে — আমি?' সমাধিতে 'আমি'টা ছিল না। সমাধি ভেঙ্গে গেলে 'আমি'টা অর্থাৎ individuality ফিরে এসেছে। সমাধিতে দেখেছেন সচ্চিদানন্দ সাগর, যে একের সঙ্গে দুই নাই সেই এক। আর এখন দেখছে, ঐ একই বহু অর্থাৎ নামরূপবান জগতের রূপ নিয়েছে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে 'আমি'টা কি, 'আমি'টা কে, 'আমি'টা এল কোত্থেকে?

এই 'আমি'টাই মায়া, এটা আছে বলেই জগৎ। তাই মায়াকে শঙ্করাচার্য 'অনির্বচনীয়' বলেছেন — আছে বলাও চলে না, নাই বলাও চলে না। অর্থাৎ কথায় বা ভাষায় বোঝান যায় না।

এইসব অবস্থা ঠাকুরের ভিতর দেখা গেছে। মন একেবারে অরূপে বিলীন। আবার নামরূপে যখন ফিরে এলো তখন দেখছেন, সব মোম দিয়ে মোড়া। মোম মানে চৈতন্য, সচ্চিদানন্দ। তাই বিস্ময়ে বললেন, সব যে মোমের বাগান, গাছপালা ফুলফল, — মালী পর্যন্ত মোমের। তাই ভক্তদের বলেছিলেন, আমি কি বিচার করবো, দেখছি — মা-ই সব হয়ে রয়েছেন।

'আমি'-তত্ত্বের সমাধান করলেন — সমাধিতে চলে যায়, নিচে নামলে ফিরে আসে। তাই দাস-'আমি' ভক্তের 'আমি' নিয়ে থাকতে বলেছেন। আর বললেন, 'জীবের 'আমি'টা একেবারে যায় না। অবতারাদির 'আমি' যায়। এটা মুলো গাছ আর ওটা অশ্বত্থ। জগৎ থাকলেই দ্বৈত আছে। তাই ব্যবস্থা দিলেন, 'থাক্ শালা দাস আমি হয়ে।'

ক্রাইষ্ট ও চৈতন্যদেবের ছবি কেউ আঁকে তো ভাল হয়। তাঁদের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করে। আমার বহু দিনের ইচ্ছা,

ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলির ছবি কেউ যদি আঁকে। ছবিতে ‘কথামৃত’ হয়। এখন আছে বর্ণরূপী কথামৃত। আপনারা এসব করুন না! এতে কঠোর তপস্যা হয়ে যাবে। হৃদয়ে গেঁথে যাবে তাঁর সব লীলাকথা। এসব লীলা ও কথা মহাশক্তির কেন্দ্র। যেমন ছাদের আলসেতে বীজ পড়লে গাছ জন্মে। তেমনি এই সব দৈব ভাব ও ভাষা ভিতরে থাকলে আপনি ঐ বীজে ধর্মতরুর জন্ম হয়। এখন তো শুনছেন তাঁর কথা, বা পড়ছেন। এ দুইই শ্রবণের অন্তর্গত। তারপর মনন — মানে deep thinking ঐ সব মহাবাক্য নিয়ে, লীলা নিয়ে। এর পর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ continuous and unbroken thought আসে। এই সব লীলা ছবি আঁকতে গিয়ে একেবারে নিদিধ্যাসন হয়ে যাবে। রাফেলের মেডোনার ছবিটি এর সাক্ষ্য। বৌদ্ধযুগের বহু ছবি এইরূপ আছে — একেবারে জীবন্ত। করুন করুন এ সব। এতে এদিককারও লাভ ওদিককারও লাভ।

Music, painting and poetry (সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন ও কবিতা) এই তিনটা দিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়। এই তিনটাই fine arts (চারুশিল্প), sculpture (ভাস্কর্য) -ও আর একটি। ওতেও হয়। ঠাকুরের মুখে শুনেছি, নবীন ভাস্কর সারাদিনে বেলা তিনটার সময় একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। অত সংযত হয়ে — অত তপস্যা করে তবে দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে বানিয়েছেন। তাই তো অত জীবন্ত। যে বানাবে তার মন ঐ দৈবভাবে একেবারে মিলে যাবে তবে হাত দিয়ে ঐ ভাব পাথরে ফুটে উঠে।

Fine arts (চারুশিল্প) মনকে refined (নির্মল) করে — মনে একাগ্রতা হয়। যে লোক আর্ট ভালবাসে সে ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের দিকে যেতে পারে। মনটি সংস্কৃত হয়, একেই culture (সংস্কৃতি) বলে।

পেইনটিং, পোয়েট্রি, এ সবই সুন্দরের উপাসনার উপকরণ। সকল সৌন্দর্যের আধার শ্রীভগবান। এই সবের উপাসকগণ এই পথ দিয়ে তাঁর কাছে অগ্রসর হয়। যে জাতের এই দিকে অনুশীলন নাই

তারা ধরাপৃষ্ঠে বেশী দিন টিঁকতে পারে না। এ সবের pragmatic value (সাংসারিক মূল্য) তত না থাকলেও জাতীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে, জাতির সুদীর্ঘ জীবনলাভের দিক দিয়ে এসবের মূল্য অতি উচ্চ। ভারতীয় সংস্কৃতি অত সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছে তার মূলে ঐ ভাব। সংস্কারের শেষ পয়েন্ট ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান। অর্থাৎ জীবের শিবত্ব লাভ। সেইটি লক্ষ্য রেখে নানা পথে উপাসকগণ চলে এটির সঙ্গে একত্ব লাভের জন্য। সুন্দরের উপাসকগণ জাগতিক সকল সৌন্দর্য ছাড়িয়ে পরম সুন্দরের সন্ধান ক্রমে পায়। উঁচু জিনিষের চিন্তা করতে করতে মন ঐ ভাবে রঞ্জিত হয়ে যায়। শেষে বস্তু লাভ। তখন head আর heart-এর (বুদ্ধি ও হৃদয়ের) ব্যবধান চলে যায়। দুইই এক হয়ে যায় হৃদয় ও অনুভব, তখন জীব হয় 'শিব'।

আহার, বিহার, বাসস্থানই মানুষের সব নয়। পশুরও এসব দরকার। মানুষের কাজ আরো উঁচু। মানুষ ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, ঈশ্বর দর্শন করতে পারে, ঈশ্বর হতে পারে। এইটিকেই ঋষিরা বলেছেন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই ঈশ্বর দর্শনে আর্ট খুব সহায়। মনটা একাগ্র ও সংস্কৃত হয়ে রইলো। তারপর ঐটি ঐ পথে চালিয়ে দেওয়া। আপনি বেশ কাজটি নিয়েছেন।

অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম ছাদে চেয়ারে বসিয়াছেন উত্তরাস্য। তাঁহার সম্মুখে ডান হাতে বেঞ্চেতে বসা দুটি নবাগত ভক্ত পশ্চিমাস্য। এঁরা এখন ঝামাপুকুর হইতে আসিয়াছেন। এঁদের একজন পুরুলিয়ায় থাকেন চাষবাসের কর্ম করেন। মাঝে মাঝে এঁরা দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে যাতায়াত করেন। শ্রীম আনন্দে এঁদের সহিত কথা কহিতেছেন। ইতিমধ্যেই শ্রীম-র সম্মুখের বেঞ্চেতে পূর্বমুখী হইয়া আসিয়া বসিয়াছেন বড় অমূল্য, সুখেন্দু, ছোট রমেশ ও জগবন্ধু। একজন নবাগত ভক্ত উপেন্দ্রবাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা বলিতেছেন।

নবাগত ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — উনি আগে বেশ ছিলেন। বেশ ঈশ্বরীয় কথা হতো। কত লোক যেতো। এখন সে ভাব নেই। এখন বিষয়ের কথাই হয় বেশীর ভাগ।

শ্রীম — তিনি যখন কাঠ টেনে নেন তখন সব ঠাণ্ডা। কাঠ ছিল বলে দুধ ফোঁস ফোঁস করছিল। টেনে নিতেই ফোঁসফোঁসানি বন্ধ হয়ে গেল। ভগবান যতক্ষণ ইচ্ছা করেন ততক্ষণই মানুষ তাঁর কাজ করতে পারে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ দেহ রাখবার পূর্বে অর্জুনের সমস্ত শক্তি হরণ করলেন। কাজ হয়ে গেছে, ধর্ম সংস্থাপনের কাজ। অর্জুনকে আর প্রয়োজন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে গেল, ধর্মরাজ্যে পাণ্ডবরা বসেছেন। আর কি দরকার শক্তির। তাই হরণ করলেন শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ বাণবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন। অর্জুনকে কাছে ডাকালেন। অর্জুন জানতেন এবার অন্তর্ধানের সময় এসেছে। তাই কাছে গেলেন বটে, কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন যাতে শ্রীকৃষ্ণ ছুঁতে না পারেন। বার বার ডাকছেন অর্জুনকে আরও নিকটে যেতে। অর্জুন যাচ্ছেন না। এদিকে অর্জুনের শক্তি হরণ না হলে শ্রীকৃষ্ণের শরীরও যাবে না। দৈবী শক্তির কাজ হয়ে গেছে এখন দরকার নাই আর। শক্তির অপব্যবহার হতে পারে। তা ছাড়া পাণ্ডবদেরও মহাপ্রস্থানের সময় নিকট। শ্রীকৃষ্ণের শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ নানা ছলনা করতে লাগলেন যাতে অর্জুন এসে পাশে বসেন। কিন্তু অর্জুন কিছুতেই কাছে যাচ্ছেন না। অর্জুনের ইচ্ছা যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের শরীর থাকে ততক্ষণই জগতের কল্যাণ, তাঁদের কল্যাণ। এও জানেন তাঁর শক্তি হরণ না হলে শরীর যাবে না। দুই পক্ষেই ছলনা চলছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মায়ার কাছে কে দাঁড়াতে পারে! অভিমানের সুরে বলতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ — এই কি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন! এর জন্য এতো করলাম। তার ফল এই? অতো করে বলছি একটি বার কাছে এসো, কিন্তু আসছে না। হায়, এই প্রতিদান অর্জুনের! অর্জুন আর পারলেন না। কেই বা পারে তাঁর মোহিনী মায়ার কাছে দাঁড়াতে? অর্জুন কাছে এলেন। গাণ্ডীব দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করলেন। ব্যস্, গাণ্ডীব আর উঠছে না। অর্জুন এখন

সামান্য একটি মানুষ। দৈবী শক্তি, অবতারের লীলার শক্তি তাঁর ভিতর থেকে মুহূর্তে অন্তর্হিত হল।

শ্রীম (নবাগত ভক্তের প্রতি) — তিনি শক্তি দিলে মানুষ তাঁর কথা কইতে পারে। তাঁর কথা কওয়ায় বিপদ আছে। ঠাকুর বলেছিলেন, ‘ঘটক ঘটকালী করতে গিয়ে শেষে নিজেই বিয়ে করে বসে।’ তার মানে তাঁর কথা কইতে কইতে নিজেই আবার credit (সম্মান) নিয়ে না বসে। ঠাকুরের জীবন দেখুন। এদিকে বলছেন, আমি অবতার। সচ্চিদানন্দ এর ভিতর এসেছেন। কিন্তু নিজে কোনও credit (নাম যশ) নিচ্ছেন না। যত কিছু বলছেন সব মা’র নাম করে, জগদম্বার নামে। এতেও প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে তিনি আর জগদম্বা এক। তবুও যখন সংসারের অজ্ঞানী লোকদের কাছে কথা কইছেন তখন সব মায়ের নামে। তাঁর সবেতে মা — আহার, বিহার, শয়ন, স্বপন, শ্বসন, সব কাজে মা। তাই বলতেন, ‘তুমি মা যন্ত্রী আমি যন্ত্র। যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।’ নিজে একটু credit-ও (সম্মানও) নেবেন না। দেখছেন, এক কর্তা ধর্তা বিধাতা — মা। লোকশিক্ষার জন্য অবতারাদি এইরূপ আচরণ করেন। সংসারের সাধারণ লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ। অজ্ঞানী লোক বলে, আমি কর্তা। ঠাকুর বলেন, না, মা কর্তা। এই lower (নিম্ন) ‘আমি’টাকে sublimate (ঈশ্বরে মিলিত) করতে পারলে তখন হয় ঠাকুরের অবস্থা — সব কাজে মা। Lower (জাগতিক) ‘আমি’টা completely conquered (সম্পূর্ণ বিজিত) হয় higher (উচ্চ) ‘আমি’ দ্বারা — একেবারে absolute surrender and subordination (পূর্ণ শরণাগতি ও অধীন) হয় তখন। দ্বৈতভূমি জগতে কি করে থাকতে ইচ্ছা হয়, তাই শিক্ষা দেবার জন্য ঐ আচরণ ঠাকুরের। এরই ভিতর এক একবার অদ্বৈতে চলে যাচ্ছেন, মা আর ছেলে এক — যে একের দুই নাই সেই এক — অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি বাক্যমনের অতীত তাই হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি থাকলেই দ্বৈত। অর্থাৎ ‘আমি’টা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দ্বৈত। বড়

কঠিন, তাই কনে সুন্দর দেখে নিজেই বিয়ে করে বসে। তাঁর কথা বলা তাই অত কঠিন। কারুকে কারুকে দিয়ে বলান। নইলে জগতের লোকশিক্ষা হয় কি করে। তাঁদের ভিতরের অহংকারটাকে ধুয়ে পুঁছে সাফ করে দেন। তাঁরা তাঁর যন্ত্র হয়ে কাজ করেন। বড় কঠিন কাজ লোকশিক্ষা।

ঠাকুর যে মায়ের সঙ্গে রয়েছেন, মায়ের যন্ত্র হয়ে কাজ করছেন এক একবার তা ভক্তদের কাছে যেন প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছেন। বিজ্ঞানের যুগ কিনা, তাই সংশয় সমাধানের উপায়ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। বিবেকানন্দ বললেন আপনার ঈশ্বরীয় দর্শন hallucination, মনের ভ্রম। তক্ষুনি সকলের সমানেই বলছেন, 'হাঁ মা, এসব আমার মনের বাতিক, নরেন যে বলছে — তোমার দর্শন, তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা এই সব।' মা উত্তর করলেন — 'তা কি করে হয় বাবা। আমিই যে তোমার মুখ দিয়ে কথা কইছি। আর তুমি যা বলছো তা যে বাস্তবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।' তা হলে এসব মনের ভুল কি করে বলা যায়। এতে দুটি কাজ হ'ল। একটিতে যেন মাকে প্রত্যক্ষ করালেন। অপরটিতে নিজের অধীনতা স্বীকার করা হল।

অত কথা মায়ের সঙ্গে নিত্য। অত গান অত নাচ অত আনন্দ কিন্তু শেষের দিকে ঠিক বিপরীত ভাব। তখন প্রার্থনা করছেন, আমি আর বকতে পারছি না। আমায় শুদ্ধ ভক্ত এনে দাও — দুচার কথায় যাদের চৈতন্য হয়ে যাবে। আর অন্য সব কেশব সেন-টেনদের কাছে পাঠাও।

তাঁর কথা বলা অত শক্ত কাজ। তাইতো গোপীরা বললেন, যাঁরা খুব উদার আর মহৎ, কেবল তাঁরাই তোমার কথা কওয়ার উপযুক্ত — 'ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ' (শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা)। 'ভূরিদা জনাঃ' মানে খুব উদার চিত্ত যাদের। সংসারের ভোগবাসনা যাদের চলে গেছে, যারা কেবল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করতে চান কেবল তাঁরাই তাঁর কথা বলবার যোগ্য। শ্রোতাদেরও তাই। অন্য বাসনা থাকলে

ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে রুচি হয় না। তিনি যাঁদের ইচ্ছা করেন কেবল তাঁরাই তাঁর কথা বলতে পারেন। আবার যতক্ষণ ইচ্ছা করেন ততক্ষণই বলতে পারেন।

ঠাকুর তাই একজন ভক্তকে বলেছিলেন, 'কেউ যেন মনে না করে আমি না করলে মায়ের কাজ আটকে থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে খড়কুটো থেকে মহাপুরুষ তৈরী করতে পারেন।'

একি লেকচার দেওয়ার কাজ! যেমন দেয় লোক গোলদিঘিতে। তাঁর আদেশ না পেয়ে বললে গোলমাল করে। বলে, আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া। বক্তা শ্রোতা দুইই ভোগে — 'অন্ধেন নীয়ামানা যথান্ধাঃ' (কঠোপনিষদ ১/২/৫)। দেখাদেখি অনেকে প্রচার করেছিল কিন্তু কিছুই টিঁকলো না। আর যাদের দিয়ে তিনি বলিয়েছেন বা বলান তারা শত বাধাবিঘ্নের ভিতরও বলে। আর তাতে কাজও হয়, লোকে শোনে। ঈশ্বরের পথে যায় শুনে। আর তা নইলে 'হেগো গুরুর পেদো শিষ্য' হয়, তাও বলতেন।

একজন ভক্ত — এ-তো প্রত্যাদিষ্টদের কথা হ'ল। কিন্তু সাধকের কি তাঁর কথা বলার অধিকার নাই?

শ্রীম — হাঁ, আছে যদি সেবার ভাবে বলে তাঁর কথা। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, শরণাগত হয়ে, গুরুজনদের আদেশ নিয়ে অপরের সেবা করা যাচ্ছে এতে, এইভাবে করলে চলতে পারে। কিন্তু গুরুভাবে নয়। গুরুভাবে পারেন অবতারাদি। তবুও তাঁরাও সেবার ভাবেই থাকেন বেশীর ভাগ, লোকশিক্ষার জন্য। নইলে অপরের ভিতরও গুরুগিরি ঢুকে যাবে। ঠাকুরের জীবনটাই হ'ল a standing criticism to গুরুগিরি (গুরুগিরির মূর্তিমান সমালোচনা)। এই করে মানুষ নিচে নেমে যায়, জড়িয়ে পড়ে। বড় কঠিন কাজ। ধনদৌলত, মান-সম্মান, কামিনী-কাঞ্চন সব হাতের তলে এসে যায়, ঈশ্বরীয় কথা বললে। তখন যদি নিজকে পৃথক না করতে পারে তখনই ডুবে যায়। বড় কঠিন। কোথা দিয়ে এসে যায় অহংকার। Credit (নামযশ) নিজে নিয়ে যায়।

গ্রামোফোনের মত হতে পারলে চলে। গানটা "His Master's Voice" — গানটা অপরের, যন্ত্রটি আমি। তাও কি সোজা? যে চব্বিশ ঘন্টা তাঁর চিন্তা করতে পারে সেই কেবল গ্রামোফোন হতে পারে ঠিক ঠিক। নইলে মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে উঠে 'আমি'টা।

এ একটা কঠিন সাধন। যেই মাথা উঁচু করলো অমনি দাও ঢেলে মাথায় মুগুরের ঘা। মানে, তাঁর নাম, তাঁরস্মৃতি। তখন স্মরণ করতে হয় ঠাকুরের আচরণ। মা তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র; তুমি কর্তা আমি অকর্তা। এই করে relentless war declare (অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ঘোষণা) করা। কখনও 'তুমি'র কখনও 'আমি'র জয়; 'আমি'র জয়ই বেশীর ভাগ। শেষে সব 'তুমি'র জয় হয়ে যায় তাঁর কৃপায়।

নিষ্কামভাবে তাঁর কথা কইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, যেমন নিষ্কামভাবে রোগীর সেবা করলে, কি নিরন্নকে অন্ন দিলে হয়। কেউ সেবা করে স্থূল শরীরের কেউ সূক্ষ্ম শরীরের, কেউ কারণ-শরীরের। তিন শরীরের সেবাই নিষ্কাম হয়ে করলে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন ঈশ্বরে শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়।

সন্ধ্যা সমাগতা। ভৃত্য সিঁড়ির ঘরে হ্যারিকেন রাখিয়া গেল। আলো দেখিয়া শ্রীম কথা বন্ধ করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিবেন। ইতিমধ্যে হুড়হুড় করিয়া ঝড় উঠিল। পূর্বে আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল বৃষ্টি। ঝড় ও বৃষ্টি এক সঙ্গে চলিল। শ্রীম ভক্তসঙ্গে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। ইনি বসিলেন দক্ষিণাস্য চেয়ারে দোর গোড়ার সিঁড়ির সামনে। ভক্তরা বসিলেন শ্রীম-র বাম পাশে ও সম্মুখে বেঞ্চেতে। শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বাহিরের তুমুল কাণ্ড ঝড় দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর শ্রীম নবাগত ভক্তদের ভজন গান করিতে বলিলেন। একজন গাহিতেছেন, 'শুক ডালে* বসি ডাকিছ কি পাখী, ডাকিছ কি পরম পিতারে।' ধীরে ধীরে ঝড়ের বেগ

---

*শুক ডালে - শুষ্ক ডালে

কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। পুনরায় কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (নবাগত ভক্তদের প্রতি) — অন্যের ভালটা নেওয়া ভাল। অন্যের খারাপ দেখতে দেখতে নিজেও খারাপ হয়ে যায়। একটা আদর্শ ধরে থাকা আর অন্যের ভালটা নেওয়া।

ঠাকুর বলতেন, শ্রীকৃষ্ণ বড় মুস্কিলে পড়েছেন। ‘রাণী, মানে মা যশোদা টানে কোল পানে, রাখাল টানে বনে, আর রাই টানে নয়নে নয়নে। এখন শ্যাম দাঁড়ায় কোথা?’ এই অবস্থা মানুষের। নানান দিক থেকে নানান টান এসে যায়। তাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তখনই অশান্তি।

তাই একটা আদর্শ ধরে থাকা ভাল। নানান খানে ঘুরলে একটাতে মন বসে না। সব মতই পথ, ঠাকুরের মহাবাক্য। সব মতকেই (নমস্কার মুদ্রায়) নমস্কার করি। আমরা তাঁর (ঠাকুরের) কথাই একরকম ছেলেবেলা থেকেই ভাবছি। তাই তাঁর কথা মত চলতে চেষ্টা করছি। এ কি ব’লছে ও কি ব’লছে, সব দেখতে গেলে সময় কোথায়? এদিকে যে হয়ে যায়!

দক্ষিণেশ্বরে একটি ভক্ত তপস্যার ভাবে রহিয়াছেন। নবাগত ভক্তরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।

শ্রীম (নবাগত ভক্তদের প্রতি) — কি সব কথা হলো, বলুন না, বলুন — দু একটা কথা বলুন।

নবাগত একজন ভক্ত — উনি বলেছিলেন, কি আর বলবো। হয়তো বলতে গিয়ে এক গোয়াল ঘোড়া বলে ফেলবো শেষে। আজকাল কম বলেন। আগে আরও বেশী বলতেন।

শ্রীম — হাঁ, বেশী কথা বলা ভাল নয়। ভিতর খালি হয়ে যায়। আর প্রশংসা মনে মনে করতে হয়। বাইরে করলেই সর্বনাশ। কি হয়েছে এখনই, একটু চোখ বুজলেই সব হয়ে গেল! তা হলে আর রক্ষে ছিল না!

শ্রীম (অন্যমনস্কভাবে) — একটি জীব রাসের ফুল খেতে

চেয়েছিল। মা বললেন, দাঁড়াও — অষ্টম্ ফষ্টম্‌গুলি কেটে যাক্। মানে আশ্বিন মাসের অষ্টমী নবমীতে পাঁঠা বলি হয়। এই সব পার হোক, তারপর দেখা যাবে। পাঁঠার বাচ্চা খেতে চেয়েছিল 'রাসের ফুল'। কার্তিক মাসে রাসের সময় অনেক ফুল টুল দিয়ে রাসতলা সাজান হয়। সেই সব ফুল খেতে চেয়েছিল একটা বাচ্চা। মা প্রবীণা সব জানে। তাই বললে, দাঁড়াও আগে নবরাত্রিটা কেটে যাক্ তারপর দেখা যাবে। মানে বিপদটা থেকে উত্তীর্ণ হও আগে, তারপর সব।

এখনই কি হয়েছে ওর যে এতো প্রশংসা করা। আর যারা প্রশংসা করে তাদেরই বা কি অধিকার জন্মেছে? ঈশ্বরের বিষয়ে কিই বা বোঝে তারা। ঠাকুর কেশব সেনকেই বলেছিলেন, তোমার কথা ল'তে পারলাম না। অপরের 'কা কথা'। অত বড় ভক্ত কেশববাবু, আর কত লোক তাঁকে মানে-গনে। তাঁর কথাই নিচ্ছেন না। বলেছিলেন, নারদ শুকদেব বললে শুনতুম। যারা সংসারে রয়েছে, কামিনী কাঞ্চনে মন আছে, মাঝে মাঝে একটু তাঁর কথা স্মরণ মনন করছে, তাদের কি অধিকার বলার। যারা বলছে তাদের অধিকার নাই বলার, আর যে শুনছে তার অধিকার নাই শোনার। তবুও যদি dare (সাহস) কর প্রশংসা করতে সেটা হবে at the risk of both (উভয়ের বিনাশ ডেকে আনা); ছি অমন কাজ কি করা উচিত? নেহাৎ প্রশংসা করতে হয় তো মনে মনে কর।

তাই বলে, 'মরবে সাধু উড়বে ছাই তবে সাধুর গুণ গাই।' এমনতর কাণ্ড। কোনখান দিয়ে লোকমান্য এসে সব পণ্ড করে দেবে। তাইতো ঠাকুর অত লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বলতেন — 'ঝাঁটা মারি লোকমান্যে।' একটু চোখ বুজলেই হয়ে গেল! তাহলে আর রক্ষে ছিল না।

এই জন্য mutual admiration society (স্তাবক সভা) করতে নেই। তাতে ideal (আদর্শ) খুব low (নিচু) হয়ে যায়। রাম, রাম! ও (প্রশংসা) করতে নেই। সর্বদাই mouth water (মুখ জলে সিক্ত) করে কিনা নামের জন্য, যশের জন্য। (ছোট রমেশের

প্রতি) বল, করে কিনা!

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একজন অনেক পরিশ্রম করে হেঁটে হেঁটে পুরীতে গেল ছয় মাসে। পা টা কেটে কুটে রক্তাক্ত। ঐ নিয়েই জগন্নাথ মন্দিরের সামনে গিয়ে উপস্থিত। অরুণস্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নমস্কার করছে। মনে হর্ষ, অত দিনের পরিশ্রম সফলপ্রায়। সেই সময় একটা গরুর গাড়ী সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো গাড়ী কলকাতা যাচ্ছে। তাহলে বেশ হল। আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, ভক্তটি বললো। গাড়োয়ান উত্তর করলো, তাহলে উঠে বস। ভক্ত বললো, এই আসছি একটু দাঁড়াও, একটি বার জগন্নাথ দর্শন করে আসছি। না আমি অপেক্ষা করতে পারবো না, বলেই গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত লোকটি এসে দৌড়ে গাড়ীতে উঠলো। তার ভাগ্যে জগন্নাথ দর্শন হল না। দেহ সুখ এসে এতদিনের পরিশ্রম পণ্ড করে দিলে। এসব তাঁর মহামায়ার কাণ্ড — লোকমান্য, দেহসুখ। কোন্ দিক দিয়ে আসে তা বোঝবার যো নেই। তাই ঠাকুর প্রার্থনা করতেন, ‘মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। শরণাগত শরণাগত মা।’

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব, পুনরায় কথা।

শ্রীম (নবাগতদের প্রতি) — এমনি কাণ্ড — বুঝতে পারলেন? অত কষ্ট করে গিয়েও জগন্নাথ দর্শন হলো না। তাই কিছুই বলবার উপায় নেই কার কি হবে। অষ্টম ফষ্টমগুলি আগে কাটুক।

কেন ঠাকুর প্রার্থনা করলেন? ভক্তদের শিক্ষার জন্য। যার মায়াতে মুগ্ধ জগৎ সেই মহামায়ার শরণাগত হয়ে থাকা।

বড় অমূল্য ও সুখেন্দুর প্রস্থান। ডাক্তার ও বলাই-এর প্রবেশ।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — ইনি একজনের প্রশংসা করেছিলেন। আমরা বললুম আগে অষ্টম ফষ্টমগুলো কাটুক। কি হয়েছে এখনই যে প্রশংসা! একটু চোখ বুজলেই যদি হতো, তা হলে আর রক্ষে ছিল না।

ডাক্তারও প্রশংসা করিয়া থাকেন। পূর্বেই তাঁহাকে সাবধান করিয়াছেন। আবার আজ দৃঢ়তার সহিত পুনরায় সাবধান করিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, 'ঝাঁটা মারি লোক-মান্যে'। এতো লংকা ফোড়ন দিয়ে কেন কইতেন এ কথা? এমনি কি বলতেন, কি তার মানে আছে? সর্বনাশ হবে এতে, তাই বলতেন। উভয় পক্ষের খারাপ। একপক্ষে লোকমান্য ঢুকে সব পণ্ড করে দিবে। যারা বলে তাদের ideal lower (আদর্শ নিচু) হয়ে যাবে। চোখ বুজলেই হলো না! জীবনে কতটা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে সেইটে হলো আসল জিনিষ — তাঁর প্রতি ভালবাসা। ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা। তাই অত কঠিন ব্যাপার। অনধিকারীর কিছুই বলবার যো নাই। প্রশংসা করতে হয় নেহাৎ, মনে মনে কর। তাতে ওর অনিষ্ট হবে না, কিন্তু নিজের আদর্শ নিচে নেমে যাবে।

কেন ঠাকুর এই অগ্নিবাণী বলতেন? তবে তো লোকের চৈতন্য হবে! অনধিকার চর্চা আর করবে না। একি সংসারের ব্যাপার। এ মনে কর highest ideal (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ) নিয়ে কথা হচ্ছে। কি অধিকার আছে তাদের যারা বলে? তারা কি ঈশ্বর দর্শন করেছে? তবে কেন ঐ বিষয়ে opinion pass (মত প্রকাশ) করা? শাস্ত্রে তাই বলেছেন; 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা।'

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আজ কাশীর চিঠি পাওয়া গেল। জগদানন্দ আর জ্ঞানেশ্বরানন্দ কাশী থেকে দেওঘর বিদ্যাপীঠে আসছেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে বিদ্যাপীঠ থেকে ছেলেরা বাড়ি যায়। তখন সাধুরা শাস্ত্রালোচনা করেন আর ভজন করেন। বৃন্দাবন আশ্রম থেকেও চিঠি এসেছে। আহা, মনসার দেহটা গেল সর্পাঘাতে।

একজন ভক্ত সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে পুনরায় কথা।

শ্রীম (নবাগত ভক্তদের প্রতি) — এই মানুষের জীবন। এই সংসার। কিছুই থাকছে না। তবে এ নিয়ে এতো কেন? Death

(মৃত্যু) যখন abolished (বিনষ্ট) হচ্ছে না তখন এই সবে এত মগ্ন কেন? অত নাচানাচি কেন — এই অনিত্য বস্তু নিয়ে?

লোক নিজেদের বড় বুদ্ধিমান মনে করে, কিন্তু এই কি বুদ্ধির কাজ, না বুদ্ধিমানের কাজ! কতকগুলি হাবজা-গোবজা পদার্থ নিয়ে একেবারে ডুবে থাকা। রাম, রাম!

চোখের সামনে দেখছে, কে কখন চলে যাচ্ছে। এই কথাই তো শোনাতে আসেন অবতারগণ। তাঁরা বার বার এসে একই কথা শোনাচ্ছেন — অনিত্য বস্তু নিয়ে অত নাচানাচি করো না। নিত্য বস্তু ঈশ্বরের স্মরণ ন্যাও। যদি বল, এঁদের কথা শুনবো কেন, কি প্রমাণ যে এঁরা অভ্রান্ত; সূর্যকিরণ দেখবার জন্য অন্য আলো জ্বালাতে হয় নাকি? স্বতঃসিদ্ধ সূর্য — আপনার তেজই আপনার সাক্ষ্য। তেমনি অবতারগণ। তাঁরা নিজেরা শান্ত — অপরকেও শান্তি দিয়েছেন, অভয় দিয়েছেন। যাঁরা তাঁদের কথা শুনছেন তাঁরাই জগৎগুরু হয়ে থাকছেন। তাঁরাই নিঃস্বার্থ, অভয় ও প্রশান্ত। তাঁদের কাজ তাঁদের নামই জগতের অক্ষয় কীর্তি।

তাই যিনি অনন্তকালের বন্ধু তাঁরই স্মরণ নেওয়া উচিত। সময় যায়, কখন ডাক আসে তার ঠিক নাই। তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়। এই আর একটি মহাবাক্য ঠাকুরের — ‘তাড়াতাড়ি সেরে ন্যাও।’

মর্টন ইনষ্টিটিউশন।
৩০শে এপ্রিল ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দ।
কৃষ্ণাদ্বাদশী ৪৭।২, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৩১ সাল, বুধবার।

একাদশ অধ্যায়

ট্রামকারের ট্রলি ও শ্রীরামকৃষ্ণ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। সকাল আটটা। আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ আসিয়া প্রভাত-সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিল।

আজ ১লা মে ১৯২৪, ১৮ই বৈশাখ, ১৩৩১, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ৪৮।৪৬।

শ্রীম ছাদে চেয়ারে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। সামনে বেঞ্চে বিনয়, জগবন্ধু ও ছোট জিতেন বসা। মনোরঞ্জন নিচে গিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া বসিয়াছেন। শ্রীম মাঝে মাঝে একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ছোট জিতেনের বাড়ির সম্বন্ধে। ইতিমধ্যে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে নামিয়া সোজাসুজি এখানে আসিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি ঢাকা জেলার সোনারগাঁ হইতে আসিয়াছেন। সেখানে একটি নূতন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। উনি উহার মহন্ত। নূতন মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (করজোড়ে) — অনেক চেষ্টার পর মন্দিরটি হয়েছে। শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা হবে। আপনি একটিবার চলুন। কিছুই কষ্ট হবে না। মঠের অনেক সাধু যাবেন। আপনারা গেলে এইসব স্থান শীঘ্র জাগ্রত হয়ে উঠবে — তীর্থে পরিণত হবে।

শ্রীম (সহাস্যে) ইচ্ছে ত খুব হয়। কিন্তু old man-দের কিছুই স্থির নেই। ইচ্ছা থাকলে কি হয়! শরীর রুখে দাঁড়ায়।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বিনীতভাবে) — আমাদের সকলের ইচ্ছা

আপনি একটিবার চলুন। ওদেশে তো মোটেই যান নাই, একবার দেশ দেখাও হবে। কেন অত বলছি? ওখানে বেশ ভক্ত লোক সব। সকলে আসতে পারে না সংসারের নানারকম ঝঞ্ঝাটে। আপনাকে দর্শন করলে ভক্তি লাভ হবে তাঁদের ঠাকুরের প্রতি। আমি নিজে ভক্তিলাভ করেছি আপনার কাছ থেকে ঠিক যেমন মানুষ টাকাকড়ি লাভ করে একজন অপরের কাছ থেকে। দয়া করে চলুন একবার।

শ্রীম (সহাস্যে) — মনে মনে যাওয়া হবে। শরীর যে চলছে না।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রণাম করিয়া বেলুড় মঠে গমন করিলেন।

এখন সকাল নটা। ভক্তরা একথা সেকথা কহিতেছেন। একজন ভক্ত — মৌলানা মহম্মদ আলীর কথার প্রতিবাদ করেছেন আজের কাগজে দিলীপকুমার রায়।

শ্রীম — কি বলছেন ইনি।

ভক্ত — মহম্মদ আলী গান্ধীজীকে বলেছিলেন, আপনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করুন। ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। একজন পাতকী মুসলমানও একজন শ্রেষ্ঠ হিন্দুর চাইতে বড়। গান্ধীজী এই কথায় সায় দিয়ে বলেছিলেন, হাঁ, ঠিক কথা মৌলানার।

শ্রীম — দিলীপ কি বলেছেন আজ?

ভক্ত — ইনি ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' মহাবাক্যের আশ্রয় নিয়েছেন। সব ধর্মই সমান। মুসলমান ধর্ম হিন্দু ধর্মের চাইতে বড় নয়। মহম্মদ আলীর ঐরূপ উক্তি আর গান্ধীজীর উহার সমর্থন উভয়ই তাহলে ভ্রান্ত।

শ্রীম — গান্ধী মহারাজের কথাই তো আমার ঠিক বলে মনে হয়। ওরূপ না হলে ইষ্টনিষ্ঠা থাকে না। ছাদে উঠতে হবে। এখন সিঁড়ি নানা রকমের রয়েছে। লোহার, ইঁটের, কাঠের, বাঁশের আবার দড়ির — অত রকমের সিঁড়ি। এর যে কোন একটা দিয়েই ছাদে ওঠা যায়। একটাকে আশ্রয় করতে হবে মন স্থির করে। এটাতে এক পা, ওটাতে এক পা দিলে কি হয়?

ছেলে মানুষ কিনা তাই বুঝতে পারছে না। মহাত্মা গান্ধীর কথাই ঠিক। তিনি কত কষ্ট করেছেন, কত তপস্যা করেছেন। এক একবার প্রাণ যায় যায় হয়েছে।

মহম্মদ আলীর কথার অর্থ এই — যার যার ধর্মকে বড় বলে মান ক্ষতি নেই। কিন্তু অপরকে ঘৃণা করো না — তার ধর্ম মিথ্যা বলে। গান্ধী মহারাজকে দেখ না, নিজের ধর্মে অটল বিশ্বাস। আবার ইসলাম, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করেন।

ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' কথার মানেও তাই। সবই পথ, কিন্তু একটা ধরে চল। ইষ্টনিষ্ঠার খুব প্রয়োজন। মহম্মদ আলীর উক্তি ইষ্টনিষ্ঠারই পরিচয় বলে মনে হয়। হিন্দু ধর্মের নিন্দাসূচক নয়।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। মর্টন স্কুলের ছাদ। শ্রীম চেয়ারে বসা পশ্চিমাস্য। আর বেঞ্চে বসিয়াছেন, শান্তি, সুরপতি, মনোরঞ্জন, ছোট রমেশ, সূর্য ব্রহ্মচারী, জগবন্ধু প্রভৃতি। ভক্তরা অনেকক্ষণ হইতে শ্রীম-র অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজ কক্ষে ছিলেন। এইমাত্র বাহির হইয়া ছাদে বসিলেন। নমস্কারাদি হইয়া গেল। এইবার কথাপ্রসঙ্গ।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে) — সূর্যবাবু, তোমার ঐ কথাটি মনে হলে এখনও হাসি পায়। কি কথাটি বল দিকিন্?

সূর্য (অজ্ঞের হাসির সহিত) — কোন্ কথা, মনে পড়ছে না।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — কয়েক বছর আগে আমরা এঁকে পাঠিয়েছিলাম কার্তিক বোসের ডিসপেন্সারীতে ওষুধ আনতে। আমরা তখন ঐ সাদা বাড়িতে রয়েছি। উনি ফিরে এসে দেখেন, ঘরে আগুন লেগেছে। উনি ভয়ে জড়সড় হয়ে বলতে লাগলেন, — হরিবোল হরিবোল। তাঁর নাম করুন, তাঁর নাম করুন। অন্তিম সময় উপস্থিত! একটু ভেবে নিন্ সকলে তাঁর কথা!! (হাস্য)।

ভক্ত কিনা তাই এই কথা। অন্য লোকের অন্য কথা। উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের কথা, যাদের সর্বদা মনে থাকে তাদেরই বলে ভক্ত। ভক্ত কি কম!

বৃন্দাবন থেকে লিখেছে — মনসা, মালায় ঈশ্বরের নাম জপ

করতে করতে, শরীর ছেড়ে চলে গেল। এসময় অন্য লোক অন্য সব কথা কয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম — কি বল সূর্যবাবু — ঠাকুর বলেছিলেন, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন। তাহলে আমরা এই সব যা দেখছি তাতে তাঁকেই দেখছি। যদি বল, তাহলে এসবের সঙ্গে কথা কওয়া যায় না কেন? তাও তিনি কন। নিজে মানুষ হয়ে অবতার হয়ে আসেন যখন। ঠাকুর বলেছিলেন, যাই, ঐ কুকুরটার মুখ দিয়ে হয়তো মা কিছু বলবেন, শুনে আসি। ঠাকুর আবার নিজের মুখ দেখিয়ে বলেছিলেন, এই মুখে মা কথা কন।

জগবন্ধু — বাইরের সব জিনিষ দেখে ঈশ্বরের উদ্দীপন হলো একজনের। তাতে কি বলা যায় যে এই ব্যক্তি সর্বদা যোগে আছে?

শ্রীম — তা হয়। কিন্তু উদ্দীপন হতে দেন কই — সব যে ভুলিয়ে দেন।

শ্রীম চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন। লম্বা ছাদের উত্তরদিকে একাকী কিছুকাল পায়চারী করিতে লাগিলেন। মন অন্তর্মুখীন, কখন দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেছেন।

আজকাল মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। আজ এখনও সূর্যকিরণ বেশ তেজোময়। গরমে শ্রীম-র কষ্ট হয়। খানিকক্ষণ বেড়াইয়া আসিয়া আবার দক্ষিণদিকে চেয়ারে বসিলেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ রাখিয়া) — ছাদে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম, কেউ বা পাটি তুলছে, কেউ বা চেয়ারে বসে। আবার কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আমি সবাইকে দেখছিলাম, কিন্তু ওরা কেউ আমায় দেখতে পায় নাই। এই দেখেই মনে হচ্ছিল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কাণ্ডটাও এইরূপই চলছে। আমরা কয়জন এখানে বসে আছি; একে অন্যকে দেখছি। অপর কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। তেমনি এই বিশ্বের অনন্ত কাণ্ডটাও এইরূপেই চলছে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না — সব wall up (দেয়াল দিয়ে ঘেরা) করা আছে।

কেবলমাত্র একজন সব দেখছেন।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথাপ্রবাহ।

শ্রীম (বিস্ময়ের সহিত ভক্তদের প্রতি) — এইটিন এইটিফোরে নাইনথ্ ক্লাশের একটি শিশু ছেলে বলেছিল, 'সার্ ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু দেখা যায় না।' এখন তার গোঁপ দাড়ি উঠেছে। অনেক দিন দেখি নাই।

জগবন্ধু — মর্টন স্কুলের সেভেন্থ ক্লাশে পড়ে একটি ছেলে আছে — নাম ভূধর মল্লিক। সে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ঐরকম সব কথা কয়। তাকে রোজ নূতন সুট না দিলে সে স্কুলে আসতে চায় না।

আর থার্ড ক্লাশে পড়ে মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য। সেও বেশ ভক্ত ছেলে। পঞ্চানন ঘোষের লেনে বাড়ি। মঠে যেতে চায়, কিন্তু বাড়ির লোক যেতে দেয় না।

শ্রীম — এসব ছেলেদের মঠের সাধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবেন। আর আমাদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিবেন। সংস্কার আছে। অনুকূল সহায়তা পেলে real life lead (সত্যকার জীবন যাপন) করতে পারবে। যত দেখে তত শিখে — শেষ নাই।

সন্ধ্যা সমাগতা। ভৃত্য সিঁড়ির ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন রাখিয়া গেল। শ্রীম সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে বসিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম ধ্যানান্তে গান করিতেছেন।

গান। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ রাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥ ইত্যাদি।

গান। নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্কসুন্দর হে।

গানের ভাব শ্রীম-র মনকে টানিয়া রাখিয়াছে। অস্ফুট প্রশান্ত স্বরে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বগতঃ) — তিনিই তো সব করছেন। মানুষ বলে আমি করি। কোথায় তোমার কর্তাগিরি।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি) — এই দেখ আমরা সর্বদা তাঁর

সঙ্গে যোগে আছি। মা'র মাই খাচ্ছি। বল, খাচ্ছি কিনা। হাওয়া, জল, ফুড্ — এ সবের দ্বারা সর্বদা যোগে আছি। সর্বদাই মায়ের মাই খাচ্ছি। তিনি অকাতরে সকলকে মাই দিচ্ছেন।

শ্রীম মত্ত হইয়া গান ধরিলেন।

গান। অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী।
কোলে করে আছ মা গো দিবস রজনী॥

* * *

করি মাতৃস্তন্য পান হব বলবীর্যবান।
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্ম সনাতনী॥

বড় জিতেন, বলাই ভৌমিক ও পণ্ডিতের প্রবেশ।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — জিতেনবাবু, বলুন আমরা সর্বদাই মা'র মাই খাচ্ছি কি না!

বড় জিতেন — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীম — ঠাকুর কারুকে কারুকে বলতেন, তোর আর ভয় নেই। মা তোকে টেনে নিয়েছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ডেথ্ (মৃত্যু) মানে কি? যখন সবগুলি favourable conditions (অনুকূল ব্যবস্থাগুলি) তিনি withdraw (প্রত্যাহৃত) করে নিয়ে যান, তারই নাম ডেথ্। এতে একটা কিছু horrible (ভয়ঙ্কর) নেই।

ছেলের অসুখ। পাড়ার গিন্নীরা বলছে, 'দেখ দেখ, মাই খাচ্ছে কি না।' অমনি মুখে মাই দিল। না, খাচ্ছে না। মুখেই দুধ জমা হয়ে রইলে, ভিতরে যেতে পারছে না। মাই ধরতে পারছে না।

এইজন্য ঋষিরা বলছেন, আমাদের মৃত্যু নেই। আমরা অজর, অমর, অভয় ও অমৃত। (রমেশের প্রতি) কেমন করে, বল দিকিন।

রমেশ আম্তা আম্তা করিতেছে, উত্তর ঠিক হইতেছে না।

শ্রীম — (রমেশের প্রতি) — আমি তো আত্মা। দেহেরেই মৃত্যু, আমার কি? যেমন ঝুনো নারকেল — জল আলাদা আর শাঁস আলাদা। এই সবই ঋষিরা প্রত্যক্ষ করেছেন। বেদে আছে, 'মুঞ্জাদিব ঈষিকা' — মুঞ্জা থেকে, কুশ থেকে ছরটা টেনে বের করে। তেমনি

শরীর থেকে আত্মা আলাদা দেখেন। দেখতে কিন্তু কুশ আর ছর যেন এক অচ্ছেদ্য বস্তু। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। দুটো আলাদা। যোগীরা দেহ আলাদা আত্মা আলাদা দেখেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর এক একবার পাগলের মত নাচতেন, এই গানটি গেয়ে —

'আমার মন কি বল রে, শ্যামা মা কি আমার কালরে।'

শ্রীম মত্ত হইয়া সমগ্র গানটি গাহিলেন। কিন্তু পরে গানের একটি পদ বার বার গাহিতেছেন — 'কালরূপে দিগম্বরী আমার হৃদিপদ্ম করে আলো রে।' শ্রীম স্বামীজীর রচিত গানটি এর পরে গাহিলেন — "একরূপ অরূপ... দেশহীন, কালহীন, সর্বহীন — 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।" গান শেষ হইল। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। পুনরায় শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, ও রূপ দেখলে পাগল হয়ে যায়। ঠাকুর তাই বলতেন, কখনও উন্মাদবৎ, কখনও পিশাচবৎ, কখনও বালকবৎ, কখনও জড়বৎ হয়ে যায় — মায়ের ঐ রূপ দেখে।

'জড়বৎ' কেন? না, সবই দেখছে মা-ই করছেন। তাহলে আমার আর কিছু করবার নাই, এই ভেবে জড়বৎ হয়। সর্বদা আনন্দময় ও নিশ্চিন্ত তাই বালকবৎ। তিনিই সব হয়ে রয়েছেন সবই পবিত্র, তাই পিশাচবৎ। এরূপ দেখে অন্য রূপ লাগে না ভাল, তাই উন্মাদবৎ।

শ্রীম আবার গাহিতেছেন।

গান। আনরে ভোলা জপের মালা, ভাসি গঙ্গা জলে
আমার মন যদি যায় টলে।

গান। মায়ের কোলে বসে আছি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর এই গানটি গাইতেন যখন তখন, দেখে মনে হতো মায়ের কোলেই বসে আছেন। তাই অত সদানন্দ আর নিশ্চিন্ত ভাব। আমরা তখন ভাবতুম গানটি figurative (ভাবাত্মক)। এখন দেখছি তা নয়। সত্যি সত্যিই তাই। সর্বদাই

আমরা সব 'মায়ের কোলে বসে আছি'।

যেমন ট্রামকার আর তার ট্রলি। ট্রলি যেই আলগা হয়ে গেল, ট্রামকার বন্ধ। তেমনি মানুষও ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। তিনি যন্ত্রী আর সব যন্ত্র। যদি question (প্রশ্ন) কর তবে কেন আমরা এসব করছি? তার উত্তর — তিনি করাচ্ছেন তাই করছি। সে কি আমার ইচ্ছায় করছি! সব তাঁর ইচ্ছা। এই হ'ল এর easiest solution (সহজ সমাধান)।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়া একটি বিবাহের শোভাযাত্রা দক্ষিণদিকে যাইতেছে। শ্রীম ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। শোভাযাত্রা মেছুয়াবাজারের মোড়ে পৌঁছিলে পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই একটি জীব যাচ্ছে বিয়ে করতে। এও মায়েরই ইচ্ছা। তিনিই বদ্ধ করেন আবার তিনিই মুক্ত করেন। তাই ঠাকুর বলেছিলেন ভক্তদের, যারা বিয়ে করে নাই তারা কেন যাবে আর সখ করে বদ্ধ হতে। আর যাদের হয়ে গেছে বিয়ে, তারাও আর বেশী জড়াবে না। দু' একটি সন্তান হলে ভাইবোনের মত থাকবে। সকলেই মায়ের ইচ্ছায় চলছে, তিনি যন্ত্রী।

ঠাকুর কারুকে কারুকে বলতেন, তুমি মাকে বিশ্বাস কর। তাহলে তোমার আর কিছু করতে হবে না।

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি) — এই বিয়ে টিয়ে, হদ্দ চুপিচাপি দিয়ে একটু আধটু দেখতে পার। কিন্তু তাও সাক্ষীস্বরূপ হয়ে। নিজে কোনও interest (ভোগ) নেবে না।

শ্রীম আবার গানের পর গান গাহিতে লাগিলেন।

গান। সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।।

গান। শ্যামা মা কি কল করেছে কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরে কত রঙ্গ দেখাতেছে।।

গান। কখনও কি রঙ্গে থাক মা শ্যামাসুধা-তরঙ্গিনী।

গান। মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

গান। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।

শ্রীম-র মাঝে মাঝে একটি আনন্দময় উজ্জ্বল ভাব হয়, যেন পরদার আড়ালে মাকে দেখিতে পাইতেছেন। আর পরদার এদিকে তার বিচিত্র খেলা — সংসারের এই তাজ্জব কাণ্ড। তাই বিস্মিত হইয়া কখনও গানে স্তব করিতেছেন মাকে। আর মায়ের রূপ গুণ কীর্তন করিতেছেন ভক্তদের কাছে। তখন যেন আলো-আঁধারের মাঝে অবস্থান। একবার মায়ের স্বরূপ দর্শন আবার তাঁহার জগৎলীলা দর্শন করিতেছেন স্তম্ভিত হইয়া। আজিও তাঁহার সেই সুদুর্লভ ভাব। রাত্রি সাড়ে দশটা।

২

মর্টন স্কুলের ছাদ। সন্ধ্যার ধ্যান এইমাত্র শেষ হইল। শ্রীম চেয়ারেই উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। ভক্তগণ সম্মুখে, বেঞ্চে শুকলাল, মনোরঞ্জন, শান্তি, বড় অমূল্য, ছোট জিতেন, সুখেন্দু, জগবন্ধু প্রভৃতি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

শ্রীম গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। অফুরন্ত গানের প্রবাহ চলিতে লাগিল। গভীর ভাবাবেশে গাহিতেছেন। গতকাল সব ঈশ্বরের মাতৃভাবের গান হইয়াছিল। আজ চলিল গুরুভাব — পিতৃভাব।

গান। হরি জগত জীবন জগবন্ধু, কৃপাময় করুণার সিন্ধু।
শুনেছি পুরাণে কয় পুনর্জন্ম নাহি হয় হেরিলে তব
মুখ ইন্দু॥ ইত্যাদি।

গান। (সুরসংযোগে) অন্তর্বহি যদি হরিস্তপসা তত কিম্।
নান্তর্বহি যদি হরিস্তপসা তত কিম্॥ ইত্যাদি।

গান। দয়াল গুরু নামে সুখে ভাসরে মন আমার।
গুরু নামের মন্ত্র লয়ে গুরু নাম সাধন করে
দয়াল গুরু নামে ভবসাগরে দেওরে সাঁতার॥
তরঙ্গ গর্জনে শঙ্কা পেয়ো না, কলুষ কুম্ভীর পানে
ফিরেও চেয়ো না, ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুল না।
(কিছুতেই ভুল না।)
যদি পড়রে আবর্ত জলে ঊর্ধ্বে দুই বাহু তুলে,
বল কোথায় রইলে গুরু ভবের কাণ্ডারী।।

গান। চল গুরু দুজন যাই পারে।
আমার একলা যেতে ভয় করে।।
এ দেহ ছিল শ্মশানের সমান।
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করলো ফুল বাগান।।
ও তার সৌরভেতে আকুল করে।
মুনি ঋষির মন হরে।।

গান। পতিত পাবন দয়াল হরি।
বসিয়া বিরলে একান্ত বিরলে বিচিত্র জগৎ প্রকাশিলে।।
গুরু হয়ে জ্ঞান উপদেশ দিলে ভবার্ণবে হইলে কাণ্ডারী।
অশেষ গুণ মানব সন্তানে কত ভালবাসা, আহা মরি মরি।।

গান। হরি হরি বলে নিতাই যায় আর গৌর যায়।
(মধুর হরি নাম বলে যায় রে)।।
যে নাম নারদ জপে দিবানিশি
(আয় সেই হরি নাম দিব তোরে)।।
যে নাম শিব জপে পঞ্চ মুখে
(আয় সেই হরি নাম দিব তোরে)।।
(মধুর হরি নাম বলে যায় রে)।।

গান। সুরধুনীর তীরে হরি ব'লে কে যায় রে।
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে রে।

গান। আমার গৌর নাচে।
নাচে সংকীর্তন মাঝে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্ত সঙ্গে আমার গৌর নাচে।।
হরি বোল হরি বোল বলে চায় গদাধর পানে। ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইল। শ্রীম আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। উত্তর দিকের ছাদে গিয়া একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও পরে কেহ কেহ উঠিয়া গেলেন।

আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন — স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। শ্রীম চলিতেছেন আর কথা বলিতেছেন — ঠাকুর এইখানটা নেচে নেচে গাইতেন। শ্রীমও অর্ধনৃত্যে গাহিতেছেন। — 'জয় কালী জয় কালী

বলে’ — (ভাল মন্দ দুটো কথা আছে। ভালটা ধরে থাক)।

প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। শ্রীম ও ভক্তগণ সিঁড়ির ঘরে প্রবেশ করিলেন। বড় জিতেন, ছোট রমেশ, বলাই, সূর্য প্রভৃতিও ইতিমধ্যে আসিয়াছেন।

একটু পর ‘কথামৃত’ পাঠ চলিতে লাগিল। ঠাকুরের হাত ভাঙ্গিয়াছে। শিবপুরের ভক্ত সঙ্গে সেই অবস্থায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — চক্রগুলির কি নাম পড়া হ’ল?

ভক্ত — মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার।

শ্রীম — অনাহত চক্র থেকেই সাধকজীবন আরম্ভ। সাধারণ মানুষের মন মূলাধার, সাধিষ্ঠান, ও মণিপুরে থাকে। অর্থাৎ লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে থাকে। এই তিনটেই হীনস্থান। এই তিনটের উপরে অনাহত চক্র। এটি উত্তম স্থান। এখানে মন উঠলে ঈশ্বরীয় বিষয় ভাল লাগে। এসব বিচার করে কি বুঝবে মানুষ। আবার শরীর ডিসেকসান্ কর কিছুই দেখতে পাবে না। যোগীদের দৃষ্টিতে কেবল এসব দেখা যায়। মন বিশুদ্ধ চক্রে আরোহণ করলে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কইতে আর শুনতে ভাল লাগে দিনরাত। এর উপর আজ্ঞা চক্র। এখানে ঈশ্বর দর্শন হয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হতে পারে না তখনও। সহস্রারে গেলে এক হয়ে যায়। ‘দেশহীন কালহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়’।

কি আশ্চর্য পুরুষ ঠাকুর। ‘সহস্রার’ এই নাম উচ্চারণ করতে করতে একেবারে সমাধি। কি মহাযোগী! অপর যোগীদের সারাজীবনে হয়তো বহুকষ্টে একবার এই সমাধি হয়। আর এঁর কথায় কথায় সমাধি। যেন শুকনো দেশলাই — একটু ঘষা পড়লেই ফস করে জ্বলে উঠে। একতলা থেকে একেবারে সাততলায় উঠে পড়ে মন। কে ইনি যাঁর মুহুর্মুহু এ দুর্লভ সমাধি!

(সহাস্যে) এক একবার ভক্তদের জিজ্ঞেস করতেন। বলতেন, ‘আমার এ কি অবস্থা হ’ল বলতো। কিছু শুনলে বা বললে বেহুঁস হয়ে যাই।’ কেন বলতেন? ভক্তরা তাঁকে চিনতে পারছে কিনা তাই

দেখছেন। যতক্ষণ না ভক্তরা তাঁকে পূর্ণরূপে ঈশ্বর বলে বুঝতে পেরেছে ততক্ষণ চিন্তিত থাকতেন। যেই দেখতেন অপরের সঙ্গে তুলনা করে ভক্তরা বুঝতে পারছে যে ইনি সাধারণ মানুষ নয়, সাধারণ যোগী নয় তখনই নিশ্চিন্ত হতেন। কি পরিশ্রম ভক্তদের তৈরী করার জন্য। কেন এ সব পরিশ্রম? কারণ সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল মাত্র সেই মন স্থির থাকে যে মনের আশ্রয় ভগবান স্বয়ং। ঠাকুর সেই ভগবান। তাঁতে আশ্রয় নিলে ভক্তদের মন কখন আর বিভ্রান্ত হবে না। তবেই জগতের লোকের বিচ্ছিন্ন মনকে এনে তাঁর সঙ্গে বেঁধে দিবে। তবেই জগতের কল্যাণ। আর ঐ ব্যক্তিদেরও কল্যাণ। তাই ভক্ত তৈরী করতে অত পরিশ্রম করতেন। এই ভক্তরাই জগতের লোকের শিক্ষক হবে কিনা, তাই অত কাজ তাঁর।

তাঁকে যে যতটা বুঝবে ততটা উপরে উঠবে। (সহাস্যে) ঠাকুরের ঐসব কাজ যেন পাখীদের বাচ্চাদের শিখানোর কাজ। বাচ্চাগুলি কি করে আত্মরক্ষা করবে, কি করে আহার সংগ্রহ করবে, কি করে যুদ্ধ করবে সব শেখায়।

ভক্তরা সংসারে কি করে থাকবে তারও দিক্‌দর্শন দিচ্ছেন। বলছেন, ঠিক্ ঠিক্ সংসারে নির্লিপ্ত থাকবে। সব করবে যখন যা দরকার। কিন্তু অযথা অপরের মত অত ভাববে না। কেন ভাববে না? না, মা জানেন সব। আর মা সব মঙ্গল করেন। তোমার অহংকার আছে তাই কতক চেষ্টা কর। যখন আর চেষ্টাও চলে না শরীর মনে শক্তি নাই, অর্থ বিত্ত লোকজন নাই, তখন তাঁর উপর নির্ভর ক'রে বসে থাক্। এবার তিনি সব করবেন — মা। তিনি সর্বমঙ্গলময়ী কিনা, বস্!

তাইতো তাচ্ছিল্যের সহিত বললেন, 'ওগুনো অত ভেবো না।' 'ওগুনো' মানে যাকে 'These things' ক্রাইষ্ট বলতেন। মানে টাকাকড়ি, দেহসুখ — Physical sense of security. আদর্শটি ধরে দিলেন সামনে — 'যদৃচ্ছালাভ'। টাকাকড়ি আসছে আর খরচ হচ্ছে। সঞ্চয় নেই, ধারও নেই। কতবড় একটা problem solve

(সমস্যা সমাধান) করে দিলেন।

এই solution কি সকলে নেবে? তা নয়। যারা ভগবান লাভ করতে চায় তাদের জন্য এ ব্যবস্থা।

‘কথামৃত’ পাঠ চলিতেছে। শ্রীম নীরবে ধ্যানস্থ হইয়া শুনিতেছেন। কতক্ষণ পর পুনরায় কথা।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — ভক্তি লাভের steps (ধাপগুলি) কি কি, — ঠাকুর যা বললেন? (পাঠক বলতে না পারায় অপর একজন ভক্তের প্রতি) কি গা?

ভক্ত — এক, সৎসঙ্গ; দুই, সৎসঙ্গ থেকে ঈশ্বরীয় কথায় শ্রদ্ধা; তিন, ঈশ্বরে নিষ্ঠা; চার, সেবা; পাঁচ, ভক্তি;, ছয়, ভক্তি পাকলে ভাব; সাত, মহাভাব; আট, প্রেম; নয়, বস্তুলাভ। নয়টা ধাপ।

শ্রীম — ঠাকুর বলছেন, জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বর কোটির, যেমন চৈতন্যদেব, ঠাকুর, এঁদের মহাভাব, প্রেম হয়।

এসবের মূল সাধুসঙ্গ। তাই সাধুসঙ্গ করা দরকার। এটি না হলে এদিকে কিছুই হবার যো নাই। (ভক্তদের প্রতি) এই আপনারা সব যা করছেন, নিত্য মঠে যাচ্ছেন।

আবার দেখুন কেমন আয়োজন। ঠাকুর কি শুধু সাধুসঙ্গের কথা বলেছেন, আবার সাধু তৈরী করে গেছেন — যাতে অপরের কল্যাণ হয়। অত ভাবনা তাঁর ভক্তদের জন্য, জগতের জন্য।

এই সাধুরা যেন সমাজ-শরীরের শির। এঁরা সমাজ-শরীরকে চালনা করেন। শির যেমন শরীরে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ তেমনি সাধু সমাজ-শরীরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে শিক্ষা দেন সমাজকে — ঈশ্বরে মন রেখে অন্য সব কর।

যারা সাধুসঙ্গ করছে বুঝতে হবে তাদের পূর্বজন্মের তপস্যা ছিল। তবেই সাধুর মূল্য বুঝতে পারছে। সাধু মানে যারা দিবানিশি এক ঈশ্বরকে নিয়ে থাকবার চেষ্টা করে। একজন উকিল মোকদ্দমা নিয়ে থাকে, ডাক্তার রোগী নিয়ে থাকে — তেমনি সাধু থাকে ঈশ্বরকে নিয়ে।

তাই সাধুসঙ্গটি ধরে থাকলে বাকী সব আপনি আসবে। যেমন

বাছুরকে ধরে থাকলে গাই আসে। সাধুকে ধরে থাকলে ঈশ্বরলাভ হয়।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। শ্রীম-র রাত্রির আহার এখনও আসিতেছে না। তিন তলায় পরিবারবর্গ আছে। অন্তেবাসী ইতিমধ্যে তিনবার নিচে গিয়া তাড়া দিয়া আসিয়াছেন। তথাপি আহার আসিল রাত্রি পৌনে এগারটায়। অন্তেবাসী শ্রীমকে খাওয়াইতেছেন। ইনি বিরক্ত হইয়াছেন বাড়ির লোকের উপর। শ্রীম তাঁহাকে শান্ত করিতেছেন। বলিলেন 'কি আর হয়েছে। একটু দেরী হয়েছে। না, আমার কোন কষ্টই হয় নাই।

একটি ভক্ত (স্বগত) — আশ্চর্য লোক শ্রীম। নিজের ঘরে যেন অতিথির মত আছেন। অথবা যেন বড় ঘরের ঝিয়ের মত। কিম্বা সর্বত্যাগী সাধুর মত — যখন জগদম্বা ভিক্ষা দিবেন তখনই আহার করিবেন।

এইমাত্র 'কথামৃত' পাঠ হইল। জ্ঞানী ভক্ত সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া থাকেন। কথামৃতকার শ্রীম-র নিজের জীবনেই দেখিতে পাইতেছি 'কথামৃত' কথিত আদর্শ নির্লিপ্ত সংসারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাত্রি সাড়ে এগারটা। আহারান্তে শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন পাশে অন্তেবাসী। শ্রীম নীরব। কিছুক্ষণ পর নিজে নিজে করুণভাবে প্রার্থনা করিতেছেন —

'দেহসুখ চাই না মা। লোকমান্য চাই না মা।
অষ্টসিদ্ধি চাই না মা। শত সিদ্ধি চাই না মা।
তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।
আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।'

বুঝি বা অন্তেবাসীর শিক্ষার জন্য এই প্রার্থনা!

মর্টন স্কুল কলিকাতা।
২রা মে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ ১৯শে বৈশাখ, ১৩৩১ সাল,
শুক্রবার, কৃষ্ণাচতুর্দশী ৫১।৪৪।

দ্বাদশ অধ্যায়

মন-বিনাশে ব্রহ্মজ্ঞান

১

মর্টন স্কুলের ছাদ। সন্ধ্যার ধ্যান হইয়া গিয়াছে। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। শ্রীম-র সম্মুখে তিনদিকে বেঞ্চে ভক্তগণ বসা — বড় জিতেন, ছোট নলিনী, ফকির, ধর্মপদ, বিনয়, বলাই, মোটা সুধীর, মনোরঞ্জন, ছোট রমেশ, গদাধর, জগবন্ধু প্রভৃতি। এখন রাত্রি আটটা।

আজ শুক্রবার,২৬শে বৈশাখ, শুক্লা পঞ্চমী ১৯।৫ পল, ১৩৩১ সন।

শ্রীম কথামৃত পাঠ করিতে বলিলেন। নিজেই বাহির করিলেন, তৃতীয় ভাগ পঞ্চদশ খণ্ড — বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐদিন ছিল মে মাসের নয় তারিখ, আজও ৯ই মে তাই যেন বাৎসরিক স্মৃতি উৎসব। জগবন্ধু পড়িতেছেন।

পাঠক (পড়িতেছেন), শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন — কি জান একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সূক্ষ্মা গতি।...

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন, ঠাকুর বলছেন বাসনা ত্যাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না।

তবে হয়, যদি তাঁর কৃপা, তাঁর দয়া হয়। তখন একক্ষণে সিদ্ধিলাভ হতে পারে।

কৃপা হয় কিসে? তার কোনও condition (সর্ত) নাই। তাঁর ইচ্ছা হলেই তাঁর কৃপা হয়।

ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের বালক স্বভাব। কোঁচড়ে রত্ন রয়েছে। চাও, সে দিবে না। একজন চায় নাই। সে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। হয়তো তাকে বালক ডেকে এনে সব দিয়ে দিবে।

উপায় কি, তাও বলে দিয়েছেন — বিদ্যামায়া আশ্রয় করে পড়ে

থাকা। সাধুসঙ্গ, তীর্থ, সাধুভক্তের সেবা, ঈশ্বরের সেবা, দয়া, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, এসব নিয়ে পড়ে থাকতে হয়।

বলছেন, এরপর আর একধাপ উঠলেই ঈশ্বর দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখা যায় ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন। নিত্যের পর লীলা। দু'জন বেশ্যা ছিল একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। দেখেই ঠাকুর হাতজোড় করে প্রণাম করলেন। কেন? তিনি যে দেখেছেন সাক্ষাৎ ভগবতী। আহা, এ দৃষ্টি কার আছে — কততে হয়!

মনের নাশ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। মনের নাশ হয় কখন? যখন বাসনা যায়। যখন ষোল আনা মন ঈশ্বরময় হয়ে যায় তখন বাসনা যায়। একেই বলে মনের নাশ, এরই নাম জ্ঞান। এখন মনে আছে 'আমার ঘর, আমার ছেলে', — সব কিছুতে 'আমার আমার'। জ্ঞান হলে দেখে, ঈশ্বরের ঘর, ঈশ্বরের ছেলে — সব ঈশ্বরের, সবই ঈশ্বর। একেই চিত্তশুদ্ধি বলে। মনের নাশ, চিত্তশুদ্ধি আর জ্ঞান একই কথা।

ঠাকুর বলেছেন, আন্তরিক যে ঈশ্বরকে জানতে চাইবে তারই হবে — 'হবেই হবে'। যে ব্যাকুল, আর ঈশ্বর বৈ কিছু জানে না তারই হবে।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারে কে, ঈশ্বর ছাড়া? 'হবেই হবে'।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — নরেন্দ্রকে ভালবাসেন, তাই তাঁর কথা ঠাকুর বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরীয় দর্শনাদি মনের ভুল — নরেন্দ্র যেই একথা বললেন, অমনি ঠাকুর সংশয়ে পড়লেন আর কেঁদে কেঁদে জগদম্বাকে বললেন, এই কথা। মা দেখালেন সব চৈতন্যময় এই সব রূপ — চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য।

উঃ, নরেন্দ্রকে কত ভালবাসছেন!

একজন ভক্ত — ঈশ্বরও যখন অবতাররূপে অবিদ্যামায়ায় বদ্ধ হন — 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে', তা হলে জীবের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কোথায়?

শ্রীম — অবতার মনে করলেই মুক্ত হন, জীবের তা হয় না।

ভক্ত — সাধারণ জীব সিদ্ধ হওয়ার পর কি অবিদ্যায় পড়তে পারে?

শ্রীম — পারে। তবে তার আর জন্ম নাই। ভিতরে জ্ঞান থাকে।

প্রারব্ধের ভোগ হয় মাত্র। ঠাকুর তাই বলতেন, বাপ ছেলের হাত ধরলে আর বেতালে পড়ে না। অবতারাদির হাত ধরে থাকেন ঈশ্বর। একমত আছে, প্রবল প্রারব্ধের জন্য জন্ম হয়।

তাঁর কৃপায় হঠাৎ সিদ্ধ যে হয় সে যেন গরীবের ছেলে হঠাৎ একজন বড়লোকের নজরে পড়ে গেল। তারপর তার মেয়ে বিয়ে করে বড় হয়ে গেল। অথবা হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন আলোকিত হয়ে যায় সার্চলাইট পড়লে এক মুহূর্তে, সে যেন তাই।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (স্বগতঃ) — ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা, কে বুঝবে! অত লোক ঠাকুরের কাছে এসেছে, কেউ বিশ বছর, কেউ পঁচিশ বছর। কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারলো না অবতার বলে। পরন্তু অন্তরঙ্গদের কাছে ধরা দিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কে জানতো যে শরীর ত্যাগের ইঙ্গিত করছেন। এই যে পড়া হলো ঠাকুর বলছেন, 'এখানকার যারা তারা সব জুটে গেছে'। অর্থাৎ অন্তরঙ্গরা সব এসে গেছেন।

এই কথা বললেন 'মে' মাসে। এর ছ'মাস পরেই অসুখের সূত্রপাত হলো। এর দশমাস পর শরীর যায়। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন লীলা সম্বরণের। কিন্তু ভক্তরা ধরতে পারলেন না।

বলছেন, এরপরও লোক আসবে। তারা বাইরের। তাদের মা বলে দিবেন, এই কর — এই রকম করে ঈশ্বরকে ডাক।

এর মানে — এদেরও কাজ হয়ে যাবে তাঁর দর্শনে। কিন্তু অন্তরঙ্গদের ডবল কাজ — তাঁদের নিজের কল্যাণ ও জগতের কল্যাণ, দুই-ই করতে হবে।

পাঠ শেষ হইয়াছে। শ্রীম ভোজন করিতে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ সব ছাদে বসা। যাইবার সময় বলিলেন, "জগবন্ধুবাবু, হারমোনিয়ামটা আনতে হবে।" হারমোনিয়াম আসিলে একটি নূতন ভক্ত গান গাহিতে লাগিলেন।

শ্রীম ভোজন করিয়া ছাদে ফিরিয়াছেন। বলিলেন, "জগবন্ধু নাই এখানে?" 'আজ্ঞে হাঁ' বলিয়া জগবন্ধু নিকটে গেলে বলিলেন, এই

বেলটা সকলকে দিতে হবে — 'বেলতলা'র বেল।

শ্রীম ও জগবন্ধু উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম বলিলেন, "এই (কলাই করা) ডিসটা নিন্ আর এই ছুরিটা। সব ধুয়ে নিতে হবে। বীচি যথাসম্ভব বাদ দিয়ে সকলকে দিতে হবে।"

জগবন্ধু ছাদের টিনের দরজার সম্মুখে বসিয়া বেল ভাগ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এই সামান্য একটা বেল। এটা পরিবেশন করিতেছেন ভক্তদের — যেন অমূল্য রত্ন। কেন এত শ্রদ্ধা ইহার উপর? দক্ষিণেশ্বরের 'বেলতলা'র বেল তাই কি? শ্রীম-র ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ কৃপারূপ মহাপ্রসাদ বেলরূপে বিতরণ করা হইতেছে।

শ্রীম ছাদে মাদুরের উপর আসিয়া বসিয়াছেন ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাস্য। কথাবার্তা চলিতেছে।

একজন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — বিয়ের অন্ন, শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে কেন বারণ করতেন ঠাকুর?

শ্রীম — বিয়েতে বারণ করতেন এই জন্য, এতে যোগদান করলে আবার সংসারের উদ্দীপন হবে। আর শ্রাদ্ধে কেন খেতে নাই তার কারণ দুটি। প্রথম কারণ হলো, 'আমার' 'আমার' করা অজ্ঞান। তাতেই শোক। এই অজ্ঞান শোকের অন্ন খেলে অজ্ঞান বৃদ্ধি হয়। এই অন্ন খেতে পারে যথার্থ ব্রাহ্মণ — পেটে বৈশ্বানর অগ্নি জাগ্রত কিনা তাই হজম হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কারণ এই, এত শোক আর এদিকে, পনর দিন যেতে না যেতেই ভোজন উৎসব। কি নিষ্ঠুরতা! আহা কিবা শোক! নেড়া মাথা কুটুম্বদের খাওয়াচ্ছে আবার নিজেও খাচ্ছে। শোক আর ধরছে না!

অনেকের আছে বাড়িতে শ্রাদ্ধ হলে মুড়িমুড়কি ভিজিয়ে খায়। ওসব শোকের জিনিষ কিছুই খাবে না।

শ্রাদ্ধে সঙ্কল্প নিজের নামে করলে ফ্যাসাদে পড়তে হয়। সব ভগবানের নামে সমর্পণ করে দিতে হয়। সৎ ব্রাহ্মণ খেলে মৃতের পারলৌকিক ফল ভাল হয়।

ভক্ত — সন্ন্যাসীরাও তো এই মৃতোৎসব করেন তের দিনে।

শ্রীম — সন্ন্যাসীরা আনন্দোৎসব করেন ব্রহ্মোৎসব। মৃত ব্যক্তির নির্বাণ মুক্তি হওয়ায় তাঁরা আনন্দ করেন। এই শোকমোহময় সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছেন তাই এই আনন্দ। সন্ন্যাসীদের জীবিতাবস্থায়ও আনন্দ মৃত্যুতেও আনন্দ। তাঁরা যে শোকমোহময় সংসারাশ্রম ত্যাগ করে পরমানন্দে আশ্রয় নিয়েছেন। মৃত্যুর সময় তাঁরা আনন্দে হাসতে হাসতে যান। তাই অপর সাধুরাও আনন্দোৎসব করেন। সব ভগবানে নিবেদন করে প্রসাদ পান। আমাদের শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মৃত্যুর পূর্বে আনন্দে গান গেয়েছিলেন — 'পোহাল দুঃখ রজনী' এই বলে। এই প্রথম পদটা তিনি গেয়েছিলেন। বাকী পদ যোজনা করেছিলেন গিরিশবাবু। সবটাই গিরিশবাবু নিজে গেয়ে শুনিয়েছিলেন শশী মহারাজকে। তাঁদের সব আনন্দ, জীবন-মরণ সব।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — সংসারীদের কি দশা দেখুন, কি inconsistencies (বিরুদ্ধ আচরণ)! মায়ের স্নেহ মমতা কত, কত কোমল তাঁর প্রাণ! কিন্তু কই, মাগুর মাছগুলো কি করে আছড়ে মারছে দেখুন। কেন, না ছেলে অসুস্থ, তাকে পথ্য দিতে হবে। এদিকে স্নেহ ওদিকে নিষ্ঠুরতা। ছেলের অসুখ। মা বড় ব্যাকুল। একজন জ্যোতিষ এসে বললে, নরবলি দিলে ছেলে ভাল হয়ে যাবে। পাড়ার ছেলে বন্ধুকে দেখতে এসেছে। অমনি তাকে ধরে বলি দিলে মা। আহা, কি কোমলতা, কিই বা স্নেহ! এই সব beautiful inconsistencies (সুন্দর বিরুদ্ধ আচরণ) আছে সংসারে।

শ্রীম — ওরা বলতো ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা, এখনও বলে পলিটিসিয়ানরা — all men are equal (সকল মানুষ সমান)। ঠাকুর শুনে বললেন, আহা equal (সমান) কত! ধরছে না একেবারে! একজন সাধু বাড়িতে এলেন, চার পয়সা কি আট পয়সার খাবার এলো। আর জামাইবাবু এলে সহরের যত সব দুষ্প্রাপ্য বস্তু আনা হবে। কোথাকার খইচুড়, কৃষ্ণনগরের কাঁচাগোল্লা আর বাগবাজারের কি?

বড় জিতেন বলিলেন, 'রসগোল্লা'। শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে সহাস্যে বলিলেন, 'রসগোল্লা'।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একজন গুরুর বই বাঁধবার জন্য এক টুকরো কাপড়ের দরকার হয়েছিল। গুরুপত্নী গিয়ে শিষ্যকে বললে। তার দোকান আছে। শিষ্য বললে, হাঁ মা পাঠিয়ে দিব। টুকরো পড়ুক। ছয় মাস হয়ে গেল আর টুকরো পড়ছে না। টুকরো পড়লে গুরুর বই বাঁধা হবে (সকলের হাস্য)।

মাছ ধরছে একজন। গুরুর বাড়িতে অতিথি এসেছে। মাছ দিতে হবে, একজন গিয়ে খবর দিলো। অনেক মাছ ধরেছে রাঙ্গা চোখ বড় রুই মাছ, বিশ পঁচিশ সের ওজন। লোক বললে, দাও এইতো অনেক মাছ রয়েছে। শিষ্য বললে, এগুলি সব বড় মাছ। দাঁড়াও একটা কাটিবাটা উঠুক (সকলের হাস্য)। হাঁ, গুরুর বাড়িতে ঐ পর্যন্ত এর বেশী নয়।

এগুলি হলো beautiful inconsistencies (সুন্দর অসমঞ্জস ব্যবহার) ভক্তির। ঠাকুর এই সব দেখেই সাবধান করে দিছলেন। গুরু করা চারটিখানিক কথা নয়। যার গুরু লাভ হয়েছে তার আর ভয় নাই, বলেছিলেন। গুরুবাক্যে বিশ্বাস একমাত্র উপায় ঈশ্বর লাভের। গুরুবাক্য কেমন? যেন অনন্ত সমুদ্রে ভেলা। একথা কে নেবে? যার আশ্রয় হয়েছে বিদ্যামায়া, যে ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল। অন্যরা অবিদ্যামায়ায় পড়ে আছে। তখন ঐ সব হবে — ছয় মাস পরে একটুকরো কাপড় দিবে গুরুকে।

লোকে বলে, উনি বড় দয়াল। বাজার থেকে কুলী নিয়ে এসেছে। এক মণ ওজন বোঝা মাথায় — রোদে ঘেমে অস্থির। তিনটি পয়সা বের করে দিলে বাবু। আর একটা পয়সার জন্য কত মিনতি। বাবুর প্রাণ গলবে না। তার honest labour (সৎ পরিশ্রম)। তাকে একটা পয়সা দিবে না, তার প্রাপ্য। এদিকে বলা হচ্ছে, বাবু বড় দয়াবান। আহা, কত দয়া একেবারে উপচে পড়ছে।

আর একটা দেখুন না — বাড়িতে ছেলেপুলের অসুখ হলে রাজ্যের যত সব বড় বড় ডাক্তার আনবে। আর চাকরদের অসুখ হলে ফিরেও জিজ্ঞেস করবে না কি হয়েছে। এই সব beautiful inconsistencies (সুন্দর অসমঞ্জস ব্যবহার) আছে। ঠাকুর বলতেন,

মায়ার কাণ্ডে একটু এলোমেলো থাকবেই।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — নারদ গেলেন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে। দেখেই সীতারাম সিংহাসন থেকে নেমে এসে নারদকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তারপর জোড়হাতে বলছেন, ‘প্রভো, আমরা বিষয়ে ডুবে রয়েছি। আপনাদের শুভাগমন হলে তবে আমাদের চৈতন্য হয়। আপনাদের আগমন আমাদের মত সংসারীদের কল্যাণের জন্য।’ রাম humanity-র (মনুষ্যসমাজের) প্রতিনিধিরূপে এই prayer (প্রার্থনা) করছেন। রাজা লোকের representative (প্রতিনিধি) কিনা। তাই সকলের পক্ষ থেকে স্বাগত করছেন।

সংসারে কপটতা আছেই, থাকবেও।

পুরীতে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে চাইলো। সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্ত ছিলেন কিনা, তাই তাঁরা চৈতন্যদেবকে অনুরোধ করলেন। শুনেই চৈতন্যদেব একেবারে দাঁড়িয়ে উঠলেন আর বললেন, ‘তাহলে আমি চললুম আলালনাথে। আমি কি তাহলে এই জন্যই সংসার ত্যাগ করলাম!’ কেন করলেন এই অভিনয়? রাজা বিষয়ীর শ্রেষ্ঠ তাই দেখা করবেন না। পরে দর্শন হয়েছিল যখন রাজভাব ছেড়ে দীনভাবে রথাগ্রে ঝাড়ু দিচ্ছিলেন প্রতাপরুদ্র। আর মুখে গোপীগীতা আবৃত্তি করছিলেন — ‘তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্’। তখন ভাবে আবিষ্ট হয়ে দৌড়ে গিয়ে প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করলেন।

(সহাস্যে) একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লেন তল্পীতল্পা নিয়ে চৈতন্যদেব। উনি যে খাঁটি সন্ন্যাসী তাই তাঁর তল্পীতল্পা কেবলমাত্র কৌপিন। অন্য সন্ন্যাসীদের তল্পীতল্পা অনেক — বাক্স পেটরা কত কি!

রাম অবতারে গৃহস্থ সেজে এসেছেন — আবার রাজা। তাই এইরূপ ব্যবহার নারদের সঙ্গে। চৈতন্য অবতারে সন্ন্যাসী হয়ে এসেছেন। সন্ন্যাসী জগৎগুরু। তাই এরূপ ব্যবহার।

এ সবই লোকশিক্ষার জন্য। তাঁদের কি আর কারো উপর ঘৃণা বিদ্বেষ আছে? তা নয়। রাজাকে শিক্ষা দিলে অপরেও শিখবে। তাই চৈতন্যদেব অত কঠোররূপ ধারণ করলেন।

যতক্ষণ অহংকার ছিল, 'আমি রাজা' বলে, ততক্ষণ দর্শন দেন নাই। যেই ভগবানের কাছে দীন হল অমনি দর্শন দিলেন — একেবারে আলিঙ্গন লাভ করলো রাজা।

শ্রীম (বড় জিতেনকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তদের প্রতি) — কেউ কেউ মনে করে আমি সরে পড়লে ছেলেরা খাবে কি, সব মরে যাবে। কিন্তু কি অজ্ঞান, এ কথা ভাবে না, আজ যদি আমি মরে যাই তাহলে ছেলেরাও মরে যাবে কি? যদি বল, হাঁ, ছোট দুই তিনটা মরে যাবে। তা আগেই না হয় দুটো মরলো।

দেখ কি beautiful inconsistency (সুন্দর বিরুদ্ধ আচরণ)।

আগলিয়ে রাখলে যে ছেলেদের অমঙ্গল হয়। শিক্ষা দিতে হয়, নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে।

অনেক কালের কথা। আমাদের বাড়িতে একজনকে ওর ঠাকুরমা নিয়ে এল। মা বাপ কেউ নাই, গলায় কাছা, শ্রাদ্ধ করতে হবে। অনেককাল আর তার খোঁজ পাই নাই — lost sight of (চোখের অন্তরালে) হয়েছিল। এখন শুনলুম তার আটশ টাকা মাইনে, রেলে চাকরী করছে। ছেলেপুলেদের বি.এ., এম.এ. পাশ করিয়েছে। কিন্তু পূর্বের চালটি ঠিক বজায় রেখেছে। নিজে জানে কিনা সংসারের রূপ। এই লোকটি নিজের energy-র (শক্তির) উপর stand (দাঁড়) করেছে নিজকে। এখন কত গাড়ীঘোড়া।

বাপের উচিত ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া। ছেড়ে দিলে ওরাই নিজের পথ নিজে করে নেবে। এতে নিজের পায়ে দাঁড়াবে আর বাপকেও বন্ধন মুক্ত করবে।

এসব মহামায়ার খেলা। দেখে বুঝেও মানুষ পালন করতে পারে না? তাঁর কৃপা হলে দু'একজন ঠিক ঠিক পথে চলতে পারে।

২

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ণ দুইটা। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহিমবাবু (শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত) আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিতে। অন্তেবাসী তাঁহাকে দোতলায় সিঁড়ির পাশের বসিবার ঘরে বসাইয়াছেন। গদাধরও আসিয়াছেন।

আজ ১০ই মে ১৯২৪ খৃঃ, ২৭শে বৈশাখ ১৩৩১ সাল, শনিবার শুক্লা ষষ্ঠী ১১।৫৩ পল।

শ্রীম চারতলার স্বীয় কক্ষ হইতে নিচে নামিয়াছেন। এখন আড়াইটা। মহিমবাবু উঠিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাঁহাকে ধরিয়া অতি আত্মীয়ের মত উঠাইয়া বসিতে বলিলেন। আনন্দে গায়ে হাত বুলাইতেছেন। শ্রীম-র চক্ষুতে আনন্দের ছটা। বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কেমন আছ — এলে কবে? খুব আনন্দে ছিলে শুনতে পাচ্ছি। তা হবে না, উত্তরাখণ্ড, হিমালয়, গঙ্গা মহাতীর্থ আবার সাধুসঙ্গে বাস। অমন সংযোগ কপালে থাকলে হয়।"

শ্রীমহিমবাবু — কন্‌খলে ছিলুম সেবাশ্রমে। কল্যাণ স্বামী আর নিশ্চয় স্বামী এঁরা ছাড়লেন না। তারপর আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা পড়তে চাইলো। কত যত্ন করেছে। তিনমাসের জন্য গিয়ে চৌদ্দ মাস হয়ে গেল তবুও ছাড়তে চায় না।

শ্রীম — তা হবে না? তোমার মুখে স্বামীজীর কথা কত শুনেছে। ওরা খুব ভাগ্যবান। পায় কোথা অমন লোক? তাই ছাড়তে চায় নাই। বাবা মা, বাড়িঘর সব ছেড়ে এসেছে ঈশ্বর লাভের জন্য, — কি রকম ব্যাকুল সব।

ঘরে তিনখানা বেঞ্চ আছে হাইবেঞ্চযুক্ত — পূর্ব পশ্চিমে লম্বমান। উত্তরদিকের বেঞ্চে শ্রীম বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য ঘরের মধ্যস্থলে। আর একখানায় বসিয়াছেন মহিমবাবু উত্তরাস্য শ্রীম-র সম্মুখে।

মহিমবাবু হরিদ্বার, কনখল, লছমনঝোলা, স্বর্গাশ্রম, ঋষিকেশ প্রভৃতি তপোভূমি ও মহাত্মাদের কথা বলিতেছেন। মথুরাদাসের কথা খুব উৎসাহে বলিতেছেন — বালকের মত স্বভাব, খুব কঠোরী একটা গুহাতে থাকেন। আমেরিকার ফক্স সিষ্টার দুইজনও কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন।

অন্তেবাসী মহিমবাবুর পছন্দমত কিছু জলযোগ আনিয়াছেন। দুই পয়সার চিনাবাদাম আনিলেন প্রথম। মহিমবাবু খাইতেছেন আর কথা কহিতেছেন। তারপর আসিল দুই পয়সার মুড়ি তেল-মাখান। তাতে গোটা চার কাঁচা লঙ্কা কুঁচি আর আদা। সর্বশেষ আসিল

কতগুলি গরম সিঙ্গাড়া। মহিমবাবু হাতে তুলিয়া ভক্তদের উহার ভাগ দিতেছেন আর কথা কহিতেছেন উত্তরাখণ্ডের তপস্বী ও তপস্যার।

শ্রীম — আহা, কত ঈশ্বরের কথা শুনিয়েছ ছেলেদের। তাইতো তোমাকে ওরা অত সেবা করেছে। একি আর personal credit (ব্যক্তিগত সম্মান), তুমি দিনরাত একটা না একটা নিয়ে ওদের আনন্দ দিয়েছ, উদ্দীপনা দিয়েছ — কখন শাস্ত্রপাঠে কখন ভজনে লাগিয়েছ।

(জগবন্ধুর প্রতি) দেখ ইনি গিছলেন তিনমাসের জন্য আর রেখে দিল চৌদ্দমাস। ওরা ছাড়ছে না। কত ঈশ্বরের কথা শুনিয়েছেন ওদের। সাধুরা আবার রেঁধে বেড়ে এঁকে খাইয়েছে, ঠাকুর সেবা নারায়ণ সেবা করছে। আবার সাধু সেবা। (একজনকে দেখাইয়া) আর এঁরা রান্নার ভয়ে কুঁড়েমি করছে। সাধুরা আবার এর সঙ্গে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেছে। সাধুরা নিজেরাই রান্না করে সকলকে খাইয়েছে। আহা, করবে না ওরা, ওরা যে সব ছেড়ে ভগবানকে ডাকছে। যারা সব ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকে তারা বেশী চিনতে পারে ঈশ্বরকে। আর যারা পাঁচটা কাজ নিয়ে থাকে, তাদের ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসর হয় না তেমন। এইজন্য ত্যাগী দলের সৃষ্টি হয়েছে। তারা wholetime men — সর্বদা এবং সারা জীবনের জন্য ঈশ্বর-ভক্ত।

অফিসের ফেরৎ ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন — ভাটপাড়ার ললিত রায়, 'ভবরাণী' (ভোলা চাটুয্যে), লক্ষ্মণ, বড় অমূল্য প্রভৃতি। মহিমবাবু সাড়ে পাঁচটায় উঠিলেন বিদায় লইয়া। বাইরে দুই একফোঁটা জল পড়িতেছে। শ্রীম তাই ছাতা দিয়া জগবন্ধুকে মহিমবাবুর সঙ্গে পাঠাইলেন, বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতে। মহিমবাবু ঠনঠনের মা-কালীকে দর্শন করিয়া বাড়ি পৌঁছিয়াছেন সিমলা স্ট্রীটে। এখন বেশ বৃষ্টি।

চারতলার ছাদ। এখন সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য দোরগোড়ায়। ভক্তরাও অনেকে আসিয়াছেন। বাইরে সামান্য বৃষ্টি। একটি বয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন, নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, নাম রজনী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকীল; নোয়াখালি বাড়ি। তিনি ঁকামারপুকুর ও ঁজয়রামবাটী দর্শন

করিয়া ফিরিয়াছেন। তিনি কথায় কথায় তুলসী রামায়ণ ও গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। অনর্গল বকিয়া যাইতেছেন। বড় চঞ্চল, ভারি তাড়াতাড়ি কথা কন। শ্রীম যা বলেন, তারই অনুরূপ গীতা ও তুলসী রামায়ণ হইতে বাণী শুনাইতেছেন। কখনও শ্রীম-র হাঁটুতে মৃদু আঘাত করিয়া তাঁহার মনোযোগ ফিরাইয়া আনিতেছেন, কখন আপন হাতেই মৃদু আঘাত করিতেছেন। ভক্তরা অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন; কেহ বা মৃদু হাস্য করিতেছেন। বেশ একটা মজা হইয়াছে। ভক্তটির উকীলের স্বভাব বদলায় নাই।

রজনী — আমি চার যুগেই ভক্ত হয়ে থাকবো। জলের ভূড়ভূড়ি জলে মিশান, এটা আমি বুঝি না, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।

শ্রীম (রজনীর প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, আম খেতে এসেছ আম খাও। কত লক্ষ ডাল, কত কোটি পাতা, এ খবরে কাজ কি! তুমি খালি আম খেয়ে যাও।

রজনী — হাঁ, আম খেতে এসেছ, খালি আম খাও।

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, ও একটি থাক্ আছে, নিত্য ভক্ত — তুমি প্রভু আমি দাস।

রজনী — হাঁ বলেছেন, ও একটি থাক্ আছে নিত্য ভক্তের। এটা আমার ভাল লাগে।

রজনী বড় প্রগলভ। মুখ থেকে কথা কাড়িয়া লইয়া কথা বলে। আজের কথাপ্রসঙ্গে বিঘ্ন উৎপন্ন হওয়ায় ভক্তগণ অতিষ্ঠ হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি বিদায় লইলেন।

এখন রাত্রি পৌনে আটটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরেই বসিয়া আছেন দোরগোড়ায় চেয়ারে দক্ষিণাস্য। নিত্যকার ভক্তগণ কেহ কেহ আসিয়াছেন। বেশ বৃষ্টি হইয়া গেল। এখনও দুইচার ফোঁটা উপরের টিনের ছাদে পড়িতেছে। ঘর অল্প পরিসর। শ্রীম-র সামনে দুইখানা বেঞ্চ পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান। পশ্চিমেরখানায় বসা জগবন্ধু, বড় অমূল্য, ছোট রমেশ, সুখেন্দু ও গদাধর। পূর্বদিকের বেঞ্চেতে পরে আসিয়া বসিলেন ডাক্তার বক্সী তারপর বড় জিতেন। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — আজ দু'জন এসেছিলেন। একজন, স্বামীজীর ছোট ভাই

মহিমবাবু। তিনি এক বছরের বেশী থেকে এলেন কনখলে। তাঁর মুখেও ওদিককার মহাত্মাদের কথা শুনা গেল। তপস্বী অনেক সাধু আছেন ওদিকে। এঁদের কথা শুনলে প্রাণ জুড়ায়। এঁরা সর্বস্ব ছেড়ে ভগবানকে ডাকছেন। তাঁরা আম খাচ্ছেন সর্বদা। এ ব্যবস্থাটি হয়ে আসছে অনন্তকাল থেকে। এক থাক্ লোক সংসার সুখকে কাক-বিষ্ঠার ন্যায় ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মানন্দের সন্ধানে তৎপর। আর এক থাক্ সংসারসুখে মগ্ন। এই দুই থাক্ লোক দুই উল্টোপথে চলছে। সাধুদের পথই পথ। তাই মাঝখানে আর একটা থাকের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বলে ভক্ত। যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে এদের। প্রকৃতিতে আদ্ধেক ভোগ রয়েছে এখনও। তাই তারা মহাত্মাদের মত সব ছাড়তে পারে না। আবার কেবল ভোগীদের সঙ্গেও থাকতে পারে না। এরাই সাধুদের কাছে যায়, সাধুদের সেবা করে। সাধুসঙ্গে ভোগ ক্ষয় হয়। তখন তারা দুহাতে ভগবানকে ধরে যেমন সাধুরা ধরে আছেন। সাধুরা হলো জগতের conscience (বিবেকবুদ্ধি)।

মহিমবাবু নিজেও সাধু, আর ছিলেনও কনখল সেবাশ্রমে সাধুদের সঙ্গে। ওদিকে সর্বদাই আনন্দের প্রবাহ চলছে।

বড় জিতেন — আর একজন কে এসেছিলেন?

শ্রীম — উনি এদিককার লোক — উকীল। নোয়াখালী বাড়ি, নাম রজনীবাবু। অবসর নিয়েছেন। বললেন, বয়সে আমাদের চাইতে দুবছরের ছোট, কিন্তু বেশ শক্ত আছেন।

জগবন্ধু — উকীলরা শক্ত থাকে, কিন্তু বড় মিথ্যা কথা কয়।

শ্রীম — তাইতো প্রেক্‌টিস না করলেই হলো। ‘ল’ পড়া ভাল, জেনে রাখা ভাল। অর্থের জন্য সত্যকে বিসর্জন দেওয়া ভাল না।

জগবন্ধু ‘ল’ পড়িয়াছেন শ্রীম-র প্রেরণায়।

শ্রীম — মহিমবাবুকে ছোকরা সাধুরা কত সেবা করেছে। আমরা বললাম এই যে সেবা তোমরা পেয়েছ, এতে personal credit (ব্যক্তিগত সম্মান) নেই। কত ভগবানের কথা তোমরা শুনিয়েছ ওদের। তাই সেবা করেছে। এ সেবাতে মুক্ত হয়। আমরাও ছিলাম কনখল আশ্রমে। উঃ, কি সেবা করে সাধুরা রুগ্ন নারায়ণের! আশ্রমের

সমস্ত কাজ নিজেরা করে। সেবা না করলে জ্ঞান লাভ হয় না। নিষ্কাম সেবাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বর দর্শন হয়, যেমন আর্শিতে মুখ দেখা যায়। ওরা কত সেবা করছে ঈশ্বরের জন্য। আর (একজনকে দেখাইয়া) এরা সেবা করতে ভয় পায়, কুঁড়েগুলো!

গদাধর আশ্রমের ঠাকুর ও চাকর দুজনেই চলে গেছে, বড় কষ্ট হচ্ছে আশ্রম সেবার। ললিত মহারাজ এসেছিলেন সাহায্যের জন্য। দু'জন ছিল, এ আর একজন (সূর্য ব্রহ্মচারী)। এঁরা এখানে কোনই কাজ করেনা। এদের বললাম যেতে। সূর্য গেল। আর একজন গেল না। বকুনী খেয়ে বুঝি পরের দিন গেল (হাস্য)। রান্নার নামে ভয় পায়। খালি চোখ বুজলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে সেবা চাই। এমন সুযোগ হয় কি? চব্বিশ ঘন্টা সেবা হচ্ছে ওখানে — ঠাকুর সেবা, সাধু সেবা। কত উৎসব, কত পূজা হচ্ছে ওখানে। কত বড় সৌভাগ্য এই সেবা করা।

শ্রীম নীরব ক্ষণকাল। আবার কথাপ্রবাহ চলিয়াছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গুরু কি দোষ দেখেন — তিনি যে অহেতুক কৃপাসিন্ধু! ঠাকুরকে এক একজন কত জ্বালাতন করেছে। দেখেছি, তিনি কারও দোষ ধরেন নাই। ক্রাইষ্ট কি জানতেন না যে জুডাস ইস্‌কেরিয়ট বিশ্বাসঘাকতা করবে। তবুও তিনি তাকে দ্বাদশজন অন্তরঙ্গের একজন করে কাছে রেখেছিলেন। আবার 'কিস্' (চুম্বন) করতে দিছলেন। পরে জুডাস betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করলো। চৈতন্যদেবও ছোট হরিদাসকে জানতেন, তবুও সঙ্গে রেখেছিলেন।

বড় অমূল্য — ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করলেন কেন?

শ্রীম — গুরুর আদেশ শুনে নাই তাই। মানা করেছিলেন মেয়ে মানুষদের সঙ্গে কথা কইতে, মিশতে। বার বার সে আদেশ অমান্য করায় ত্যাগ করলেন পরে লোকশিক্ষার জন্য। চৈতন্যদেবের কি ক্রোধ ছিল, না দ্বেষ। তবুও ছাড়লেন কেন? তা না হলে অন্যেও বিগড়ে যাবে। এঁরা ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙ্গেন। লোকশিক্ষার জন্য এই বাহ্য কঠোরতা দেখিয়েছিলেন।

ডাক্তার বক্সী — এদিকে যে ভক্তের প্রাণান্ত (ত্যাগ করায়)।

শ্রীম — তা তিনি জানেন সব, অন্তর্যামী তিনি। আবার টেনে

নেবেন হয়তো। গুরু কারো দোষ ধরেন না। যখন দেখেন যে ভক্তটা বড় জ্বালাতন করছে, কিছুতেই বাঁক মানছে না তখন খানিকটা সূতো ছেড়ে দেন।

দিনে বেশ গরম গিয়াছে। এখন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতেছে। শ্রীম জগবন্ধুকে ইতিপূর্বে 'কথামৃত' পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গ চলিতেছিল বলিয়া পাঠ এতক্ষণ হয় নাই। তীব্র গরমের পর ঠাণ্ডা পড়ায় জগবন্ধুর তন্দ্রার আবেশ হইয়াছে — হাতে কথামৃত। শ্রীম উহা লক্ষ্য করিয়া রহস্য করিয়া ছোট রমেশকে বলিলেন, 'তুমি পড়। ইনি (জগবন্ধু) আবার দেখছেন উনি (ডাক্তার বক্সী) কতটুকু ঘুমুচ্ছেন (সকলের হাস্য)। ডাক্তার বক্সী বলিয়া উঠিলেন ঐ তন্দ্রাবস্থাতেই জড়িত কণ্ঠে, 'না, আমায় কেউ surpass (অতিক্রম) করতে পারবে না' (সকলের উচ্চ হাস্য)।

রাত্রি দশটা।

৩

আজ রবিবার ১১ই মে, ১৯২৪ খৃঃ। স্কুলবাড়ির ভক্তগণ জগবন্ধু, বিনয়, গদাধর, লক্ষ্মণ, ছোট নলিনী প্রভৃতি শ্রীম-র অনুমতি লইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সকাল থেকে সারাদিন থাকিয়া সাধনভজন করিয়াছেন। অপরাহ্ন পাঁচটায় রামরাজাতলায় শঙ্করমঠে শঙ্করাচার্যের জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম ভক্তদের জন্য নিজেও অপেক্ষা করিতেছেন আর অপর ভক্তদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন দক্ষিণেশ্বর দর্শন ও উৎসবের বিবরণ শুনাইবার জন্য। এখন রাত্রি নয়টা।

একজন ভক্ত সারাদিনের দিনচর্যা শ্রীমকে বলিতেছেন। ভক্তরা শুনিতেছেন। প্রবীণ ভক্ত শুকলাল ও অমৃত কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা বেলা দুটোতে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের প্রসাদ পেয়ে আবার সাড়ে ছয়টায় শঙ্করমঠে খিচুরী আর তরকারী প্রসাদ কি করে পেলেন?' একজন ভক্ত কৌতুক করিয়া উত্তর দিলেন, 'বলেন কি, জানেন না প্রসাদের মহিমাটা কি আশ্চর্য। প্রসাদ যতই খান না কেন, অপ্রাকৃত বস্তু কিনা আপনার স্থান আপনি করে নেয় উদরে —

বিশেষ যদি উত্তম দ্রব্যের ভোগ হয়। এটা একবার try (পরীক্ষা) করে দেখবেন (সকলের হাস্য)।

শ্রীম রহস্য রস কিঞ্চিৎ মার্জিত করিয়া ভক্তি রসে সিঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'ও কি আর আপনি খেয়েছেন। তিনি খাইয়েছেন তবে খেয়েছেন। তিনিই তাঁর ভক্তের জন্য সব সংগ্রহ করে রাখেন। ভক্তরা যাতে আনন্দে থাকতে পারে তিনি সর্বদা তাই করেন। যার যাতে আনন্দ সব তিনি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখেন। ভোজনানন্দও চাই। তাই দেখুন উপবাসের পরই উৎসব। তা না হলে যে কল বিকল হয়ে যাবে। এক স্থান থেকেই এসেছে সবটা আনন্দ — ভোজনানন্দ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মানন্দ। দেহ ধারণ করলে মাঝে মাঝে এদিককার আনন্দও দরকার। নইলে দেহ থাকে না। আবার মনটি একটানা ব্রহ্মরস সহ্য করতে পারে না। এমনি করে তিনি এই কলটি (দেহটি) বানিয়েছেন। গিরিশবাবুর গানটিতে এই কথা আছে। বেশী টান, ছিঁড়ে যাবে। তাই ব্যবস্থা দিয়েছেন — যা কিছু কর সব আমাকে নিবেদন করে কর, তা হলেই আর দোষ হবে না। সমগ্র মনটা ক্রমে যাবে শেষে তাঁতে, তখন সমাধি। এর পূর্বে — 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। যার যা ভাল লাগে কর। কিন্তু সব তাঁকে নিবেদন করে কর — তা'হলে এই সব কাজই উপাসনা হয়ে যায়।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা ৯/২৭)

পরদিন সোমবার, শুক্লাঅষ্টমী তিথি ২৩।৪৭ পল। মর্টন স্কুলের চারতলার সিঁড়ির ঘর। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা।

শ্রীম জোড়াবেঞ্চেতে দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন। ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া শ্রীম-র সম্মুখে ও বামে বেঞ্চেতে বসিয়াছেন। এখন আসিয়াছেন বড় সুধীর, বড় অমূল্য, ছোট জিতেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, সুখেন্দু ও তাঁর সঙ্গী, বলাই ছোট রমেশ, জগবন্ধু প্রভৃতি। কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বলুন তো, আমরা এখন কি করছি?

বড় সুধীর — ঈশ্বর চিন্তা করছি।

শ্রীম (স্বহাস্যে) — না, ও চিন্তা তো আছেই। তারও উপরে চলেছি — আমরা মায়ের মাই খাচ্ছি। মাই মুখে পড়লে তবে শিশু বেঁচে থাকে। অসুখ হলে বলে, দেখ মাই টানছে কিনা। তেমনি আমরাও সর্বদা মাই খাচ্ছি। এই হাওয়া, জল এসবই মাই — বড় মায়ের মাই। সর্বদাই এই মাই খাচ্ছি। যখন হাওয়া নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল তখন ব্যস্ সব শেষ হয়ে গেল (মৃত্যু)।

একজন ভক্ত প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম — বলুন তো জিতেনবাবু আমরা কি করছি? আমরা মার মাই খাচ্ছি — সর্বদা খাচ্ছি।

উপনিষদং ভো ব্রূহি, — ছোট ঋষিরা বলছেন বড় ঋষিদের। কিন্তু এরা জানে না, যা বলছেন বড় ঋষি এ সবই উপনিষদ্।

একটি ভক্ত (স্বগতঃ) — শ্রীম-র এই সব কথাও কি উপনিষদ্ — 'আমরা মায়ের মাই খাচ্ছি'।

একটি ভক্ত তন্দ্রাবিষ্ট। তিনি উঠিয়া গিয়া ছাদে বসিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ওদেশের (পাশ্চাত্যের) বড় বড় লোক কি বলছেন শুনছেন আপনারা? ব্যারিষ্টার জে, চৌধুরী রামমোহন রায় লাইব্রেরীতে মিটিং-এ বলেছিলেন, 'আমার নিজের কানে শোনা, হাক্স্‌লি (Huxley) বলছেন — আমাদের এই বুদ্ধি, এ জ্ঞান দ্বারা যতটা বের হবার হয়েছে। এর বেশী আর কিছু বের হবে না। এরও বেশী কিছু জানতে হলে ইন্ডিয়া (ভারত) থেকে জানতে হবে। ওদেশের ঋষিরা এরও অনেক আগের খবর জানেন।

তা (ব্রহ্মদর্শন) কি এ চোখ দিয়ে হয়, না এ বুদ্ধিতে হয়। ঠাকুর বলতেন, এর (স্থূল দেহের) ভিতর আরও দুটো দেহ আছে — সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ। এর পরে ব্রহ্ম। স্থূলের ভিতর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের ভিতর কারণ, কারণের ভিতর মহাকারণ (ব্রহ্ম) আছেন। কারণ দেহকে ভাগবতী তনু, যোগদেহ বলে। এই কারণ দেহে মহাকারণের দর্শন হয়। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে সর্বদা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার অভ্যাস করতে করতে ঐ ভাগবতীতনুর বিকাশ হয়। সমস্তটা জীবন দিয়ে তাঁর উপাসনা করা চাই; সকল কাজ দিয়ে তাঁর আরাধনা

চাই — 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'। তবে ভাগবতীতনুর জন্ম হয়, আর তাতে ঈশ্বরকে জানা যায়।

ঋষিরা স্থূলের সংবাদ জানতেন — অণু-পরমাণুতে স্থূলের সৃষ্টি। তার চাইতেও সূক্ষ্ম, পরমাণুর সমষ্টি মন-বুদ্ধি। এটাও তাঁদের জানা ছিল। তারপর কারণ-শরীর causal or spiritual body, ঠাকুর একেই ভাগবতী-তনু বলতেন। বলতেন, এ স্থূল শরীরের মত এই কারণ শরীরেরও চোখমুখ সব আছে অতি সূক্ষ্ম। বর্তমান ওয়েষ্ট কেবল স্থূলটার আলোচনা করেছে। তাতেই science of the matter (জড় বিজ্ঞানের) সৃষ্টি হয়েছে। এর পর আছে science of the mind (মনোবিজ্ঞান)। তার ওপর science of the spirit (ব্রহ্মবিজ্ঞান)। তারপর পরমব্রহ্ম, মহাকারণ, ঈশ্বর।

এই কথা কহিতে কহিতে শ্রীম-র একটি ভাবাবেশ হইল। স্বভাবগাম্ভীর্য ভেদ করিয়া শ্রীম মত্ত হইয়া গাহিতে লাগিলেন গানের পর গান। যেন এই তিন শরীরের পরপারে অবস্থিত ব্রহ্মবস্তু মহাকারণকে দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন গানে।

গান। শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে॥
আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘুরায় ধ'রে কলডুরি।
কল বলে আপনি ঘুরি, জানেনা কে ঘুরাতেছে॥
যে কলে জেনেছে তাঁরে কল হতে হবে না তারে।
কোনো কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥

(কথামৃত ৪র্থ ভাগ/১৬শ খন্ড/১ম পরিচ্ছেদ)

গান। সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল ব'লে।।
গুরু দত্ত বীজ লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে
জ্ঞান শুঁড়িতে চোঁয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন-মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মিলে॥

(কথামৃত ৩য় ভাগ/৯ম খন্ড/১ম পরিচ্ছেদ)

ভাবাতিশয্যে শ্রীম আর গাহিতে পারিতেছেন না। তাই মাখনকে বলিলেন আপনি গান। মাখন গাহিতেছেন শ্রীম-র ইঙ্গিতে।

গান। ডুব দেরে মন কালী ব'লে, হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কুলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে॥
রতন-মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে॥

(কথামৃত ২য় ভাগ/১ম খন্ড/২য় পরিচ্ছেদ)

শ্রীম বলিলেন — আর ঐ যে 'ডুব ডুব —'।

মাখন গাহিতেছেন আবার।

গান। ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে, আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অণুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে, চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

(কথামৃত ১ম ভাগ/৩য় খন্ড/৭ম পরিচ্ছেদ)

রাত্রি সাড়ে দশটা। শ্রীম-র নৈশ আহার আসিতেই ভক্তরা উঠিয়া পড়িলেন। শ্রীমও উঠিলেন। সকলে বিদায় লইতেছেন। শ্রীম আহার করিতে যাইবেন। এমনি সময় বড় জিতেনের ছেলে আসিয়া বলিলেন, 'মা এসেছেন দর্শন করতে।' শ্রীম না খাইয়াই নিচে তিনতলায় নামিয়া গেলেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১২ই মে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে বৈশাখ ১৩৩১ সাল।
সোমবার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশ্বাসে অর্ধজীবন্মুক্তি

১

গ্রীষ্মের প্রভাত। মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন ভক্তগণ — বিনয়, জগবন্ধু ও ছোট জিতেন। শ্রীম পাশেই নিজকক্ষে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। চটাং শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। শ্রীম চকিতের মত বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ধ্যান কর, সর্বদা ধ্যান কর, ঠাকুর বলতেন। তা হলে যোগে থাকতে পারে মানুষ সর্বদা। আর যোগে থাকলেই এদিককার জিনিষ কম আসবে মনে।" পুনরায় চকিতের মত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ দৈববাণীর মত এই মহাবাক্য চিন্তায় নিমগ্ন।

আজ ১৩ই মে ১৯২৪ খৃঃ, ৩০শে বৈশাখ ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার, শুক্লা নবমী ২২।৪৭ পল।

এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। খুব প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া বর্ষা দর্শন করিতেছিলেন। জল পড়া বন্ধ হইলে ছাদে আসিয়া চারিদিক দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ পর আবার আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। পাশে একটি যুবক শিক্ষক। মর্টন স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতির কথা হইতেছে শিক্ষকের সঙ্গে। শ্রীম এই স্কুলের রেক্টার। তিনি সম্প্রতি স্কুলে শিক্ষার নবীন পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন। বাংলা ভাষা হইয়াছে শিক্ষার বাহন। ছাত্রদের উপর চাপ না পড়ে তাই শিক্ষকগণকে পাঠ্য বিষয় মুখে মুখে গল্প ও প্রশ্নোত্তর রূপে বলিতে হয়। শিক্ষকের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল কর্ণেন্দ্রিয়ের সহায়তায় এতকাল শিক্ষা চলিত। এখন চক্ষু ইন্দ্রিয় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীম বলেন, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় যে দিন প্রয়োগ করা চলিবে সেই দিনই আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতির জন্ম হইবে।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — আচ্ছা, Questions discussionএ (প্রশ্নপত্রের আলোচনায়) ছেলেদের কিছু উপকার হচ্ছে কি?

শিক্ষক — আজ্ঞে হাঁ। তবে attendence (উপস্থিতি) বড় কম।

শ্রীম — ও যারা ম্যানেজ করে তাদের দোষ। Absence fines (অনুপস্থিতির ফাইন) আদায় করা হয় না বলে এরূপ হচ্ছে। কালকের মধ্যে এটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে।

এই নবীন প্রথায় সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষার সকল প্রশ্ন একসঙ্গে আলোচনার পর ছাত্রদিগকে পুনরায় উহাদের উত্তর লিখিতে হয়। ইহাতে ছাত্রগণ পুস্তক না পড়িয়াই সমস্ত পুস্তকের বিষয়বস্তু অধিগত করিতে পারে সহজে। ইহাতে শিক্ষকের পরিশ্রম যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

একটি ভক্ত — ছোট অমূল্য আমার ডায়েরী পড়তে চান — যখন উনি এখানে উপস্থিত না থাকেন তখনকার রিপোর্ট। পড়তে দিব কি? একবার আপনি বারণ করেছিলেন সকলকে দেখাতে।

শ্রীম — কেমন ডায়েরী, private (ব্যক্তিগত) হলে দিবেন কেন?

ভক্ত — এখানকার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ।

শ্রীম — আচ্ছা, একদিন আমায় দেখাবেন।

মাখন হোড়ের প্রবেশ। সঙ্গে একজন যুবক, বছর বাইশ বয়স। বেশ হাস্যরসিক। ছাদে বসিয়া শ্রীম তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। যুবক অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। এখন তার ইচ্ছা জীবশিবের সেবা করা, নিজে উন্নত হইয়া অপরকে উন্নত করা।

শ্রীম (মাখনের প্রতি) — বেশ তো, একে নিয়ে যান না গদাধর আশ্রমে। সেখানে সেবকের প্রয়োজন। ঠাকুর সেবা, সাধুসেবা করবে। কিছুদিন সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা দেশসেবা করে পরে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা ভাল।

বাহিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। শ্রীম আসিয়া আবার সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। কথা প্রসঙ্গ চলিতেছে।

শ্রীম (জনান্তিকে মাখনের প্রতি) — বিয়ে করবার ইচ্ছা হয় না? বোধহয় হয় একটি বিদুষী পেলে। তাহলে দুজনে মিলে দেশসেবা

করা যাবে (সকলের হাস্য)। (রসিকতা পূর্বক বড় জিতেনের প্রতি) কি বলেন মশায়?

বড় জিতেন — বিয়ে করলে যে ফলবৃদ্ধি হয়ে যায়। তখন তাদের খাওয়াতে পরাতে হয়, পয়সার দরকার। এই পয়সার চেষ্টায় তখন অতল জলে ডুবে যায় সদিচ্ছা।

আবার ছেলেমেয়ের লালনপালন, শিক্ষা। আবার মেয়ের বিয়ে। তাতেই তো শেষ হলো না। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেলেও তার জন্য ভাবনা — আজ এ বিপদ, কাল ও বিপদ। আপনি শুনিয়েছিলেন, প্রহ্লাদ দৈত্যবালকদের উপদেশ দিয়েছিলেন — ভাইসব বিয়ে করো না। বিয়ে করলে এই সব আপদ লেগেই থাকে।

শ্রীম (কল্পিত বিস্ময়ে নয়ন হাস্যে) — বটে! তা হলে তো ভাল নয়।

লোকশিক্ষায় শ্রীম-র এই আর একটি আর্ট — অন্যের মুখ দিয়া উপদেশ দেওয়ান। প্রবীণ ভক্ত জিতেনের মুখ দিয়া শুনাইলেন। বিবাহিত জীবনের বিঘ্নের কথা। সাক্ষাৎ ভাবে নিজে বলিলে যুবক হয়তো মোটেই গ্রহণ করিত না ঐ উপদেশ।

শ্রীম (মাখনের প্রতি) — নিজেকে analyse (বিশ্লেষণ) করতে শিখেছে দেখছি। এটি শিখেছে ঠেকে ঠেকে।

শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণ হারমোনিয়াম্ বাজাইতেছে তিনতলায়। শ্রীম-র মন হরণ করিয়াছে ঐ সুমিষ্ট সুর। অরুণের বয়স বছর ষোল।

শ্রীম নিবিষ্ট হইয়া কিছুক্ষণ শুনিলেন। অন্তেবাসীকে বলিলেন "যান আপনি নিচে গিয়ে ওকে congratulate (উৎসাহ দান ও আনন্দ প্রকাশ) করে আসুন। (সকলের প্রতি) এই মিহি সুর বের করাই হলো ওস্তাদি। এতে মনকে টেনে ভিতরে নিয়ে যায়।

'কথামৃত' পাঠ হইতেছে। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। সন্ধ্যার ধ্যান সমাপ্ত হইয়াছে এইমাত্র।

ছোট রমেশ পড়িতেছেন। তৃতীয় ভাগ ষোড়শ খণ্ড। ঠাকুর রামের বাটিতে শুভাগমন করিয়াছেন। অশ্বিনী দত্ত, নরেন্দ্র, মহিমাচরণ প্রভৃতি আসিয়াছেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ ২৩শে মে।

পাঠক (পড়িতেছেন) শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাকে বলিলেন — সেও

ঐ বলে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলেন। ‘সে’ মানে কেদার চাটুয্যে। তিনিও বলেন ঠাকুর অবতার। তা হলেই হলো ঠাকুর এঁদের দুজনার কথাই মেনে নিয়েছেন। প্রকারান্তরে বলছেন, আমি অবতার। এইসব স্পষ্ট উক্তি করেছেন নিজের সম্বন্ধে নিজে। তবুও বোঝবার যো নাই যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করেন। সমস্ত কর্ম শেষ হলে এটি বোঝা যায়, অথবা এটি বুঝতে পারলেই সকল কর্ম শেষ হয়। স্বামীজী আরাত্রিকে বলেছেন ‘কর্ম-কঠোর’। স্তবে বলেছেন, ‘তেজস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ত তৃষ্ণা’। রজঃ পলায়ন করে তিনি এলে। তাঁকে দর্শন করে অবতার বলে বোঝা, সে কেবল তাঁর ইচ্ছাতে হয়। অন্য পথ নাই।

পাঠ চলিতেছে।

পাঠক পড়িলেন, মহিমাচরণ বলিতেছেন, ভক্তদের এককালে তো নির্বাণ চাই?

শ্রীম — মহিমাচরণের এই মত, নির্বাণ মুক্তি, সাযুজ্য মুক্তি — নুনের পুতুল সমুদ্রে নামলে গলে সমুদ্র হয়ে যায়। এটি অদ্বৈতবাদীদের মত।

মুক্তি আরও চার প্রকারের আছে — সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাষ্টি। এসব মতে নির্বাণ মুক্তি মানে না। ঠাকুর তাই মহিমার কথার উত্তর দিয়ে বললেন, সকলকেই যে নির্বাণ মুক্তি লাভ করতে হবে এমন কিছু না। নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত এও আছে। চিন্ময়শ্যাম চিন্ময়ধাম, চিন্ময় ভক্ত। নিত্য ও লীলা দুইই সত্য, বলছেন ঠাকুর। আরও বলছেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই জীবজগৎ, তিনিই অবতার। যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। নিত্যও সত্য, লীলাও সত্য। স্বরাট বিরাট তিনিই। কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত দিলেন, চন্দ্র থাকলে তারাগণও থাকবে। ভগবান মানলে ভক্তও চাই। তাই নিত্যকৃষ্ণ, নিত্য তাঁর ভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, উত্তরে বরফ গলে না। কোন কোন ভক্ত নিত্য কৃষ্ণ চায়, নিত্য বিষ্ণু চায়। নিজের কথায় বললেন, অত জড় সমাধি, নির্বিকল্প সমাধির পরও, ‘মা’ ‘মা’।

মহিমাচরণ শাস্ত্র বিচার করেন। তাই বলছেন ঠাকুর, সাধনা করা

দরকার, শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। বিদ্যাসাগর মশায়ের নাম করে বললেন, তাঁর অনেক (শাস্ত্র) পড়া আছে কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই! একি আর ওঁকে ছোট করবার জন্য বললেন তা নয়, সর্বোচ্চ আদর্শটি সামনে ধরবার জন্য এই তুলনা করে দেখালেন। ঈশ্বরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ লাভই মানুষ-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাঁতে কি আর মান-অভিমান ঈর্ষা দ্বেষ ছিল, তা নয়। দেখ না, নিজেই আমাদের নিয়ে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁকে কিন্তু বলেছিলেন ঠাকুর, ওখানে যেও, মানিক বের করে দিব। উনি আর গেলেন না যদিও বলেছিলেন যাবেন। গেলে হয়তো এই জন্মেই ঈশ্বর দর্শন হতো।

সাধারণ মানুষ এঁদেরই মনে করে আদর্শ লোক। কেন? না, অত দয়া, পরোপকার, দান, সেবা কার আছে? কিন্তু ঠাকুরের দৃষ্টি আরও ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মে। উহা লাভ না হলে সব মিছে। ব্রহ্মদর্শন সকলের উপর। ব্রহ্মদ্রষ্টা শ্রেষ্ঠ মানুষ।

তাই সাধনার দরকার। তবে ধারণা হয় ঈশ্বরীয় ভাব। ঐ নিয়ে পড়ে থাকলে তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

সাধনার কথায় বললেন — সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরীয় কথা শোনা সহজ সাধন। কামিনীকাঞ্চনে সংসারী লোক মত্ত — একেবারে ডুবে আছে। সাধুসঙ্গ করলে সৎগুরু লাভ হতে পারে। সৎগুরু মানে যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন। তখন difference-টা (পার্থক্য) বোঝা যায়। 'সৎগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে'।

সৎসঙ্গ করলে ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য, এ বোধ হয়। আর তখন বিদ্যামায়ার আশ্রয় লাভ হয়। ধ্যান জপ নাম গুণকীর্তন, তীর্থ ব্রত উপবাস, প্রার্থনা এসব নিয়ে থাকে। এসব বিদ্যামায়ার ঐশ্বর্য।

দেখুন কি ভরসার কথা বলছেন, বিদ্যামায়া যেমন ছাদে উঠবার সিঁড়ির শেষ কয় ধাপ। 'আর এক ধাপ উঠলেই ছাদ' মানে ঈশ্বরলাভ।

শ্রীম আহার করিতে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বলিয়া গেলেন — "এখন যা পড়া হলো আপনারা বসে তা চিন্তা করুন।"

শ্রীম আহার করিয়া আসিয়াছেন। একজন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সব কথা আপনারা চিন্তা করলেন?” ভক্ত বলিলেন, ঠাকুর অবতার। ঠাকুর নিত্য থেকে লীলায় যান আবার লীলা থেকে নিত্যে। নিত্যলীলা দুইই তিনি লন। আবার, কারোও কাছে নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত। লীলাও সত্য। ঈশ্বর লাভ করলেই যথার্থ সুখশান্তি লাভ হয়। উপায় সাধুসঙ্গ ও সাধনা।

শ্রীম বলিলেন, “বা, বেশ তো মনে রেখেছেন উনি সার সার সব কথা। (ভক্তদের প্রতি) এবার আপনারা উঠুন আর রাস্তায় ভাবতে ভাবতে যান — ঠাকুর অবতার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মনের অতীত যিনি তিনিই নররূপে অবতীর্ণ।”

রাত্রি ১০॥ -টা

২

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন, শ্রীম-র অপেক্ষায়। সন্ধ্যা হওয়ায় সকলে ধ্যান করিতেছেন — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, ছোট রমেশ, ‘ব্রুকবণ্ড’ (যতীন), বড় অমূল্য, ছোট নলিনী, লস্কর প্রভৃতি। গতকালের ‘অসহযোগী’ যুবকও আসিয়াছে সঙ্গে আরও একটি নূতন লোক। অমৃত আসিলেন সকলের শেষ।

আজ ১৪ই মে ১৯২৪ খৃঃ, ৩১শে বৈশাখ, সংক্রান্তি ১৩৩১ সাল, বুধবার শুক্লা দশমী ২০/৩৫ পল।

আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্রমা। কয়দিন বৃষ্টির পর আজ আকাশ নির্মল ও মেঘমুক্ত। অসংখ্য তারকা উঠিয়াছে। সব সুন্দর। এই সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়াছে সুশীতল বায়ু। ভক্তগণ মাদুরে বসা। চারিদিকে বাহিরের কিছুই দেখা যাইতেছে না। দেখা যাইতেছে সুবিস্তৃত আকাশ, চন্দ্রমা আর তারাগণ। দারুণ গ্রীষ্মের পর সুশীতল সমীরণ যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে — ‘মধু বাতাঃ ঋতায়তে’।

স্বীয় কক্ষ হইতে শ্রীম এই ভক্তের মজলিসে আসিলেন রাত্রি আটটায়, হাতে ‘ভাগবত’। দক্ষিণাস্য চেয়ারে বসিতে বসিতে আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভক্তদিগকে বলিলেন আনন্দে — “বলুন তো

আমরা এখানে বসে কি করছি? আমরা মা'র মাই খাচ্ছি। শুধু কি গর্ভধারিণীর মাইতেই দুধ আছে? এ ছাড়াও (ভাগবতখানা পাখার ন্যায় আন্দোলন করিয়া) দুধ আছে সর্বত্র। এই হাওয়া এও মায়ের দুধ — জগন্মাতার দুধ। এই হাওয়া সর্বব্যাপী। Per square inch air pressure fourteen pounds (প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে হাওয়ার চাপ চৌদ্দ পাউণ্ড। এই pressure (চাপ) সর্বত্র — উপরে নিচে ও পার্শ্বে। এই হাওয়ার সাহায্যে আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছি, ট্রামের ট্রলীর ন্যায়। ট্রামের ট্রলীটি সংযোগ করে ট্রামের সঙ্গে বিদ্যুতবাহী wire-এর (তারের)। যেই ট্রলী আলগা হয়ে গেল অমনি ট্রাম অচল। এই air pressure (বায়ুর চাপ) বোঝা যায় একটা স্থানে ভেকুয়াম (বায়ু শূন্য) করে নিলে।

আজ শুধু কি মায়ের মাই খাচ্ছি, তাঁর দর্শনও হচ্ছে। একবার চেয়ে দেখুন না আকাশে, কি সুন্দর দর্শন। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী' (গীতা ১০/২১)।

শ্রীম আহার করিতে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে একজন ভক্ত। ভক্তের হাতে কথামৃত দিয়া বলিলেন, পাঠ আরম্ভ করে দিন, নইলে অন্য কথাবার্তা হয়তো হবে। ভক্ত বইখানা আনিয়া বড় অমূল্যকে বলিলেন পড়িতে। চতুর্থ ভাগ, দ্বাত্রিংশৎ খণ্ড পাঠ চলিতেছে। ভক্তগণ নীরবে শুনিতে লাগিলেন। কেহ কিছুক্ষণ পাঠ শুনিয়া তারপর ছাদের উত্তর প্রান্তে 'তপোবনে' গিয়া ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম ফিরিয়া আসিলেন। তখন ত্রয়োত্রিংশ খণ্ড পাঠ চলিতেছে। তিনি মাদুরের উত্তর প্রান্তে বসিলেন দক্ষিণাস্য।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — কি পাঠ হইল এতক্ষণ মুদ্দাটা বলুন।

ভক্ত — ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সব লাভ হয় — জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন আলাপন সব।

শ্রীম — আহা, কি কথাই বললেন। তাঁর এই মহাবাক্য বিশ্বাস হলে অর্ধজীবন্মুক্ত হয়ে যায় মানুষ। বাকীটার জন্য লড়াই করতে থাক এখন তাঁর এই মহাবাক্য আশ্রয় করে। অত সোজা পথ

থাকতেও লোক এতে যাবে না। সংস্কার পথ আগলে বসে আছে।

বিচার প্রথম প্রথম একটু করতে ইচ্ছা হয়। ঠাকুর তাই মা'র কাছে plead (আবেদন) করে বলতেন ভক্তদের জন্য — মা, কি করবে একটু বিচার না করে। মা সাক্ষাৎ বলছেন ঠাকুরের মুখ দিয়ে। একথা ছেড়ে আবার বিচার করা — ঈশ্বর আছে কিনা, এ সবের কি দরকার। এতে মাকে অমান্য করা হচ্ছে তাই অপরাধ হচ্ছে। তা ক্ষমা করবার জন্য ঠাকুর ভক্তদের হয়ে মায়ের কাছে, জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করছেন। আহা কি কৃপা — অহেতুক কৃপা। ব্রহ্মজ্ঞান সেধে দিচ্ছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যুগ-যুগান্তর ধরে যোগীগণ যোগ করছেন। ঠাকুর এক মুহূর্তে তা বিলিয়ে দিচ্ছেন ভক্তদের, অন্তরঙ্গদের।

বিশ্বাসও আবার কেমন, না বালকের বিশ্বাস, সরল বিশ্বাস। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু আছে। বালক ষোল আনা বিশ্বাস করে ওঘরে যায় না। জুজু কি তা জানেও না। এই বিশ্বাসই হলো alternative (উপায়ান্তর), শান্তি ও আনন্দ লাভের। এক নম্বর পথ হলো তাঁর দর্শন লাভ করে কথা কয়ে তাঁর সঙ্গে শান্তি ও আনন্দ লাভ করা। আর তা না পারলে দু নম্বর পথ — গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা। গুরুবাক্যে বালকের ন্যায় বিশ্বাস হয়ে গেলে চৌদ্দ পনর আনা কাজ হয়ে গেল। বাকীটাও ঈশ্বরের কৃপায় হয়ে যাবে — জীবিতাবস্থায় না হলেও মরণের সময় হয়ে যাবে। মা ঠাকরুণ এই প্রার্থনাই করেছেন ভক্তদের জন্য — ঠাকুর, মরণের সময় ছেলেদের দর্শন দিও।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — বিশ্বাসটাও এক মতে বিচার intensified (ঘনীভূত); জন্ম জন্ম বিচার করে তারপর হালে পানি না পেয়ে তখন বিশ্বাস করে গুরুবাক্যে, শাস্ত্রে।

এতো সোজা পথ কিন্তু নেয় কে? তাঁরই অবিদ্যা মায়ার কাজ এটি! যদি নেয় তা হলে যে সংসার থাকে না। তাই 'আমি'টা project (যোগ) করে দিয়েছেন। বিদ্যা মায়ার কৃপায় এই 'আমি'টা তুমি হয়ে যায়। তোমার দাস আমি, ভক্ত আমি, সন্তান আমি হয়। নইলে 'আমি ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' হয়ে যায়।

বিশ্বাস দ্বারা, গুরুবাক্যে বিশ্বাসে ঈশ্বরদর্শন হয়। ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন। এক গরীব বিধবা ছিল। গুরু ক্রোধে তাকে নদীতে ডুবে মরতে বললেন। নদীতে ডুবতে গেছে আর ডোবা হয় না — সারা নদীতে কোমর জল। তখন কাঁদছে গুরুবাক্য রক্ষা হ'ল না বলে। ভগবান তখন দর্শন দেন তাকে। গুরুকেও আবার ঈশ্বরদর্শন করান শিষ্য। বিশ্বাসের এমনি মহিমা।

শ্রীম চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিলেন অনেকক্ষণ। স্বীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য স্মৃতিতে কি মন ডুবিয়া গেল — অহেতুক কৃপাসিন্ধুতে? দীর্ঘ সময় পর ভক্তদের বলিতেছেন, "কি সুন্দর রাতটি আজ, আবার সংক্রান্তি। একবার আমরা এই দিনে ঠাকুরের ওখানে গিছলাম। সেদিন আবার পূর্ণচন্দ্রও ছিল। ঠাকুর খুব আনন্দ করতে লাগলেন; বললেন, বেশ দিনে এসেছো।

উঃ, কত করেন ভগবান ভক্তের জন্য। মানুষ-শরীর নিয়ে পর্যন্ত এসেছেন।

একজন ভক্ত — বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধদেবের জন্ম, নির্বাণ লাভ ও মহানির্বাণ লাভ হয়েছিল।

শ্রীম — হাঁ, তাই হয়তো ঠাকুর বললেন, 'ঐ কথা, বেশ ভাল দিনে এসেছো। আমরা গত বৎসর এই পূর্ণিমাতে বুদ্ধ-বিহারে গিছলাম কলেজ স্কোয়ার। আর কপালিটোলার বুদ্ধ মন্দিরেরও গিছলাম আর একবার।

এইবার ভাগবত পাঠ হইতেছে, একাদশ স্কন্ধ, দ্বাদশ অধ্যায়। সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য। শ্রীম বাহির করিয়া দিয়াছেন। বড় অমূল্য পড়িতেছেন অতি দ্রুত।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — ডাড়ান (দাঁড়ান), একে একে সামলে নি। পড়ুন তো আবার।

পাঠক সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য পড়িতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'জ্ঞানী' এখানে মানে শাস্ত্র-জ্ঞানী। আত্মদ্রষ্টাই ঠিক জ্ঞানী। যিনি আত্মদর্শন করে তাঁর সঙ্গে কথা কন তাঁকে ঠাকুর বলতেন বিজ্ঞানী। আবার বিজ্ঞানী দেখেন তিনিই জীব

জগৎ হয়েছেন। ঠাকুর দেখেছিলেন সব মোমের বাগান, গাছপালা, মালি — দক্ষিণশ্বরের সারা বাগানটিই মোম দিয়া তৈরী — অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়।

তুলাধার ব্যাধ ছিলেন আত্মজ্ঞানী। তাঁর দর্শন করেও প্রারব্ধবশে মাংস কাটছেন আর বিক্রী করছেন বসে বসে। আবার ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিচ্ছেন।

পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (ডাক্তার বক্সীর প্রতি) — এই শুনুন, বলছেন সাধুসঙ্গ গুরুশুশ্রূষা আর নির্জন বাস দ্বারা যা হয়, অত আর কিছুতেই হয় না। তাই দেখছি সব ঠাকুরের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ঠাকুর বলতেন, নিত্য সাধুসঙ্গ দরকার। আর মাঝে মাঝে নির্জন বাস। আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। কর তো সাধুভক্ত সঙ্গ, নয়তো অসঙ্গ।

ঠাকুর এক একবার বলতেন, উপনিষদের কথা কাটবার যো নাই। কেন, না এসব ঋষিদের মুখ থেকে বের হয়েছে কিনা তাই।

ঋষিরা যা সব বলেছেন সব তাঁকে আশ্রয় করে বলেছেন। বেদে একটি কথা আছে 'অতি বাদী' — ঈশ্বরকে ছেড়ে কিছু বলা। ঋষিরা ছিলেন তার বিপরীত।

বড় অমূল্য — পাঠে আছে, জগতের সীমানা সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত, তাহলে ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত হয় কি করে?

শ্রীম — এখানে 'জগৎ' অর্থে এই আমাদের সূর্যমণ্ডল নবগ্রহ বেষ্টিত — পৃথিবী যার মধ্যে একটি গ্রহ। কিন্তু ঐ যে আকাশে নক্ষত্রগুলো দেখছেন, শোনা যায় এর প্রত্যেকটাই এক একটি সূর্য'। আমাদের সূর্যের চাইতেও নাকি বড়। ঐ গুলোর আবার এই সূর্যমণ্ডলের মত Satellites (গ্রহ নক্ষত্র) আছে। এখন কিছু বুঝতে পারলেন কি করে অনন্ত? ঋষিরা দিব্যদৃষ্টিতে এই সব দেখে বহু পূর্বে বলে গেছেন। এখন সায়েন্স এসব কথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।

উঠুন এবার আপনারা, অনেক রাত হয়ে গেল। আর ভাবতে ভাবতে বাড়ি যান। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একটা বাহ্য মানুষ কতটুকু। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। কিন্তু যদি সেই মানুষ নিজের অহংকারটাকে এই

ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরের সঙ্গে যোগ করে দেয়, তাহলে এই নগণ্য তুচ্ছ জীবটিও বিশাল বিরাট হয়ে যায় — নুনের পুতুল সমুদ্র হয়ে যায়।

রাত্রি সাড়ে দশটা।

৩

মর্টন ইনষ্টিটিউশন। চারতলার শ্রীম-র কক্ষ। সকাল সাড়ে ন'টা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। সামনে শ্রীম-র বিছানায় বসিয়া আছেন দুইজন যুবক সাধু — প্রীতি ও ইন্দু। প্রীতি ষ্টুডেন্ট্স্ হোমের সেবক, আর ইন্দুর কর্মস্থল দেওঘর বিদ্যাপীঠ।

স্কুলের প্রাঙ্গণে 'সৎপ্রসঙ্গ সভা' এইমাত্র শেষ হইল। শ্রীম ইহার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতি রবিবার সকালে ইহার অধিবেশন হয়। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সম্মিলন। ধর্ম, নীতিশিক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত আলোচিত হইয়া থাকে এই সভায়। শ্রীম প্রায়ই উপস্থিত থাকেন। আজ শরীর একটু অবসন্ন বলিয়া আসেন নাই। আজ ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, শুক্লা একাদশী ১৭।৮ পল। ১৫ই মে ১৯২৪ খৃঃ।

একটি যুবক শিক্ষকের প্রবেশ। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রীতি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "এঁদের সঙ্গে আলাপ আছে খুব।" শ্রীমও আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ল পড়ার সময় বুঝি?"

সাধুরা মিষ্টিমুখ করিতেছেন। ইন্দুর চক্ষু পরীক্ষার জন্য সুবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি যাইবেন।

মঠে সম্প্রতি 'যাজ্ঞবল্ক্য প্লে' সাধুদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছে। ইন্দু গার্গীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ইহার প্রেরণা দাতা। মর্টন স্কুলের ভক্তগণও অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছেন। দেওঘর ও কাশী আশ্রমেও এই অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

শ্রীম অতি আহ্লাদে বলিলেন, "চৈতন্যদেবের সময়ও এরূপ দেবনাটকের অভিনয় হইয়াছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং জগদম্বার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

সাধুরা বিদায় লইতেছেন, শ্রীম ইন্দুকে বলিলেন, (বিদ্যাপীঠের)

ওসব কাজ খুব responsible (দায়িত্বপূর্ণ) তারজন্য সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হয়। একটি (ছেলে) বুঝি গাছ থেকে পড়ে মারা গেছে। খুব সাবধান।

একজন ভক্ত সাধুদিগকে পাশেই ডাক্তার সুবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি লইয়া গেলেন।

এখন বেলা একটা। ব্রহ্মচারী ভৈরব চৈতন্য আসিয়াছেন বেলুড়মঠ হইতে, সঙ্গে একজন মাদ্রাজী যুবক ভক্ত। যুবক শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীম একজন সেবককে বলিলেন তাঁহাদিগকে ঘরে লইয়া আসিতে। তিনি শুইয়া আছেন শরীর বড় অবসন্ন। ভক্তগণ ঘরে আসিলে শ্রীম উঠিয়া বসিলেন বিছানায়। যুবকটির পরিচয় লইতেছেন আর মাদ্রাজের বিশিষ্ট ভক্ত রামু ও রামানুজের সংবাদ লইতেছেন।

ব্রহ্মচারী স্বামী অভেদানন্দের সহিত কাশ্মীর, লাদাক ও তিব্বত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সেই সব স্থান ও লোকের গল্প করিতেছেন। স্বামী অভেদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য। আবার স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট সহকর্মী আমেরিকায়। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কলিকাতায়।

শ্রীম বলিতেছেন, উনি যদি মঠের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতেন তাহলে বেশ হতো। Suppliment and Compliment (পরিবেশন ও পরিপূরণ) দুইই হতো। এঁর energy (শক্তি) আছে, আর ওঁদের সমাজের needs (প্রয়োজন) জানা আছে। ইনি (ব্রহ্মচারী) যেমন বললেন, তাতে মনে হয় বিলেত ফেরৎ লোক, অনেক follower (শিষ্য) হবে।

ব্রহ্মচারী — মা বেলুড়ে কখন কোথায় ছিলেন? নানা জনে নানা রকম বলেন।

শ্রীম — প্রথম ছিলেন রাজু গোমস্তার বাড়ি। দ্বিতীয় বারে মড়াপোড়ার ঘাটে। তৃতীয়বার নীলাম্বর মুখুয্যের বাড়িতে। এ তিনটে স্থানই বেলুড়ে। চতুর্থ, বাগবাজারে। একটা বড় গুদামবাড়ির উপরের

ঘরে, মন্দিরের কাছে। নিচে গুদাম পাটের গাঁটে পূর্ণ। এরই ভিতর দিয়ে উপরে যাবার রাস্তা ছিল। ফিফথ্, গিরিশ বাবুর বাড়ির সামনে। আর সিক্সথ্, নিবেদিতা যেখানে থাকতেন তার কাছে। তারপর মায়ের বাড়ি (উদ্বোধন) হল।

ব্রহ্মচারী — বরাহনগর মঠে, বা আলমবাজার মঠে থাকতেন না কেন?

শ্রীম (বিস্ময়ে) — পুরুষদের সঙ্গে থাকবেন! তাঁকে কি কেউ দেখতে পেতো? সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃতা।

এইবার দর্শকগণ বিদায় লইবেন। অতি আগ্রহে মাদ্রাজী ভক্তটি বলিতেছেন, "I do not know if I shall be lucky enough to have your Darshana again in my life. So, I am very eager to have your autograph here in my notebook. I will preserve it as a sacred memento" (আমার জীবনে পুনরায় আপনার দর্শন লাভ হবে কি না জানি না। তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই, আপনি দয়া করিয়া আমার এই নোট বুকে আপনার নামটি লিখিয়া দিন। আমি ইহাকে পবিত্র স্মৃতিচিহ্নরূপে সযত্নে রক্ষা করিব।)

শ্রীম নিজের নামটি লিখিয়া দিলেন। তাহারা বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীম চারতলার ছাদে মাদুরের উপর উপবিষ্ট উত্তরাস্য। সম্মুখে মাদুরেই বসা বড় জিতেন, 'হিলিংবাম' (দুর্গাপদ মিত্র) সুখেন্দু, জগবন্ধু, 'ব্রুকবণ্ড' (যতীন) প্রভৃতি। একটু পর আসিলেন ইন্দু মহারাজ ও প্রীতি মহারাজ। তাঁহারা সকালেও আসিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার আলো আসিতেই শ্রীম যুক্ত করে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "নামাজ পড়ে নেওয়া যাক্।" অর্ধঘন্টা ধ্যানান্তে শ্রীম উঠিয়া স্বীয় কক্ষে যাইতেছেন সঙ্গে ডাকিয়া লইলেন অন্তেবাসীকে। ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "সাধু এলে ঘরে কিছু থাকলে খেতে দিতে হয়।" এই বড় নেংরা আম দুটো কেটে ওঁদের দিন। (সুখেন্দুর প্রবেশ) এই যে সুখেন্দুবাবু, এক টুকরা চেকে দেখুন তো মিষ্টি কিনা। সুখেন্দু বলিলেন, "বেশ মিষ্টি"। শ্রীম বলিলেন, ঠাকুর দেবতা, সাধুভক্তকে

উত্তম জিনিষ দিতে হয় — চেকে দেওয়া ভাল। এতে দোষ নাই। নিজের লোভের জন্য খেলে দোষ। এ-তো ভগবানের সেবা। সাধুভক্ত নারায়ণ তুল্য।”

সাধুরা ছাদে বসিয়া আম খাইতেছেন।

শ্রীম-র দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। কতক্ষণ পর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সাধু ও ভক্তদের প্রতি) — রবিবাবুর একটি কবিতা আছে — ‘তারার আত্মহত্যা’। ভাবটি বেশ। উপরে সকলে দেখছে। কি সুন্দর। কিন্তু ভিতরে জ্বলে যাচ্ছে। সূর্যেরও তাই। সাধুদেরও তাই। সাধুদের ভিতরেও সর্বদা জ্বলছে। সর্বদা তারা ব্যাকুল কিসে ভগবানের দর্শন হয়। কিন্তু বাইরে দেখতে সকলের মত হাসছে খেলছে।

একজন ভক্ত (স্বগত) — কি অপূর্ব কৌশল উপদেশ দেবার। মর্যাদা রক্ষা করে সাধুদিগকে আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এতে ভক্তদেরও চৈতন্য হচ্ছে। এ যেন ঢ্যালা দিয়ে ঢ্যালা ভাঙ্গছেন।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (দুর্গাপদর প্রতি) — আপনি শোনেন নাই বুঝি? আজ বের হয়েছে (বসুমতীতে) শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম-মিলন। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে যা বলেছেন ছোটদের অনেকের সঙ্গেও তাই বলেছেন। কিন্তু মানুষ বড্ড curious (উৎসুক) হয়ে থাকে জানতে এঁদের সঙ্গে কি সব কথা হলো। এ যেন ‘জেম্‌সের সেটিং’ (রত্ন বিন্যাস), ‘জেম্‌স’ একটা কাঠের উপর রাখ আর একরকম দেখাবে। গোল্ডেন ফ্রেমের উপর রাখ আর একরকম দেখাবে। আবার black precious stone-এর (দুষ্প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রস্তরের) উপর এদের brilliance (উজ্জ্বলতা) সকলের চাইতে বেশী। বঙ্কিমবাবু কেশব সেন এঁরা এইরূপ।

একই সূর্যের আলো মাটিতে পড়লে একরকম। জলে পড়লে অন্য রকম। গাছের উপর পড়লে একরকম। কিন্তু কাচের উপর সকলের চাইতে উজ্জ্বল হয়।

এঁদের সঙ্গে যা কথা হয়েছে এতে সমাজের খুব উপকার হয়।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — আজ যা বেরিয়েছে ‘বসুমতীতে’ এঁদের শুনিয়ে দিন।

পাঠক পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু শ্রীম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। ক্লেরিওনেটের সুমধুর সুর আসিতেছে পাশের এইচ্ বোসের বাড়ি হইতে। শ্রীম-র মন ঐ সুরমাধুর্যে নিমগ্ন।

শ্রীম (বিমুগ্ধ হইয়া) — আহা, আহা। শুনুন ঐ শ্যামের বংশীধ্বনি, একেও বৃন্দাবন ভাবলে হয়। এই চাঁদ আর এই সুর। আমাদের তারাগুলি এখনও উঠে নাই (সহাস্যে) আর আমাদের এই চাঁদ (সকলের উচ্চহাস্য) হ্যাঁগো আমাদেরই চাঁদ! (জগবন্ধুর প্রতি) ডাড়ান (দাঁড়ান) বাঁশী বাজছে। এখন কি আর পড়া হয়?

শ্রীম একমনে বাঁশীর তান শুনিতেছেন — 'আমার কুটীর রাণী সে যে আমার হৃদয় রাণী।'

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — স্বদেশী গান গাইছে। মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো। 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, মোড় ফিরিয়ে দাও। যাত্রা গান লোকে শোনে আমোদের জন্য। যারা পার্ট নেয় তাদেরও আমোদ। দক্ষিণেশ্বর নাটমন্দিরে হয়েছিল রাত্রে। সকালে ঠাকুরের ঘরে প্রণাম করতে গেলে যে 'বিদ্যা' সেজেছিল তাকে ঠাকুর বলেছিলেন এই কথা — মোড় ফিরিয়ে দাও। তার পার্ট শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, জাগতিক এই সব শক্তিতেই ঈশ্বর দর্শন হয় মনের মোড় ফিরিয়ে দিলে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে পুত্রকন্যার সেবা এতেও ঈশ্বর লাভ হয় — এদের ভিতর ঈশ্বর রয়েছেন তাঁরই সেবা করছি, এই ভেবে করলে। তখন আর মোহবন্ধনের ভয় থাকে না। 'ঠাকুর বাড়ি'র পাশে একটি বছর দুয়েকের ছেলে মারা গেছে। আহা, মায়ের কি কান্না পাথর গলে যায় শুনলে। এই প্রাণঘাতী মোহ যায় যদি তাঁর সেবা ভেবে করে। একেই বলে 'মোড় ফিরিয়ে' দেওয়া। যে বিষে প্রাণ যায়, অভিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে সে বিষ প্রাণ দান করে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — অবতার আসেন এই ব্যাকুলতা শেখাতে। কেউ কেউ বাহ্য মৌখিক আবেগ দেখায় বলে, আহা কি beautiful flower (কি সুন্দর ফুল) তিনি করেছেন! আহা করলেই সব হয়ে গেল আর কি? ত্রৈলোক্য সান্ন্যালকে এক ধমক দিয়েছিলেন ঠাকুর।

ঠাকুর বললেন, মা আমায় দেখিয়ে দিলেন ফুলের এক একটি গাছ যেন ফুলের একটি তোড়া — বিশ্বনাথের সেবায় সমর্পিত। এই কথা শুনে ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল বলে উঠলেন, 'আহা, কি সুন্দর দর্শন'। অমনি ঠাকুর ধমক দিয়ে বললেন, ওগো ও মুখের কথা নয়। মা আমায় ধপ্ করে দেখিয়ে দিলেন চোখের সামনে।

এই যে common parlance-এরও (মৌখিক কথারও) ওপর আর একটা কিছু শেখাতে আসেন অবতার। তিনি এসে বলেন, ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ! আমাদের অতি আপনার জন — আমাদের অন্তরাত্মা। তিনিই দণ্ডদাতা পিতা আবার স্নেহময়ী মাতা। তিনিই সহায়সম্পদ বলভরসা — সর্বস্ব তিনি। তাঁকে আগে জান, তাহলে এই দুঃখময় সংসারে পরমানন্দে থাকবে। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য তাঁকে জানা। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে — শিশুর ন্যায়, তিনি দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ — মানুষের এই তিনটে শরীর। এদের রক্ষার জন্য যা যা দরকার সব ঈশ্বর করে রেখেছেন। এই যে হাওয়াটি দেখছো এ দিয়ে স্থূল শরীর রক্ষা হবে — তাই এটি করে রেখেছেন আগে থেকেই। তেমনি জল, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বর্ষা — সব করে রেখেছেন আমাদের রক্ষার জন্য। আবার মাতৃস্তনে দুধ, শস্য, ফল-ফুল কত কি। তাই তাঁকে বলে প্রাণের প্রাণ। এ সবই মাতৃস্তনের দুগ্ধ। সর্বদা আমরা পান করছি।

ট্রামকারের একটি যোগসূত্র আছে। তার নাম ট্রলি। ইলেকট্রিক তারের সঙ্গে এই ট্রলির যোগ রয়েছে। তবে গাড়ী চলে। গাড়ী চলছে না কেন হলো কি? না, ট্রলি আলগা হয়ে গেছে। ট্রলি আলগা হলে আর গাড়ী চলে না। আমরা তেমনি সর্বদা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি এই যোগসূত্র দ্বারা। হাওয়া জল খাদ্য এই সবই যোগসূত্র।

কলেজ স্কোয়ার, কি বিডন স্কোয়ারে যেমন লেকচার দেয় বাবুরা, অবতার এসেও কি তাই করেন? তা নয়। কিসে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় সেই পথ দেখিয়ে দেন। ব্যাকুল গোটা কতককে ঈশ্বর দর্শন করিয়ে দেন। নিজে সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। 'কি beautiful

flower' (কি সুন্দর ফুল), এ কথা বলতে আসেন না তিনি। তাঁর সব কথা প্রাণের কথা।

অশ্বিনী দত্তের বাবা ছিলেন সাবজজ। রিটায়ার করে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। স্বভাবটি খুব ভাল ছিল। লক্ষণ ভাল দেখলে ঠাকুর কাছে রেখে দিতেন অন্ততঃ তিন দিন। তাঁকেও তিনদিন রেখেছিলেন। একদিন একঘর লোক বসা। উনি অন্য সব কথা বলতে লাগলেন। ঠাকুর অতক্ষণ সমাধিস্থ ছিলেন। ব্যথিত হয়ে এই সব কথা কানে যাওয়া মাত্র জোড় হাত করে বলতে লাগলেন, বাবু, আমার ঈশ্বরের কথা বৈ অন্য কথা ভাল লাগে না!

অবতার এসে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন আমাদের সবগুলি শরীরেরই চালক তিনি। একটা নয় তিনতিনটে শরীরই চালাচ্ছেন তিনি।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন হয়, তেমনি ব্যাকুল ছিলেন ঠাকুর ঈশ্বরের জন্য। একবার নয়, সারাজীবনই এই একই অবস্থা। ডিমস্থেনিস্ যখন কথা বলতেন তখন সকলে বলতো — Let us march against Phillip (চল, সকলে ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি), তাঁর কথায় অন্তরের আবেগ এত। আর, সিসারোর কথা শুনেও লোক বলতো, what a splendid orator — কি অদ্ভুত বাগ্মী! একজনের কথায় মরণ পণ করে শত্রুর সম্মুখীন হচ্ছে। আর একজনের কথা শুনে কেবল হাততালি দিচ্ছে। এ দুইই কি এক? একটা প্রাণের কথা, আর একটা মৌখিক আবেগ মাত্র!

একজনের ছেলে মারা গেছে। সে সময় গিয়ে যদি কেউ বলে, ওগো তোমার ছেলে বড় সুন্দর ছিল। এ কথা কি মা শুনবে? না এতে তার শোক থামবে? শোকার্ত মায়ের মত ছিলেন ঠাকুর, ব্রহ্মে নিমগ্ন সারাটা জীবন।

শ্রীম-র নৈশ ভোজন আসিয়াছে 'ঠাকুর বাড়ি' হইতে। অন্তেবাসী গৃহে প্রবেশ করিয়া আহারের স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। শ্রীম আহার করিতে বসিয়াছেন। ছাদে ভক্ত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সংবাদ পাঠ হইতেছে। অন্তেবাসী ঘর হইতে চুপি দিয়া দেখিলেন পাঠক প্রীতি মহারাজ। পাঠের সময় আসিলেন অমৃত, বলাই, বিনয় ও ছোট

জিতেন। শ্রীম আহার সমাপ্ত করিয়া গিয়া পুনরায় ছাদে বসিলেন। পাঠ শেষ হইল রাত্রি দশটায়।

সাধুভক্তগণ বিদায় লইতেছেন। শ্রীম সকলকে বলিলেন, আপনারা ভাবতে ভাবতে যান বাড়ি ঠাকুরের এই মহাবাক্য — 'জীবের কর্তব্য তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেইজন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।'

এখন রাত্রি দশটা।

পরের দিন সকাল আটটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসা। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হগ মার্কেটে কত মাংসের দোকান। তাতে কত পশু বধ হচ্ছে; এতে কি পাপ হবে এদের?" আজ মেসে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।' শ্রীম উত্তর করিলেন, "পাপ করি নাই বললেই হবে না। একজনের ভিতর যদি পাপ করবার possibility (সম্ভাবনা) থাকে। তবুও পাপ হলো।" কেশব সেন এই কথা বলতেন।

রাত্রির বৈঠক বসিয়াছে ছাদে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সংবাদ' শুনিবার জন্য ভক্তদের খুব ভীড়। নিত্যকার সকলেই আসিয়াছেন। অধিক আসিয়াছেন ষ্টুডেন্টস্ হোমের স্বামী নির্বেদানন্দ, বিদ্যাপীঠের স্বামী সদ্ভাবানন্দ। আর সুরপতি ও সঙ্গী। একজন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সংবাদ পড়িয়া শুনাইলেন প্রথমে। তারপর 'কথামৃতে'র 'দেবী চৌধুরাণী' (কথামৃত ২য় ভাগ দ্বাবিংশ খন্ড) পাঠ হইল। বড় জিতেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ভক্তটি কে, যার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন, তোমার দুই ভাব — স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাও বটে, আবার সেব্য-সেবকেরও ভাব বটে। প্রহ্লাদের মত উঁচু ভাব — জ্ঞানভক্তি একাধারে? শ্রীম মুচকি হাসিয়া উত্তর করিলেন — "ও একজন আছে! অনেকে গোপনে থাকতে চায় কিনা। তাঁর অসাধ্য কি? তাঁর কৃপায় সব হয়। ভক্তদের সাকার আবার নিরাকার দর্শন হয়েছে।"

এই ভক্তটি বুঝি শ্রীম স্বয়ং।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।

১৬ই মে, ১৯২৪ খৃঃ, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, শুক্লা দ্বাদশী।

চতুর্দশ অধ্যায়

সমাধি মানুষের সহজাবস্থা

১

আজ প্রভাতে শ্রীম অন্তেবাসীকে পাঠাইলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শ্রীবলাই চাঁদ মল্লিকের কাছে। ইনি এঁড়েদহর গদাধরের ‘পাটবাড়ির’ অধিকারী। শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রিয় অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন দাস গদাধর। এই পাটবাড়ি তাঁহারই সাধন ও সমাধি পীঠ। কালনার সিদ্ধ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রীভগবান দাস বাবাজীর আদেশে এই স্থান নির্মিত হয়। স্থানটি বেশ নির্জন একেবারে গঙ্গার পূর্ব তটে অবস্থিত। ভারি প্রশান্ত, ভাব উদ্দীপক। যুগপীঠ দক্ষিণেশ্বর মন্দির নিকটে।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই পীঠভূমিতে প্রায়ই আসিতেন। কখনও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণকে। মন্দিরের দরজার উপর শ্রীচৈতন্যসংকীর্তনের একটি বৃহৎ প্রাচীন ছবি আছে। এই ছবি ভক্তদের দর্শন করাইতেন। কখনও তিনি ছবি দেখিয়া ভাবস্থ হইয়া যাইতেন।

শ্রীচৈতন্য ভাবে বিভোর হইয়া নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন নবদ্বীপে সুরধুনী তীরে। গাভীগণ আহার ছাড়িয়া বিমুগ্ধ হইয়া চৈতন্যচন্দ্রকে দর্শন করিতেছে। নৌকার মাঝিগণ হাত গুটাইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। স্নানরতা কুলবধূগণের কলসী ভাসিয়া যাইতেছে — সে দিকে লক্ষ্য নাই। মন নিমগ্ন শ্রীচৈতন্য রূপসাগরে। এক পবিত্র দৈবী-মাদকতায় বিমোহিত সমগ্র প্রকৃতি নরনারী পশুপক্ষী সব।

শ্রীম-র একান্ত ইচ্ছা এই পবিত্র পীঠে গঙ্গাতটে কিছুকাল বাস করেন। অন্তেবাসী মল্লিক মহাশয়কে বলিতেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন “আমি ধন্য হইলাম। মহাপুরুষের আমার

উপর অত কৃপা। আমি তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করতে যাব। আর তাঁর থাকার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিব। আমার কুল ধন্য হল!” বলাইবাবু আনন্দ ও উৎসাহে উন্মত্ত প্রায়।

অপরাহ্ন তিনটা। শনিবারের ভক্তগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভাটপাড়ার ললিত রায়, ‘ভবরাণী’ ও সঙ্গী, লক্ষ্মণ, বসন্ত ও সুশীল আর ‘উপনিষদং ভো ব্রূহি’ ভক্ত ছাদে বসা। শ্রীম নিজ কক্ষ হইতে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন চারটার পর। তিনি ললিতবাবুর হাতে এই মাসের ‘বসুমতী’ দিলেন। ললিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সংবাদ পড়িয়া শুনাইতেছেন।

পাঠক পড়িতেছেন — শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?’ বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন — ‘আজ্ঞে তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।’ শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন — ‘এঃ! তুমি ত বড় ছ্যাঁচরা!’

শ্রীম — এই যে বঙ্কিমবাবুকে হক কথা শুনিয়ে দিলেন এতে কি আর বিদ্বেষ ভাব আছে, তা নয়। তাঁর কল্যাণের জন্য বলেছেন। আর সকলের কল্যাণের জন্য বলেছেন। এঁরা হলেন type of man (নরশ্রেষ্ঠ) এঁদের কথা সকলে শোনে। তাই এঁদের যদি টিপে সিধে করে দেন তখন অপরের মনও ঠিক হয়ে যাবে। জগতের কল্যাণের জন্য মহাপুরুষগণ এক একবার অপ্রিয় সত্যও প্রয়োগ করেন — যেমন ডাক্তাররা ছুরি দিয়ে কাটে। এতে কল্যাণ হয়। বঙ্কিমবাবু যাবার সময় পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে গেলেন।

পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই শুনুন ঠাকুর বলছেন, যে পরোপকার করে সেও ভাল লোক। তার চাইতে ভাল শুদ্ধ-ভক্ত। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু, এ বোধ হলে শুদ্ধ-ভক্ত হয়। সে জেনেছে সংসার অনিত্য, ঈশ্বর সত্য, নিত্য।

বলছেন, এ সংসারে মানুষ এসেছে ভগবান লাভের জন্য। এ ছেড়ে অন্য কাজ করলে দুঃখ বেড়ে যায়, — জন্ম মরণ চক্রে

পড়তে হয় বারবার। 'ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ' (কেনো ২/৫), বেদ বলছেন।

যাদের শেষ জন্ম তারা ঈশ্বরের জন্য পাগল। তাদের কাছে আগে ঈশ্বর পরে সংসার। শুদ্ধ ভক্ত অন্তরে বুঝেছে আগে ঈশ্বর লাভ, পরে সংসারের জ্ঞান, সংসার করা। তারা বিদ্যা মায়ার আশ্রয় নেয়। অপর লোক মনে করে আগে সংসারের জ্ঞান লাভ করতে হবে, পরে ঈশ্বর। এরা অবিদ্যা-মায়ার অধীন। এদের অনেক জন্মে সংসার দুঃখময় বোধ হলে তখন এরা বিদ্যা-মায়ার আশ্রয় নেবে। গীতায় আছে একথা — অশুভ আসুরি যোনিতে তাদের জন্ম হয়। তারপর দৈবী সম্পদ লাভ করে। তখন বুল ডগের মত কামড়ে ধরে বিদ্যা-মায়াকে। বিদ্যামায়া ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। আর অবিদ্যা নিয়ে যায় সংসার ভোগে।

পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই দেখুন, ভালর জন্য যে কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন এর প্রমাণ বঙ্কিমবাবু নিজেই জিজ্ঞাসা করছেন শুদ্ধা ভক্তি হয় কিসে? আর ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন তাঁর কুটীরে পদার্পণ করতে। ঠাকুরের আর যাওয়া হয় নাই — গিরিশবাবু ও আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কিমবাবুর সানকীভাঙ্গার বাসায়।

ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হলে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত হয় — ভক্তিলাভের আর কথা কি! কেমন ব্যাকুল? — যেমন শিশু মা ছাড়া জানে না কিছু, তেমনি ব্যাকুলতা চাই।

আর ব্যাকুলতা হয় সাধুসঙ্গে। সাধুরা সর্বস্ব ছেড়ে তাঁর জন্য ব্যাকুল। তাই নিত্য সাধুসঙ্গ দরকার।

আপনারা ধন্য এই যে সাধুসঙ্গ করছেন, মঠে যাচ্ছেন। এতেই ভক্তি লাভ হয়।

পাঠ সমাপ্ত হইল। 'বসুমতী'খানা শ্রীম-র হাতে। তিনি পাতা উল্টাইতেছেন আর প্রবন্ধের নাম পড়িতেছেন। একটি প্রবন্ধ চৈতন্য-দেবের সম্বন্ধে আছে। বলিতেছেন, এটি readable (পাঠের উপযুক্ত)। শনিবারের ভক্তগণ বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভৃত্য তিনতলা হইতে একটি হ্যারিকেন জ্বালাইয়া লইয়া আসিয়াছে। শ্রীম হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তদের বলিলেন, “আপনারা একটু ধ্যান করুন।” তিনি হ্যারিকেনটি হাতে লইয়া স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঘরে দেয়ালে টাঙ্গান দেবদেবীর ছবি আছে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর ছবি ও অপর মহাপুরুষগণের ছবি রহিয়াছে। শ্রীম সকলকে আলো দেখাইতেছেন। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, “হরি বোল, হরি বোল”। হৃদয়ের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া এই হরিধ্বনি আসিতেছে — কি মধুর! কি শান্তিপূর্ণ! এবার নিজের বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

ছাদে নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইতেছেন। শুকলাল আসিয়াছেন। তাঁহার হাতে মা কালীর সন্দেশ-প্রসাদ প্রচুর। তাঁর সঙ্গে আসিয়াছেন মনোরঞ্জন। বড় জিতেন, ললিত ব্যানার্জী, বিনয়, বলাই, বড় অমূল্য, মণি, ছোট রমেশ, সুখেন্দু, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ মাদুরে বসিয়াছেন।

শ্রীম নিজের ঘর হইতে আসিয়া পুনরায় ছাদে বসিলেন। ভক্তগণ প্রসাদ খাইতেছেন। ললিত রায় প্রসাদ হাতে লইয়াই উঠিয়া পড়িলেন — ভাটপাড়া যাইবেন। এখন প্রায় আটটা।

একটি যুবক আসিয়াছে নূতন। সে মাঝে মাঝে বলিতেছে, ঈশ্বরের কথা কিছু শুনান। শ্রীম তাহার সহিত ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন। শ্রীম-র চোখেমুখে বালকের দুষ্টহাসি। শ্রীম বলিলেন, “আহা, ইনি বড় ভক্তলোক। অবশ্য ভক্তদের জন্য কুঁজোতে জল নিয়ে আসবেন — সকলে প্রসাদ খেয়েছেন।”

যুবক কুঁজো লইয়া জল আনিতে নিচের তলায় গেল। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, “এই এক ক্লাশের লোক — ‘উপনিষদং ভো ব্রূহি’ ক্লাশের। (সকলের প্রতি) ‘উপনিষদং ভো ব্রূহি’ — (অঙ্গুলি দিয়া আকাশ, বায়ু, চন্দ্রমা, তারকা প্রভৃতি ইঙ্গিত করিয়া) আহা, এই তো সব মূর্তিমান উপনিষদ। এই সব দেখলে ঈশ্বরকেই মনে পড়ে। আমরা তাঁর সন্তান — ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ।’ ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য — দুদিনের। জীবনের সকল কাজের ভিতর এই কথাটি স্মরণ রাখা।

এইতো উপনিষদ।”

যুবক জল লইয়া ফিরিয়াছে।

শ্রীম (সস্নেহে যুবকের প্রতি) — এঁরাও সব সাধু, সাদা কাপড় পরা। শুধু কি লাল কাপড় পরলেই সাধু হলো। এঁদের সেবা করলে ভগবানের সেবাই করা হলো। ঠাকুর বলতেন কিনা, ভক্ত ভাগবত ভগবান এক।

ভক্তগণ জলপান করিতেছেন।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — যদি বল সমাধি হয় না কেন? তার উত্তর এই নিশ্বাস বন্ধ হয় না কেন? মানে, যতক্ষণ নিশ্বাস চলছে ততক্ষণ sense world-এর (বাহ্য জগতের) সঙ্গে যোগ আছে। এই নিশ্বাস চলছে বলেই মন বুদ্ধি অহংকার কাজ করছে। নিশ্বাস বন্ধ হলে, নিশ্বাস স্থির হলেই সমাধি। অতীন্দ্রিয়কে দর্শন করলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। নিশ্বাস তো হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ব্যাপার। এই সমাধিই মানুষের normal state (সাধারণ অবস্থা)। তাই মানুষ তখন প্রশান্ত — স্বরূপে অবস্থিত।

শ্রীম মত্ত হইয়া গাহিতে লাগিলেন — ‘কবে সমাধি হবে চরণে’।

বড় অমূল্য — তার জন্যই কি প্রাণায়াম করে — এই নিশ্বাস বন্ধ করবার জন্য?

শ্রীম — হাঁ। প্রাণায়াম হলো artificial process (অস্বাভাবিক অবস্থা)। মনস্থির হয় না। তাই চেষ্টা করে নাক টেপাটেপি কান টেপাটেপি করে যদি কিছু কাজ হয়। এ হলো — putting the cart before the horse (ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতা)। ঠাকুর আরও সোজা পথ দেখিয়ে গেছেন। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে মন আপনিই স্থির হয়ে যায়। এটা হলো natural path (স্বাভাবিক পথ), সহজ পথ।

(ব্যঙ্গ স্বরে বিলম্বিত উচ্চারণ করিয়া) কে—ম—ন ক—রে হ—বে?

বেজী বসে বেশ প্রাণায়াম করছিল। যেই ল্যাজে একটা ইঁট বাঁধা হলো অমনি শুরু হলো যত গণ্ডগোল।

তাই ঠাকুর constructive way point out (সংগঠনাত্মক উপায় নির্দেশ) করে দিয়েছেন। এ পথটি normal (স্বভাবসুন্দর)। প্রাণায়াম টানায়াম, এসব abnormal (স্বভাব-বিরুদ্ধ) পথ। ওতে তো আর সমাধি হবে না শুদ্ধসত্ত্ব না হলে। শুদ্ধসত্ত্ব মানে, যে অবস্থায় মানুষ ঈশ্বর বৈ আর কিছু জানে না। ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে এই কথা বলেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। যেমন ছেলে মায়ের জন্য ব্যাকুল। যেমন জলে চুবিয়ে ধরলে প্রাণ আঁটুপাঁটু করে তেমনি ব্যাকুলতা। সাধুসঙ্গে সাধুসেবায় হয় এই ব্যাকুলতা। সাধুরা সব ছেড়ে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। তাদের কাছে গেলে এই ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হয় সহজে।

শাস্ত্রে আছে এসব নাক টেপাটিপির কথা। কিন্তু ঠাকুর সোজা পথ সহজ পথ সুলভ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সাধুসঙ্গ কর, ক্রমে ঈশ্বরে ভালবাসা আসবে। তখন মন আপনি স্থির হয়ে যাবে। নিজের বাড়িতে এলে সাধারণতঃ মানুষের মন স্থির হয়। তেমনি ভক্তদের মনস্থির ভগবানের নিকটে গেলে। কেন? না, ওটি যে ভক্তদের নিজের বাড়ি। ঈশ্বরই ভক্তদের home (বাড়ি)।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীট দিয়া একটি ব্যাণ্ডপার্টি যাইতেছে দক্ষিণ দিকে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঐ শুনুন বাজনা বাজছে। একজন খালি পোঁ ধরে আছে। একে বুঝি বলে ব্যাগ্‌পাইপ। আর অন্যরা সব নানা রাগ-রাগিণীতে আলাপ করছে। এমনি একটি ভাব, একটি সুর আশ্রয় করে থাকলে অন্য সব ভাব আপনি আসে। ঠাকুর তাই বলতেন, সংসারে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে থাক তাঁর সঙ্গে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এসব ভাব। এর একটা বেছে নিয়ে ঐ সম্পর্ক পাতাতে হয় ঈশ্বরের সঙ্গে। একটি ভাব নিয়ে কামড় খেয়ে পড়ে থাক। বাকী সব তিনি করে দিবেন।

শ্রীম-র হাতে 'বসুমতী'। এই মাসে ইহাতে ঠাকুরের একটি অতি সুন্দর ছবি বাহির হইয়াছে। শ্রীম ভক্তদিগকে উহা দেখাইয়া বলিতেছেন, "বইয়ের লেখা সব মনে থাকে না। এই ছবিটি মনে থাকবে। কেউ বাঁধিয়ে রাখে, বেশ হয়। আমরা সভা সমিতিতে গেলে এক মিনিট

দাঁড়িয়ে সিন্‌টি দেখে আসি। লেকচার মনে থাকে না — সিন্‌টি মনে থাকে। ব্রাহ্মসমাজে গেলেও তাই করি। আর গান হলে শুনি। এই চালাকিটি করে থাকি আমরা। কে শুনে অত সব কথা — Waste of time (সময়ের অপব্যবহার) কেবল।

শ্রীম কিছুকাল নীরব থাকিয়া ভক্তসঙ্গে রঙ্গরস উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীম (প্রচ্ছন্ন হাস্যে) — বাঙ্গাল বড় হিয়াল্‌ (শিয়াল-বুদ্ধিমান) (সহাস্যে) কেউ আছে নাকি বাঙ্গাল?

প্রবীণ ভক্ত শুকলাল — অনেক মশায়।

শ্রীম (কল্পিত বিস্ময়ে) — এখনও বাঙ্গাল বলে অভিমান! না, তারা সহুরে হয়ে গেছে।

শ্রীম (প্রশান্ত গাম্ভীর্যে) — 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং' এইরূপ আছে শঙ্করাচার্য কৃত 'নির্বাণ ষটকম্‌'-এ। ঠাকুর বলে দিছলেন 'চিদানন্দরূপঃ দাসোঽহম্‌ দাসোঽহম্‌'।

'বাঙ্গাল'ও (পূর্ববঙ্গীয়, গ্রাম্য) থাকবে না, 'আমি সহুরে'ও থাকবে না। 'আমি বাঙ্গালী, আমি ইণ্ডিয়ান্‌' এও থাকবে না। 'আমি মানুষ, আমি মন বুদ্ধি দেহবান' — এসব কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু 'দাসোঽহম্‌ দাসোঽহম্‌'। আমি ভগবানের দাস, পুত্র সেবক সন্তান এইমাত্র থাকবে। বেদে তাই বলেছেন ঋষিদের মুখ দিয়ে ভগবান — মানুষ হলো 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। অমৃতের মানে ভগবানের, ব্রহ্মের সন্তান — Children of Immortal Bliss.

ভৃত্য শ্রীম-র রাত্রির আহার লইয়া আসিয়াছে ঠাকুর বাড়ি হইতে। অন্তেবাসী উহা রাখিতে ঘরে গেলেন। শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, "এই সন্দেশ আর তরমুজ ঠাকুরদের ভোগে লাগবে — ঠাকুরবাড়ি পৌঁছাতে হবে।" পুনরায় ছাদে আসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, জীবের সমাধি হলে শরীর একুশ দিন থাকে। আমরা যে বেঁচে আছি, এই তো প্রমাণ যে আমাদের সমাধি হচ্ছে না। এখন আমাদের উপায় কি? আমরা

করি কি? তাই ভগবান মানুষ-শরীর ধারণ করে আসেন, অবতার হয়ে নরলীলা করেন। ভক্তরা এই নরলীলার সঙ্গী হন। পরে যারা আসে তারাও এই নরলীলায় বিশ্বাস করে সেই লীলার অনুকরণ ও অনুসরণ করে। জীবন্ত থেকে, জাগ্রত থেকেও প্রায় সমাধির আনন্দ উপভোগ হয় এতে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত যিনি তিনি এইমাত্র নররূপে এসে দক্ষিণেশ্বরে এই অবতার লীলা করে গেলেন। আমরা ধন্য এই লীলায় সঙ্গী হতে পেরেছিলাম। আপনারাও ধন্য এই দিব্য লীলা-কথা আমাদের মুখে শুনতে পাচ্ছেন, বিশ্বাস করছেন, সেই লীলার অনুসরণ করছেন।

যত রকম দান আছে ভগবানের তার মধ্যে সব চাইতে বড় দান অবতার লীলা। The greatest gift of God to man is this avatar.

অবতার লীলার চিন্তা করা হলো ধ্যানযোগের সহজ পথ। নির্জনে নিরাকার পরব্রহ্ম চিন্তা করলে যে ফল হয়, সেই ফলই লাভ হয় অবতারের সঙ্গে লীলা সহচর হলে। জীবন্ত মানুষ হয়ে এসে ঠিক মানুষের ব্যবহার। এই দিব্য ব্যবহারের কথা বললে, শুনলে কি দেখলে মন সহজে ভগবানে নিবিষ্ট হয় আর তাই আনন্দ লাভ হয় সহজে। জীবিত থেকেও আনন্দ আবার মরণের পরও আনন্দ ভক্তদের।

এই জন্য ভগবানের এতসব অবতারলীলা — রামলীলা, বৃন্দাবনলীলা, খ্রীষ্টলীলা, গৌরলীলা, রামকৃষ্ণলীলা।

যারা অবতারকে দর্শন করে নাই, কিন্তু তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করে তারাও শ্রেষ্ঠ মানুষ — ক্রাইষ্ট এই কথা বলেছিলেন — 'blessed are they that have not seen, and yet have believed!'

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, ‘আমি দেখছি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন — সব তিনি।’ তা যদি হয় তা হলে ইচ্ছে করলে একজন সর্বদা যোগে থাকতে পারে। মানুষের চোখে তো এই সব পড়বে — মানুষ, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা — সমগ্র প্রকৃতি। সেই সঙ্গে যদি মানুষ ভাবতে পারে ঠাকুরের এই মহাবাক্য, বেদবাক্য — ‘মা-ই সব

হয়ে রয়েছেন,’ তাহলে এই সবই ক্রমে ক্রমে মা-ময়, সচ্চিদানন্দময় হয়ে যাবে। এও যোগের সহজ উপায়। ঠাকুরের এই মহাবাক্যও বেদ — revelation।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপদেশই দিয়েছিলেন। চন্দ্র, সূর্য, হিমালয়, গঙ্গা — এই সবই আমি। বড় বড় গুলির নাম উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। যদি এইগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ ঈশ্বর ভাবতে পারে তা হলে সর্বদা যোগে থাকবে। যোগ খুব ভাল — ‘তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন’ (গীতা ৬/৪৬)।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যখন যে বিষয় বলতেন সেটাকেই খুব বড় করে তুলতেন — খুব importance (প্রাধান্য) দিতেন।

শ্রীম (বড় জিতেনকে লক্ষ্য করে) — আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ বকলে কি আর যোগ হবে? (কুক্ষিভেদী গভীর হাস্যে) একজনকে ঠাকুর বলেছিলেন, তোমার ফড়র ফড়র কবে যাচ্ছে? — When are you going to stop? ঠাকুর এক একটি কথা বলে ভক্তদের খুব হাসাতেন — হাস্যরসের যেন বান এনে দিতেন।

বড় জিতেন (অপরাধীর ন্যায়) — মশায়, আজ promise (সঙ্কল্প) করে এসেছিলাম কথা বলবো না বলে; কিন্তু পারলাম না কথা রাখতে।

শ্রীম (সহাস্যে) — The cat is out of the bag (এইবার মনের কথাটি প্রকাশ হয়ে গেল) (সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — চুপ করে থাকা খুব ভাল। তা না হলে রসভঙ্গ হয়ে যায়। পাঁচ মিনিট বসে মা’র দুধ খাওয়া, মনস্থির করা — তা আর হলো না।

বড় জিতেন (অন্তেবাসীকে দেখাইয়া) — এরাও জানে অনেক কথা, কিন্তু কয় না।

শ্রীম — কথা না কওয়া খুব ভাল। চুপ করে বসে থাকাই ভাল। ঠাকুর বলতেন, পাঁচ মিনিট ঈশ্বর চিন্তা করলে changed man (নূতন মানুষ) হয়ে যায়। পাঁচ মিনিট তাঁর চিন্তা করা মানে মায়ের মাই খাওয়া। তাই তিনি ভক্তদের নির্জনে ধ্যান করতে বলতেন। কেন

বলতেন নির্জনে ধ্যান করতে? এর মানে এই — ‘আমি যা বলছি তা তো বুঝতে পারছে না, তাই ধ্যান করুক। নির্জনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে ক্রমে ক্রমে।’

বাজনার বোল মুখস্থ করা খুব সহজ। কিন্তু হাতে আনতে হবে যে! তার জন্য অভ্যাস দরকার। যদি বল, লোকে ঠাট্টা করবে, তাই তিনি শিখিয়ে দিতেন, লোক পোক। যে ভগবানের পথের প্রতিবন্ধক সে ত্যাজ্য — সে তুচ্ছ। পোকার মত।

ধারণা করা বড় শক্ত। ধারণা মানে ধরে রাখা — নিজের জীবনে apply (প্রয়োগ) করার চেষ্টা। মন কি স্থির রাখতে পারে একটা জিনিষে, একটা ভাবে? সর্বদা ঘুরছে। কখনও বিলেত, কখনও আফ্রিকায়, কখনও আমেরিকায় আবার কখনও পরজন্মে, সর্বদা ছুটাছুটি করছে। তাই সময় পায় না। আবার যখন সময় হয় তখনও করে না, অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে।

একজন অন্ধকার ঘরে রয়েছে। এখন ঘর থেকে সে বেরুবে। দরজা খুঁজছে হাত দিয়ে, পাচ্ছে না। ঘুরতে ঘুরতে যখন দরজার কাছে এসেছে তখন বগল চুলকানি উঠেছে। চুলকাতে চুলকাতে আরো সামনে খানিকটা এগিয়ে গেল। দরজা আর পেল না। ঘর থেকে বার আর হতে পারল না।

শ্রীম উঠিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আহার করিবেন। আর বিনয় ও জগবন্ধুর হাতে সন্দেশ ও বড় একটা তরমুজ ঠাকুরবাড়ি পাঠাইলেন, কাল ঠাকুরের ভোগে লাগিবে। জগবন্ধু সামনের মেসে আহার করিয়া ফিরিলেন।

এখন রাত্রি দশটা। শ্রীম আসিয়া আবার ছাদে বসিলেন; আবার কথা হইতেছে। ভক্তরা কেহ কেহ বসিয়া আছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, পাঁচ মিনিট ধ্যান করলেও changed man (উন্নততর মানুষ) হয়ে যায়। পাঁচ মিনিট মায়ের মাই খাওয়া কম কি?

এইচ. বোসের বাড়ি হইতে বাঁশির ধ্বনি আসিতেছে। শ্রীম-র মন ঐ ধ্বনিতে নিমগ্ন। আবার কথাপ্রসঙ্গ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এমনি বাঁশি বাজাতেন শ্রীকৃষ্ণ। এখানে থেকেও বৃন্দাবনের উদ্দীপন মনে করলেই হয়। সেই চাঁদ, সেই বাঁশি আর এমন রাত — ঠিক যেন মধুযামিনী।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন হাত ধরে, যাও উদ্ধব, তুমি ওদের সংবাদ আন গিয়ে। অনেক দিন ওদের সংবাদ নিতে পারি নাই। মথুরায় নানা কাজে লিপ্ত ছিলাম। যাও যাও উদ্ধব এক্ষুণি যাও। শীঘ্র তাদের সংবাদ নিয়ে এসো। আমি যখন রাখাল বালক, বনে বনে গোচারণ করেছি, কোনও ঐশ্বর্য যখন আমার ছিল না তখন তারা প্রাণ দিয়ে আমায় ভালবেসেছে। তাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারবো না।

এখন তিনি King-maker (অপরকে রাজ সিংহাসনে বসান) নিজে কখনও King (রাজা) হন নাই। উগ্রসেনকে করেছেন রাজা। চানুর মুষ্টিক বধ, কংস বধ, শিশুপাল বধ — এইসব কার্যে লিপ্ত ছিলেন — গোপীদের কথা ভুলে গিছলেন। তাই বলছেন, যাও যাও শীঘ্র তাদের সংবাদ নিয়ে এসো।

একজন ভক্তের প্রতি — এই দেখ কর্মকাণ্ড কেমন। সব সময় টেনে নিয়ে যায়। বড় শক্ত পথ কর্মকাণ্ড।

শ্রীম-র মন বৃন্দাবনলীলায় নিমগ্ন — শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরিতেছে। কিছুকাল পর ভক্তদের মনও টানিয়া লইলেন ঐ বনে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শ্রীদাম একটা ফল পেয়েছে বনে। দাঁতে কেটে দেখলো, খুব মিষ্টি। অমনি খানিকটা দিল ঢুকিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখে আর খানিকটা গেল বলরামের মুখে।

ফল খাওয়া, ছুটাছুটি, খেলাধুলা করে বেড়াতো রাখালগণ। সখ্যভাব, প্রেমভাব। শ্রীকৃষ্ণকে চিনেছিল তারা, নিজের মুখ থেকে বের করে শ্রীকৃষ্ণের মুখে ঢেলে দিচ্ছে, কোনও সঙ্কোচ নেই। এই প্রেমলীলা।

শ্রীম-র শ্রীকৃষ্ণচিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণে সঞ্চারিত হইল। শ্রীম বলিতেছেন। সেই প্রেমলীলা করেছিলেন আবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। আমরা ধন্য সেই লীলার সঙ্গী বলে — নিজ চক্ষুতে দেখেছি বলে।

এখনও দেখেছি চোখের সামনে সেই লীলা।

ঐশ্বর্যের নামগন্ধও নেই, একেবারে নেংটা। কাপড়খানা পর্যন্ত রাখবার যো নেই। ঐ অবস্থায় ভক্তরা ছুটে ছুটে যেতো তাঁর কাছে — কলকাতা থেকে হেঁটে হেঁটে, শরীর ঘর্মাক্ত। কি আকর্ষণ! তাইতো তাদের জন্য অত পাগল। না গেলে, নিজে ছুটে আসতেন। ভক্তরা চিনেছিল তাঁকে।

আহা, একটি দিনের কথা বেশ মনে পড়ছে। ঠাকুর টেবিলের উপর হাতখানা রেখে বলছেন, গোপী-প্রেমের এককণাও যদি কেউ পায়, তার হেউ ঢেউ হয়ে যায়।

জেলে মালারা মাছ ধরবে। ক্রাইষ্ট তাদের বলছেন, 'Come ye after me, and I will make you fishers of men!' (St. Matthew 4:19) চলে এসো তোমরা আমার কাছে। আমি তোমাদের দিয়ে মানুষ-মাছ ধরাব।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটি থাক্ ভক্ত আছে। তারা অহৈতুক ভক্তি চায়। এরই নাম শুদ্ধা ভক্তি। এ বৈ কিছুই নেবে না তারা। তাদের সংখ্যা অতি অল্প। They can be counted on one's fingers tips. এদের বলে নিষ্কাম ভক্ত।

অন্য সব ভক্তরা ঐশ্বর্য চায়। এছাড়া তাদের চলে না। ঈশ্বর এদের জন্যও ভাবেন। এরা যা চায় তা দেন। তিনি যে ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন তা কেবল এদের জন্য। এদের বিচারধারা এইরূপ — 'এঁর শিষ্যকে আমেরিকা ইউরোপের লোক মান্য করছে। শিষ্য ওদেশে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে বিমুগ্ধ করেছে। তাহ'লে এঁকে নেওয়া যায়, কি বল?' বেশীর ভাগ লোকের ভাবই এইরূপ।

এ থাকের লোক সাধুভক্তের কাছে এসে বলবে, মশায় বড় বিপদে পড়েছি — মকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়েছি। ধনপ্রাণ সব যায় যায়। দয়া করে মকদ্দমাটি জিতিয়ে দিতে হবে। কিম্বা এসে বলবে আমাদের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী খারাপ হয়ে গেছে। যাতে এর আবার উন্নতি হয়, তা করে দিতে হবে। অথবা বলবে, আহা, ওঁর পায়ের ধূলো আমাদের গৃহে পড়েছিল কিনা, তাই রামের চাকরীটি

হলো, আবার রাম পুত্রমুখ দর্শন করলো। এ ক্লাসের ভক্তই বেশী। এদের বলে সকাম ভক্ত।

এসব ঐশ্বর্য প্রকাশ করলে তবে খুব বড়লোক ভক্ত আসবে। গাড়ীর, মোটরের লাইন বসে যাবে। কাশীতে ভাস্করানন্দের কাছে এরূপ লোক বহু যেতো। রাজারা কেউ হয়তো কম্বল কিনে দিল পাঁচ হাজার টাকার। বললে, গরীবদের বেটে দিন আপনি। বরদার রাজা গাইকয়ার্ড যেতো তাঁর কাছে। বেশীর ভাগ লোকই ঐশ্বর্য চায় তাই তাঁকে ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে হয়।

সকাম ভক্তও ভাল, গীতায় বলেছেন। এরাও উদার। কেন? না তাঁকে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে মানছে তাই। এরা জন্ম জন্ম সকাম ভোগ করে যখন দেখে এতে শাশ্বত সুখশান্তি লাভ হয় না, তখন তারা কেবল ঈশ্বরকেই চায় — ঐশ্বর্য দিলেও নেবে না। কেবল ভক্তি বিশ্বাস, জ্ঞান বিবেকবৈরাগ্য দাও — এই প্রার্থনা করে। সকাম থেকে নিষ্কাম হয়।

ঠাকুরের কাছে যেতো সব নড়েভোলা ভক্ত — টাকা নেই, পয়সা নেই। ভক্তদের খুব হাসাতেন। একদিন ঠাকুর বললেন, ক'খানা গাড়ী এসেছে? লাটু গুনে বললে, উনিশখানা। ঠাকুর হেসে উত্তর করলেন, মোটে এই। তা হলে আর কি হলোরে! অনেক গাড়ী অনেক ঘোড়া অনেক ভক্ত হবে তবে তো!

অপরূপ চরিত্র, বিচিত্র তাঁর আচরণ। একবার ঠাকুর বলরাম বাবুর বাড়ী থেকে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছেন। পিছু পিছু এক-নৌকো স্ত্রীভক্ত যাচ্ছে মা ঠাকরুণের কাছে। তিনি তখন নবতে থাকতেন অসূর্যম্পশ্যা। স্ত্রীভক্তরা মাকে দর্শন করে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করছে। ঠাকুরের তা ভাল লাগছে না। তারপর এলো আর একজন স্ত্রীভক্ত। ঠাকুর তার কাছে appeal (বিনয়) করে বলছেন, 'এই দেখ, এরা সব কি করছে। কিল-বিল করে ঘরে ঢুকছে আর ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম করছে। আমার এসব ভাল লাগে না।' ও গিয়ে বললে ওরা দৌড়ে সব পালাল।

কাঞ্চন টাকা পয়সাকে বললেন কাকবিষ্ঠা। কামিনী-কাঞ্চন দুইই

তাই। একথা শুনে কোন্ লোক যাবে তাঁর কাছে? কামিনীকাঞ্চনই সংসার। এ দুইই ত্যাগ। তবে আর যায় কি করে লোক? তাই তাঁর ভক্ত সব নড়েভোলা। ঠাকুরের ভক্তদের দেখলে চেনা যায়।

তাঁর দেহ যাবার পরই মা চলে গেলেন বৃন্দাবনে। এক বছর ছিলেন বৃন্দাবনে। ফিরে এসে বলরামবাবুর বাড়ি উঠলেন, দেশে যাবেন। কয়দিন পর রওনা হলেন হেঁটেই। এমন পয়সা নেই গাড়ী কি পালকি করে যেতে পারেন। ভক্তরা যে সব নড়েভোলা — worldly parlance-এ (লৌকিক কথায়) যাকে 'ভেগাবণ্ড' (লক্ষ্মীছাড়া) বলে। অকিঞ্চন সব।

কি করে যায় তাঁর কাছে ঐশ্বর্যশালী লোক, যিনি সর্বদা বলছেন, ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য। ঈশ্বর দর্শন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। শরীর ধারণ করলে সুখদুঃখ সর্বদা লেগে থাকে। দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। পাণ্ডবদের দেখ। রাজ্যনাশ, বনবাস, আবার ছেলেগুলি বিনষ্ট হলো। সর্বদা এসব কথা কি ভাল লাগে লোকের? কে যায় শুনতে এসব কথা?

ঠাকুর বলেছিলেন, বনবাসকালে রামলক্ষ্মণ সীতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বনে বনে। রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে; একথা তখনও জানতে পারেন নাই। একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে নদীতে নাইতে গেছেন। ধনুক পুঁতে রেখে গেলেন মাটিতে। ফিরে এসে দেখেন ঐ স্থান রক্তাক্ত। নিচে চেয়ে দেখেন একটা কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু। রাম তখন তার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন আর বললেন, সাপে ধরলে তো খুব চেঁচাও তুমি। এখন চেঁচালে না কেন বাছা? ব্যাঙ উত্তর করলো, সাপে ধরলে, রাম রক্ষা কর, রাম রক্ষা কর, বলে চেঁচাই। এখন সেই রামই যখন মারছেন তখন কি বলে চেঁচাব?

নিচে তিন তলায় মটকো (শ্রীম-র পৌত্র অরুণ) বাঁশি বাজাইতেছে। তাহার সুমিষ্ট স্বর শ্রীম-র মনকে টানিয়া রাখিয়াছে। কিছুক্ষণ শুনিয়া ভক্তদিগকে বলিলেন, "আহা, কত বড় genius (প্রতিভা), শুনে বাজাচ্ছে। কারো কাছে কখনও শিখে নাই। একজন বাজাচ্ছে, শুনে এসে বাড়িতে বসে ঐটা সে বাজাচ্ছে। অপরে হাত টেপাটেপি করে

শেখে। এর এই বিদ্যে সহজাত গুণ। একদিন একস্থানে গেছে কি পিক্‌চার দেখতে। ওখানে কনসার্টে বাঁশীর বাজনা হচ্ছিল। সে বসে বসে ঐটে শুনেই বাড়ি ফিরে এলো। কোনও সিনের উপর নজর নেই। জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, অন্য কিছু দেখলে বা শুনলে যে আমার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বাড়ি ফিরে এলাম। এটি তার গন্ধর্ব প্রতিভা। ছেলেমানুষ হলে কি হয়, এটা জন্মগত সংস্কার।”

বড় জিতেন আবার রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — গৃহস্থের টাকা পয়সা রোজগার ও ব্যবহারের সম্বন্ধে ঠাকুর কি উপদেশ দিতেন?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, টাকা পয়সা রোজগার করতে পার যদি তা দিয়ে দেবসেবা, সাধুভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হয়। কেবল কুটুম্ব সেবার জন্য হলে হয় না।

টাকার দরকার কিসে? না, এতে ডালভাত, পরবার বস্ত্র আর থাকবার আশ্রয়লাভ হয়। তা হলে ভক্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানকে ডাকতে পারবে। রোজগার করে সবটা কিম্বা lion's share (বেশীর ভাগ) পরিবারের জন্য খরচ করে দিলে চলবে না। তিনি একজন ভক্তকে এই কথা বলেছিলেন।

শ্রীম পূর্ব প্রসঙ্গ পুনরায় ধরিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুরের ভক্তরা তাই নড়েভোলা সব। এরা ঈশ্বরকে চায় আগে। এদের জীবন-যাত্রা কোনও রকমে চলে গেলেই হলো।

(সহাস্যে) একদিন ঠাকুর বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। দক্ষিণেশ্বর ফিরে যাবেন। একজন গাড়ী ডাকতে গেছে, বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দ এলেই ভক্তরা বললেন, ঐ আসছে গাড়ী। ঠাকুর শুনে বললেন, ‘দূর্‌র্‌র্; ও ঘোড়া যে ধুপ্ ধুপ্ করে চলছে। আমাদের গাড়ী আসবে ছ্যার্‌রা ছ্যার্‌রা শব্দ করে’ (সকলের উচ্চ হাস্য)।

বিভীষণ হলেন শুদ্ধ-ভক্ত। তাই রাম তাঁকে লংকার রাজা করতে চাইলে প্রথমে রাজী হন নাই। রাম তখন বুঝিয়ে বললেন, তুমি রাজা

হলে বহু লোকের কল্যাণ হবে। তোমার ঐশ্বর্য দেখে তারা আমার পূজা করবে। বলবে, রামের সেবা করে বিভীষণ রাজা হয়েছেন। আমরাও রামকে পূজা করবো। তখন বিভীষণ রাজা হলেন।

বেশীর ভাগ লোকই সকাম। ঈশ্বরের পূজা করে ঐশ্বর্য লাভ হচ্ছে দেখলে তখন তাঁকে ডাকে। তারাও ভাল। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্ত দু'চার জন। তাদের সংখ্যা খুবই কম। ঠাকুর সারাটা জীবন ঐ শুদ্ধা ভক্তি নিয়ে কাটিয়ে দিলেন — ঐশ্বর্যের নামমাত্রও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই — একেবারে উলঙ্গ। কাপড়খানা পর্যন্ত গায়ে রাখবার জো নাই — সর্বদা 'মা, মা' মুখে — যেন মায়ের কোলের শিশু।

রাত্রি এগারটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৭ই মে ১৯২৪ খৃঃ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল।
শনিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী, ৮।৮ পল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

দৈবী আচরণ

১

গ্রীষ্মকাল। সকাল সাতটা। মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ হইতে একটি আহত শালিক পাখী নিচে পড়িয়া গিয়াছে — বৃষ্টির জলের পাইপ দিয়া। শ্রীম নিজ কক্ষে ছিলেন, সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিয়া সব দেখিলেন। পাখীটির দুর্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত। শ্রীম দুঃখিত হইয়া বেয়ারার পীতাম্বরকে ধমক দিলেন — 'কিঁউ তুম্ মুঝে না পুছকে খোলা? (জগবন্ধু ও ছোট জিতেনের প্রতি) মজা মন্দ হয় নাই — বাবুরা সখ করে পাখী মারবে আর আমরা অত সব কাণ্ড করবো।"

পাশের বাড়ি সুগন্ধ তৈল ব্যবসায়ী এইচ্. বোসের। ঐ বাড়ির ছেলেরা বন্দুক দিয়া এই পাখীটিকে আহত করিয়াছে। পাখী উড়িয়া গিয়া পড়িয়াছে মর্টন স্কুলের ছাদে। শ্রীম ইহাকে অতি সযতনে একটি খাঁচায় রাখিয়া দিলেন। এই কয়দিন শাস্ত্রীয় অতিথি সেবার ভাবে অতি শ্রদ্ধার সহিত উহার পরিচর্যা চলিতেছে, ঔষধ, পথ্য ও পানীয় দিয়া। আজ সকালে বেয়ারার খাঁচা খুলিবামাত্র পাখীটি ভয়ে বাহির হইয়া নর্দমার ভিতরে দিয়া নিচে পড়িয়া গিয়াছে। উহাকে আবার আনাইয়া সেবাশুশ্রূষা করিলেও উহা মরিয়া গেল।

আজ ১৮ই মে ১৯২৪ খৃঃ। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, রবিবার পূর্ণিমা ৫৪।৪ পল। চতুর্দশী ২/৩৬ পল।

অপরাহ্ণ চারিটা হইতেই ভক্ত সমাগম হইতেছে। ললিত ভাটপাড়া হইতে আসিয়াছেন। তারপর আসিলেন সুরপতি। তার হাতে একটি বেল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাজাঞ্চি যোগেন পাঠাইয়াছেন শ্রীম-র জন্য। এই বেলটি ঠাকুরের তন্ত্রসাধন পীঠ বেলতলার বিল্ববৃক্ষের

ফল। সামান্য হইলেও অতি পবিত্র ও অমূল্য। তারপর আসিলেন ভৌমিক। অন্তেবাসী সকলকে যত্ন করিয়া বসাইয়াছেন।

এবার আসিলেন স্বামী নির্বেদানন্দ, সঙ্গে কর্পোরেশন স্ট্রীটের একজন শিক্ষক ভক্ত। মনোরঞ্জন, লক্ষ্মণ, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বড় জিতেন, শুকলাল, ছোট রমেশ, ছোট নলিনী, বলাই, মণি প্রভৃতি ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জগবন্ধু এখানেই থাকেন। সকলে ছাদে বসিয়াছেন বেঞ্চেতে, কেহ বা মাদুরে। শ্রীম স্বীয় কক্ষে অর্গলবদ্ধ।

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম আসিয়া মাদুরে বসিয়াছেন পশ্চিমাস্য। তাঁহার সম্মুখে বসা স্বামী নির্বেদানন্দ পূর্বাস্য। শ্রীম সস্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বেয়ারা হ্যারিকেন লইয়া আসিতেই শ্রীম হাততালি দিয়া বলিতেছেন — 'হরিবোল হরিবোল'।

শ্রীম ভক্ত সঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। উপরে আকাশ উজ্জ্বল করিয়া পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে ধরণী নিমজ্জিত। এই সুশীতল কিরণজাল শ্রীম-র মুখমণ্ডলে পড়িয়া এক অলৌকিক পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। সাধু ও ভক্তগণ সকলে ঈশ-ধ্যানে নিমগ্ন শ্রীমকে ঘিরিয়া।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল। কলিকাতাবাসী কেহ কেহ আজ আবার গন্ধেশ্বরী পূজা করিতেছেন। এই পুণ্য দিনেই ভগবান বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ, সিদ্ধিলাভ ও পরিনির্বাণ লাভ করেন। সারা জগৎ জুড়িয়া বৌদ্ধ ভক্তগণ তাই আনন্দোৎসব করিতেছেন আজ।

ধ্যানান্তে সাধুভক্তগণ মিষ্টান্ন ও তরমুজ প্রসাদ পাইতেছেন। শ্রীম-র মন আজ যেন আনন্দ-সমাধিতে নিমগ্ন। তিনি অবিলম্বে মনের খাদ্য কথামৃত পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (স্বামী নির্বেদানন্দের প্রতি) — 'দুধ'তো একটা generic term (মৌলিক শব্দ) সকলেই শোনে। কিন্তু এ থেকে কি শিক্ষা লাভ হয়? ঠাকুর বলতেন, কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আবার কেউ দুধ খেয়েছে — হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। এক দুধ থেকেই এত সব হচ্ছে।

ঠাকুর মাকে বলছেন, আচ্ছা মা, আমি যে ওকে বলে পাঠালাম, 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে', আমি কি অন্যায় করলাম মা? আমি তো দেখ্‌ছি, সবই তুমি — মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার সব তুমি। আমি নাই — সব মা।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলছেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন,' একঘর লোকের সামনে।

একদিন বলছেন, এখানে এসেও মালা বাই? 'এখানে যারা আসবে তাদের একবারে চৈতন্য হয়ে যাবে।' মালা জপ করা কেন? ঈশ্বরের উদ্দীপনের জন্য তো। কিন্তু ঠাকুরের এক একটি কথাতেই উদ্দীপন করে দিচ্ছে। উদ্দীপন মানে দীপ জ্বেলে দেওয়া। তারপর সশরীরে ভগবান সামনে। তাঁর magnetic attraction (চুম্বকবৎ অলৌকিক আকর্ষণ) রয়েছে। অপরে না জানুক, তিনি নিজে জানেন নিজকে — ভগবান এই শরীরে অবতীর্ণ।

তবে জল ঘোলা থাকলে প্রতিবিম্ব পড়ে না। আবার মনটাও সর্বদা নড়ছে। তাই ঠাকুর ভক্তদের বলতেন, নির্জনে ধ্যান কর গিয়ে — পঞ্চবটীতে, কি বেলতলায়। তাহলে আমি যা বলি এসব কথার মানে ধরতে পারবে।

তাই কর্মকাণ্ড বড় কঠিন। তবে যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে, আদেশ দেন কর্ম করতে তা হলে হয়। তখন সে commissioned teacher (প্রত্যাদিষ্ট আচার্য)। তখন আর কোনও গোল নাই। তা না হলে ঐ বঙ্কিমবাবুকে যা বলেছিলেন, তোমার কথা দুদিন শুনবে তারপর যা তা। আদেশ পেলে কর্ম করা যায়।

ঠাকুর একটি ছড়া বলতেন, 'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব, পদো শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।' পদো মানে পদ্মলোচন, an unworthy person (অপদার্থ লোক) শাঁক ফুঁকাতে গ্রামের যত সব লোক এসে হাজির। সকলে ভাবলে, ঐ মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সকলে দেখলে ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতর আধপাগলা পদ্মলোচন শাঁক ফুঁক্‌ছে তখন সকলে ঐ কথা বলতে বলতে চলে গেল। Unworthy person untimely (অনুপযুক্ত লোক অসময়ে) বললে কোন কাজ

ত হয়ই না — উল্টো খারাপ ফল হয়। যেমন বলতেন ঠাকুর, ‘যদি ছিল রোগী বসে বৈদ্দীতে (অনুপযুক্ত) শোয়ালে এসে’। এমনি কাণ্ড!

শিশিরবাবু, অমৃতবাজার পত্রিকার editor (সম্পাদক) ছিলেন। তিনি বেশ একটি হাস্যকর গল্প বলতেন। একজন তপস্বী কঠোর তপস্যা করছে। দেবী তুষ্ট হয়ে দর্শন দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও, বাবা? তপস্বী বললে, মা আমি ভারত উদ্ধার চাই। দেবী উত্তর করলেন, তথাস্তু বৎস। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। চারশ বছর পর ভারত স্বাধীন হবে। ভক্ত আর্তস্বরে উত্তর করলো, সে কি মা, তখন যে আমি থাকবো না (সকলের উচ্চহাস্য)।

‘আমি’-টা থাকা চাই। এটার নাম সংসার, বন্ধন। এই ‘আমি’-টাকে তাঁর পায়ে সমর্পণ করে দিতে পারলেই আনন্দ, মুক্তি। তাই ঠাকুর বলতেন, ‘দাস-আমি’ হয়ে থাক সংসারে। ভগবানের দাস, সন্তান হয়ে থাকা।

ভগবান দর্শন হলে আর ভোগ করতে পারে না সংসার। সকাম হলেও ক্রমে ক্রমে ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হয়ে যায়। দেখ না, ধ্রুব রাজ্য লাভ করল কিন্তু ভোগ করতে স্পৃহা রইল না। পশ্চাৎতাপ হয়েছিল ভগবান রাজ্য-বর দিয়ে অন্তর্ধান হলে। বলেছিলেন, হায় যোগীশ্বরদেরও অলভ্য যে ভগবান, তাঁকে পেয়েও বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমি করলাম কি! ভক্তি না চেয়ে রাজ্য চাইলাম! তবে সর্বদা সৎসঙ্গ লাভের বরও দিয়েছিলেন; তাই রাজ্যশাসন সুদীর্ঘকাল করলেও সংসারে আসক্ত হন নাই।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঈশ্বর দু’ একজনকে করে দেন লোকশিক্ষক। তাঁরা যখন কথা কন তখন জগৎ কাঁপে। দেখ না ক্রাইষ্ট; নিরক্ষর, কিন্তু যখন কথা কইলেন, তখন বড় বড় ডক্টররা স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলাবলি করতে লাগলো, আমরা এমন তেজীয়ান্ বাণী কখনও শুনি নাই! ত্রিশ বছর ধরে নির্বাক — সূত্রধরের কাজ করছেন বাপের সঙ্গে (রান্দা চালার অভিনয় করিয়া) এমনি করে।

জন দি ব্যাপ্‌টিস্টের শিরচ্ছেদ হয়ে গেলে ক্রাইষ্ট বের হলেন প্রচারে; গুরু ছিলেন কিনা জন। মাত্র তিন বছর প্রচার করেছিলেন।

তার জের আজ দু'হাজার বছর চলছে। ভগবানের কথা এমনি তেজীয়ান্, অবতারের কথা।

বছর বার বয়েসের সময়ে বাপমার সঙ্গে জেরুজালেম দর্শনে গিছলেন। তখন একবার মাত্র ঈশ্বরীয় শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। দল থেকে পালিয়ে গিয়ে একা বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন। বালকের কথা শুনে ইহুদী পণ্ডিতগণ অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। আর একবার তিনি মন্দিরে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন তিনি প্রচারে বের হয়েছেন। পণ্ডিতরা তাঁর কথা শুনে বলেছিলেন, 'How came this man, by this wisdom?' 'Is not this the carpenter's son?' (St. Matt.13:54&55) পুরোহিতরা তাঁদের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করলেন কেন ক্রাইষ্টকে ধরে নিয়ে আসে নাই। তারা উত্তর করল, 'Never man spoke like this man.' লোক সব ক্রাইষ্টের পক্ষে ছিল। তাই ধরতে সাহস করে নাই; for he taught them as one having authority.'

সূত্রধর জোসেপের কিশোর পুত্র এক আশ্চর্য বালক। এদিকে নিরক্ষর কিন্তু কি জ্ঞানগর্ভ আর শক্তিমান তাঁর কথা। অমন গম্ভীর হৃদয়ভেদী বাণী আজ পর্যন্ত কারও মুখে কখনও কেহ শুনে নাই — যেন ভগবান তাঁর কণ্ঠে বসে কথা কইছেন।

ঐ একবার মাত্র মুখ খুলেছিলেন; তারপর একেবারে নীরব। ত্রিশ বছর লুকিয়ে রইলেন। এসব দৈবী লীলা মানুষ কি করে বুঝবে!

অমন যে উচ্চকোটি ভক্ত পিটার, যাকে লক্ষ্য করে বলতেন, আমার ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করবো এই শ্রদ্ধাশৈলের উপর 'and upon this rock, I will build my church....' (St. Matt. 16:18) সময়ান্তরে এই মহাপুরুষকেই বলেছিলেন, দূর হও শয়তান্ আমার সমুখ থেকে — 'Get thee behind me Satan'.

ভগবান যাদের কণ্ঠে বসে কথা কন, যাঁরা তাঁর আদেশ পায়, তাঁদের কথা এইরূপ শক্তিমান। বজ্রের মত কঠোর আবার কুসুমের মত কোমল এই মহাপুরুষদের স্বভাব। নীতির কাছে বজ্রকঠোর, অন্য সময় করুণাময় মহাপুরুষগণ।

পিটার মানা করেছিলেন কিনা 'আমি ঈশ্বরের সন্তান', একথা বলতে। স্ক্রাইবস্ আর ফেরিসিস্‌রা (ধর্মযাজকগণ) আপত্তি করেছিলেন বলে। ক্রাইষ্ট মোটেই তোয়াক্কা করেন নাই। তিনি সত্য কথা বলবেনই। এতে যা হয় হোক্।

দীক্ষার পর চল্লিশ দিন wilderness-এ (বনে) ছিলেন ক্রাইষ্ট। তখনই সব প্ল্যান ঠিক হয়ে গিছলো 'ফাদারের' (ঈশ্বরের) সঙ্গে। 'ফাদারের' আদেশেই এই কথা বলে প্রচার করতেন — I am the son of the Man — আমি ঈশ্বরের সন্তান। 'ফাদারের' আর একটা আদেশ ছিল — জগতের কল্যাণের জন্য যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হবে। এ দুটি আদেশই অম্লান বদনে পালন করেছিলেন। ঈশ্বরের আদেশ পেলে এইরূপ প্রচণ্ড শক্তি লাভ হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, মা (জ্ঞানের) রাশ ঠেলে দেন। এর দৃষ্টান্ত দিয়ে একদিন বললেন, রাজেন্দ্র মিত্তিরের বাড়ি যাব। অনেক বড় বড় লোক আসবে সেখানে। তাই ভাবলাম গোটা কয়েক বাছা বাছা কথা মনে করে নিয়ে যাওয়া যাক, তাই বলবো সেখানে। ওমা, যেই গেছি অমনি সব ভুলে গেলাম (সকলের হাস্য)! এমনি এই দৈবী ব্যাপার!

একদিন একজনকে ঠাকুর বললেন, একটু ডুব দিতে হয়, কেবল উপরে উপরে ভাসলে হয় না। বহুমূল্য মাণিক অতল জলে থাকে। ডুবুরি ডুব দিয়ে তবে ঐসব তোলে। 'ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।' ঐ লোকটি বিডন স্কোয়ারে লেকচার দিত। এরা মনে করে লেকচার দিলেই সব হয়ে গেল। ঠাকুর তাকে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, মশায়ের ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত আছে নিশ্চয়? লোকটি উত্তর করলো — আজ্ঞে হাঁ, একটু একটু আছে। ঠাকুর আবার হেসে বললেন, তা আমি দেখলেই বুঝতে পারি (সকলের হাস্য)।

পাদ্রিরা যে এত লেকচার দেয় আর বলে, এ কর ও কর, এখন তাদের এই কথা শুনছে কে? ফাউন্টেইন (হৃদয়) থেকে যে বের হচ্ছে না ও সব কথা। ওদিক একেবারে শূন্য। শুধু কথায় চিড়া ভিজে

না। খালি লেকচার শুনছে কে? জীবন দিয়ে দেখাও যা বলছো, তবে লোকে শুনবে। ব্রাহ্ম সমাজেও ঐরূপ — খালি লেকচার।

ঠাকুর বলেছিলেন, একবার নন্দন বাগানে ব্রাহ্ম সমাজে গেছি। দেখছি বেদীতে যে বসেছে সে কি লিখে এনেছে। এক একবার ওটা দেখছে আর (চক্ষু ডান ও বামে সঞ্চালন করিয়া) এমন এমন করে বলছে। এ কথার কি প্রভাব হবে শ্রোতার উপর!

ঠাকুর বলেছিলেন, তিন রকম ঋষি আছে — ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষি। ব্রহ্মর্ষি শুকদেব, দেবর্ষি নারদ আর রাজর্ষি জনক। ব্রহ্মর্ষির কাছে বইটই নাই, সবই মুখে।

বিন্দে ঝি ঠাকুরের কথায় বেশ বলেছিল, না বাবা, সবই তাঁর মুখে। আমরা তখন বরানগর থেকে এ বাগান ও বাগান বেড়িয়ে বেড়িয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেছি। দেখি একঘর লোক বসা ঠাকুরের কাছে। তারপর সব ঘুরে ফিরে এসে দেখি কেউ নাই। এই আধঘন্টার মধ্যে এইসব হয়ে গেল। বিন্দে ঝি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করলুম, হাঁ গা সাধুজী এখানে আছেন? তিনি বুঝি অনেক বইটই পড়েন? তখন ঐ ভাব ছিল কিনা, বই না পড়লে জ্ঞান হয় না। ব্রাহ্ম সমাজের লেকচার শোনার খুব ঝোঁক ছিল। ওখান থেকেই এই ভাব পেয়েছিলাম। বিন্দে তখন ঐ কথা বলেছিল, না বাবা, সবই তাঁর মুখে। আহা, কি পাকা কথা!

ব্রাহ্ম সমাজে লেকচার শুনতুম আর ভাবতুম যেন ঈশ্বর বহু দূরে আর কত উচ্চে। ওমা, ঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখি তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইছেন বিড় বিড় করে। মনে হচ্ছে যেন ঈশ্বর আমার হাতের কাছে। লেকচার আর দর্শনে এত তফাৎ।

Wonderful man (অলৌকিক পুরুষ)। আলাদিন আর ওয়াণ্ডারফুল ল্যাম্পের গল্পে আছে, কাকা বলছে ঐ সুরঙ্গ দিয়ে গিয়ে ল্যাম্পটা আনতে হবে। ওমা, ওখানে গিয়ে দেখে গাছে গাছে মণি-মুক্তা অজস্র ফলে আছে। কোচরে করে যত পারে নিয়ে এলো কত আর আনা যায়! তেমনি ঐশ্বর্য ঠাকুরের। কত আর নেবে একজন লোক! ‘কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।’

বাগানে বেড়াইতে গিয়া শ্রীম লাভ করিলেন দুর্লভ বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে। — তারই কি আভাস পূর্বোক্ত বাণীসমূহ?

শ্রীম (স্বামী নির্বেদানন্দের প্রতি) — আহা, কি সব ভাব ঢুকিয়ে দিছলেন ঠাকুর। নরেন্দ্র আমাদের ওপাড়ার (ঠাকুর) বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। বলছেন, ঈশ্বরই যখন সারবস্তু তিনি যেমন বলেছেন, তখন তাঁর দর্শন না হলে প্রয়োপবেশন করাই উচিত। রাখাল বলেছিলেন, সব ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমে কোনও বাগানে গিয়ে তাঁর সাধন ভজনে ডুবে যাই।

(সহাস্যে) নরেন্দ্র তখন fresh from the Brahma Samaj (টাট্‌কা ব্রাহ্ম সমাজের ফেরৎ) তাই ঠাকুরকে বললেন, এ সব ঈশ্বরীয় দর্শনাদি hallucination; মনের ভ্রম। ব্রাহ্ম সমাজে শুনেছেন। আরও শুনেছেন, বেশী ঈশ্বরকে ডাকলে বেহেড্ হয়ে যাবে। এ সব কথা ওখানে খুব হতো কিনা। এইসব কথা শুনে ঠাকুর ভাবিত হয়ে উঠলেন। নরেন্দ্রের কথায় তাঁর খুব বিশ্বাস। শিশুর স্বভাব। শিশু যেমন সব কথা মাকে জিজ্ঞেস করেন তেমনি ঠাকুর জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা এ সব কি তা হলে 'মনের বাতিক'। মা হেসে উত্তর করলেন, সে কি করে হয় বাবা? আমি যে তোমার মুখে কথা কইচি। আর তুমি যা দর্শন করছো সব যে মিলে যাচ্ছে আমার কথার সঙ্গে আর বাস্তবের সঙ্গে।

ঠাকুর বলেছিলেন, একদিন চাঁদনীতে দাঁড়িয়ে আছি আর তক্ষুণি জগদম্বা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কি দেখিয়ে দিলেন? — না জগদম্বাই মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছেন। আর দেখালেন এ রূপও (ঠাকুর রূপও) তিনি স্বয়ং।

নিজের কর্মত্যাগ কি করে হয়েছিল, তাও ঠাকুর একদিন বলেছিলেন — বেলপাতা ছিঁড়তে গিয়ে একটু আঁশ উঠেছে দেখে আর ছিঁড়তে পারলাম না — দেখছি যেন রক্ত বেরোচ্ছে। আর একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখলাম এক একটি ফুলের গাছ এক একটি তোড়া — বিরাট শিবের উপর স্থাপিত। এই দেখে ফুল আর তোলা হল না।

২

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। আকাশ আলো করিয়া চাঁদ উঠিয়াছে। শ্রীম-র মন প্রফুল্ল। তিনি বুদ্ধ বিহারে ভগবান বুদ্ধদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইবেন। তাই জগবন্ধু, বিনয়, ছোট নলিনী, শুকলাল প্রভৃতিকে আগে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি ডাক্তার বক্সীর সঙ্গে মোটরে যাইবেন। ভক্তরা বেনেটোলায় বিরাট গন্ধেশ্বরী মূর্তি দর্শন করিয়া যাইতেছেন — যেন দুর্গা প্রতিমা।

কলেজ স্কোয়ার বুদ্ধ বিহার। ফুটপাথে ভক্তরা অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীম কিছুক্ষণ পরে মোটরে আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে স্বামী নির্বেদানন্দ ও ডাক্তার বক্সী।

শ্রীম দ্বিতলে উঠিবেন। গুর্খা দারোয়ান লোহার কুঞ্চিত দরজা খুলিয়া দিল। শ্রীম-র পায়ে চটিজুতা। তন্ময় ভাব। উপরে উঠিতেছেন। ভক্তদের কথায় জুতা নিচে নামিয়া রাখিয়া গেলেন।

দ্বিতলের পূর্ব দেয়ালের কাছে মধ্যস্থলে একটি সুন্দর বেদী। ইহার মধ্যে ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ (relics)। আজ উহা অতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে পুত্রপুষ্পে। আর প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী — বেদীর পার্শ্বে অনেকগুলি মোমবাতি জ্বলিতেছে।

শ্রীম বেদীমূলে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন সঙ্গীগণসহ। তারপর দেয়ালে অঙ্কিত বুদ্ধলীলার চিত্রাবলী দর্শন করিতেছেন আর ডাক্তার বক্সী লীলার বিবরণ পড়িয়া শুনাইতেছেন। বুদ্ধজননী মায়াদেবীর গর্ভে শ্বেতহস্তী প্রবেশ করিতেছে ও বুদ্ধ গৃহত্যাগ করিতেছেন, বোধিদ্রুম তলে বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন, নির্বাণ লাভ। প্রথম প্রচার, পরিনির্বাণ প্রভৃতির চিত্রাবলী। প্রথম প্রচারের ছবি দেখিয়া শ্রীম আনন্দে বলিতেছেন, “আহা, কি শান্ত ভাব।” পরিনির্বাণ দেখিয়া বলিলেন, “আনন্দকে বলেছিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে গাড়ীর চাকা ভেঙ্গে গেলে তাকে টেনে নিলে যে অবস্থা হয় এখন আমার সে অবস্থা।”

দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালের সবগুলি ছবি দেখিয়া শ্রীম পুনরায় বেদীর নিকট আসিলেন। বেদী স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া বেদীমূলে বসিয়া দুই মিনিট ধ্যান করিলেন। তারপর নিচে নামিয়া আসিলেন।

নিচের তলায় হলে বক্তৃতা হয়। তাহার দেয়ালে লীলাচিত্র। দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরের সব ছবি দেখিয়া বাহির হইতেছেন। উত্তরের দেয়ালে বাহিরে যাইবার ডানহাতে বুদ্ধের আটটি উপদেশ প্রস্তরে লিখিত — প্রাণী হিংসা করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না, চুরি করিও না, পরস্ত্রীকে মায়ের মত দেখিবে ইত্যাদি। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, "নিন্, এগুলি মুখস্থ করে নিন্। আমরা পরে শুনবো।" অন্তেবাসী ও স্বামী নির্বেদানন্দ উপদেশগুলি পড়িতেছেন। ছোট রমেশ সম্মুখে দাঁড়ান। শ্রীম তাহাকে বলিলেন, "মুখস্থ করে ন্যাও তুমিও।"

বিহারের নিচে ফুটপাথে শ্রীম দণ্ডায়মান। শ্রীম-র চারদিকে সাধু ভক্তগণ — স্বামী নির্বেদানন্দ, সঙ্গী মাস্টার, সুরপতি, ডাক্তার, বিনয়, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ছোট জিতেন, সুখেন্দু, ছোট রমেশ, জগবন্ধু প্রভৃতি। প্রথম তিনজন বিদায় লইলেন। শ্রীম ভক্তসঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রি প্রায় দশটা। শহরের কর্মকোলাহল অনেক কমিয়া গিয়াছে। স্কোয়ারে খুব অল্পলোক। গ্রীষ্মকাল। পূর্ণচন্দ্রের কিরণ জলে পড়িয়া চকমক করিতেছে। সেই আভা আবার জলের চারিদিকের পুষ্প বিতানে প্রতিফলিত। সুন্দর পুষ্প আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

পূর্বতীরের মধ্য ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া শ্রীম উত্তর দিকে চলিতেছেন তারপর পশ্চিমে। শেষপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া চোখে ইঙ্গিত করিয়া হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ দেখাইয়া বলিলেন, "এখানে আর ওখানে পড়াশোনা করতুম।" জগবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়, হিন্দু স্কুলে?" শ্রীম উত্তর করিলেন, "না। হিন্দু স্কুলের দুটো ঘরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ার আর সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস বসতো। এই বিল্ডিং হয় যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। প্রায়ই এখানে (গোলদীঘিতে) আসা হতো।"

এখানে মঠের একটি ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলেন, মহাপুরুষের দীক্ষিত। ভক্তের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে পুনরায় পূর্বদিকে চলিতেছেন। শ্রীম-র ডান হাতে জলাশয়। তাহার তীরে মাঝে মাঝে পুষ্প বিতান। তাহাতে নানা প্রকার সিজন ফ্লাউয়ার। শ্রীম চলিতেছেন

আর উৎসুকতার সহিত দেখিতেছেন ঐ পুষ্পরাজি। তার মাঝে মাঝে ঘাসের ক্ষুদ্র লন্। তাহাতে কেহ শুইয়া আছে, কেহ বসিয়া। শ্রীম উহা দেখিতেছেন আনন্দোৎফুল্ল লোচনে। বলিতেছেন, "Youthful light jollity (যৌবনের তরল আনন্দোচ্ছ্বাস)। এসবও দেখতে হয় তবে balance (চিত্তের সমতা) ঠিক থাকে। নয়তো একঘেয়ে হয়ে যায়। মালা বাদ দিবার যো নাই। বেলের মালা বাদ দিলে ওজনে কম পড়বে — চলবে কেন?"

শ্রীম এইবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন — পূর্বতীরের উত্তরার্ধাংশের মধ্যস্থলে। শ্রীম-র সম্মুখে জলাশয়, তারপর সিনেটের বারান্দার অতিকায় পিলারসমূহ। আর পশ্চাতে 'থিওজফিকেল হল' ও 'বুদ্ধবিহার' — শিরোপরি উজ্জ্বল চন্দ্রমা। তিনি যেন কি স্মরণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "হাঁ, মনে পড়েছে। একবার মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালী ছাত্র আর সাহেব ছাত্রদের মারামারি হয়। বাঙালিরা একশ আর ওরা পঞ্চাশ ষাট জন। বাঙালি ছেলেরা দৌড়ে পালাচ্ছে — ওপারে বিদ্যেসাগর মশায়ের ষ্টেচুর কাছে। তখন আমি এসে এর মধ্যে পড়েছি। এখন কি করা যায় ভেবে, খুব ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে চলছি। ওরা আমায় আর কিছু বললে না এই দেখে।"

শ্রীম দক্ষিণদিকে চলিতেছেন পূর্ব তীর দিয়া। ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন — বড় ফটক পেছনে, সম্মুখে জলাশয়। ভক্তদিগকে বলিতেছেন, "দেখুন, তিনি কেমন সব করে দিয়েছেন জীবনধারণের জন্য — জল, হাওয়া, যা যা দরকার সব।"

শ্রীম আনন্দে ভরপুর। শিশু যেমন নূতন জিনিস পেলে আনন্দে নৃত্য করে শ্রীমরও অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতেছে। পুরাতন সব যেন আবার নূতনভাবে দেখিতেছেন। শ্রীম-র বয়স একাত্তর। কিন্তু তিনি যেন যৌবনানন্দে মগ্ন।

আনন্দে শ্রীম দক্ষিণদিকে চলিতেছেন, ভক্তদের বলিতেছেন, "দেখুন দেখুন, কি সুন্দর ফুল" (ডেইজী)। দক্ষিণের ফুরফুরে হাওয়া প্রবাহিত। আর একটু চলিয়াছেন। তারপর দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "একটা কথা মনে পড়েছে। একদিন এখানে বসে আছি সকালে। আমার

সামনে পাখীরা স্নান করছে। তখন কলেজে পড়ি। দেখে ভাবছি, আহা, তাঁর কত ভাবনা দেখ। পাখীরা স্নান করবে তার জন্য আগে থেকেই এখানে জল রাখা হয়েছে।”

গোলদিঘির দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত শ্রীম। বাম হাতে লতাবিতান দেখিয়া বলিলেন “এটি কি?” ভক্তরা বলিলেন, এটা মালীদের বাসস্থান — লতায় মণ্ডিত কুঞ্জ।

পূর্ব তীর দিয়াই ফিরিয়া বড় ফটক দিয়া বাহিরে আসিয়া বুদ্ধ-বিহারের সম্মুখে আবার দাঁড়াইলেন। ভক্তদিগকে রওনা করাইয়া দিয়া তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন। জগবন্ধু, বিনয় ও ছোট নলিনী মির্জাপুর ষ্ট্রীট দিয়া ৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে মর্টন স্কুলে ফিরিলেন। সুখেন্দু গেলেন বড়বাজার। আর মনোরঞ্জন ও শুকলাল গেলেন বেলেঘাটা। রাত্রি এখন এগারটা। সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকরে মহানগরী নিমজ্জিত। এই দিনে বুদ্ধদেবের জন্ম, নির্বাণ ও মহানির্বাণ লাভ হয়।

৩

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। এখন সকাল ন'টা। শ্রীম স্নান করিয়াছেন। কাপড়াখানা ছাদের মধ্যস্থলে চেয়ারের উপর মেলিয়া দিতেছেন পূর্বাস্য আর বলিতেছেন, “রোদ যে লাগছে না।” আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এক একবার সূর্য দেখা যাইতেছে এক একবার মেঘাবৃত। মণি মান্না, ছোট রমেশ ও জগবন্ধু জলের ট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

অপরাহ্ন তিনটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলের লম্বা বারান্দার পূর্বপ্রান্তে বসিয়া আছেন চেয়ারে। শ্রীম-র পেছনে দরজা, তার পরে নিচে এইচ্. বোসের বাড়ির বাগান। বোস মশায়ের ছেলে শৈলেনকে ডাকাইয়া আনিয়াছেন — বয়স বছর চৌদ্দ। তাহাকে শাসন করিতেছেন।

শ্রীম (কল্পিত ক্রোধে) — তুমি নাকি পাখী মার, কেন মার? বল আর মারবে না।

শৈলেন — certainly (নিশ্চয়) মারবো না, এ কথা বলতে

পারি না।

শ্রীম (পার্শ্ববর্তী শিক্ষকের প্রতি) — আমাদের এই স্কুলে পড়ে?

শিক্ষক — আজ্ঞে হাঁ। থার্ড ক্লাশ 'বি' সেকসানে পড়ে।

শ্রীম (চক্ষু উপরে তুলিয়া গর্জন করিয়া) — আবার পান চিবুচ্ছে! ফেল পান!

শৈলেন (নম্রভাবে) — সার্, ওদিন আমি মারি নাই। আমার মামার ছেলে মেরেছিল।

শ্রীম (তীব্র স্বরে) — তুমি মারবে না, বল।

শৈলেন (পকেটে হাত রাখিয়া) — I will try my best (আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো)।

শ্রীম — আচ্ছা যাও; (শৈলেন চলিয়া গেলে শিক্ষকের প্রতি) attitude (ভাব) বড় ভাল নয়।

ঐ বাড়ির ছেলেরা বন্দুক দিয়া পাখীদের আহত করে। কয়েকদিন ঐ আহত পাখী মর্টনের ছাদে আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীম তাহাদিগকে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। শ্রীম-র ভাবনা, ইহা দেখিয়া পাড়ার সব ছেলেরা নিষ্ঠুর হইয়া যাইবে। তাই এই ঘটনার পর ব্রাহ্মভক্ত প্রিন্সিপাল এস. রায়কে দিয়া বাড়ির গৃহিণীকে বলাইয়াছিলেন।

এখন চারিটা। যোগেন আসিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশ। ইনি ঁদক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাজাঞ্চি। শ্রীম-র কথায় এই সেবাকার্য পাইয়াছেন। তাই মাঝে মাঝে আসিয়া সুখদুঃখের কথা বলেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। যোগেন শ্রীম-র ডান হাতে বেঞ্চেতে বসা দক্ষিণাস্য। সামনে অপর বেঞ্চেতে বসা অন্তেবাসী। কালীবাড়ির লোকদের সম্বন্ধে নানা কথা কহিতেছেন। এইবার একজন ভক্তের কথা হইতেছে।

যোগেন (শ্রীম-র প্রতি) — সে চোখ বুজে কথামৃত পাঠ শোনে। কেহ কিছু বললে বলে, কেন মাষ্টার মশায় করেন না? দ্বিজপদর সঙ্গে 'লিগ' (জোট)। ঠাকুরের ঘরের চাবি দ্বিজপদর কাছে দিয়ে যায়। ঠাকুরের ঘরে রাত্রে অন্য লোকও রাখে। ধর্ম-লেকচার দেয়।

শ্রীম (ব্যস্ত হইয়া) — বড়ই মুস্কিলের ব্যাপার দেখছি। কখন কখন হেঙ্গাম্ বাঁধায়। আমাদের নাম করে সব করছে। কোনদিন কোন

ফেসাদে ফেলবে। এদিকে আবার সাধুসেবা করে না কুঁড়েমিতে। রামলাল দাদার অসুখে এতো খবর দিলেন, আর আমরাও যেতে বললাম, তা কিছুতেই গেল না। বলে, আমার অসুখ করেছে। আর এখান থেকে ওখান থেকে আনিয়ে খাচ্ছে। গদাধর আশ্রমে লোক নাই। ললিত মহারাজ যেতে বললেন, তাও গেল না। আপনারা এতো সব বলে বলে এখন সর্বনাশ করেছেন। ধর্ম কথা কয়ে খাওয়া, ছিঃ! দয়া করে খেতে দেয় তবে খাওয়া যায়।

যোগেন — খোকাকে (যোগেনের পুত্রকে) বলে, অক্ষয়বাবুকে তামাক সেজে দাও।

শ্রীম — কেন, তিনি নিজে পারেন না?

যোগেন — সে কি তা করে? — না। আবার রাঁধবার কথা হলে বলে, তোমরা রাঁধ। তোমাদের রাঁধা খাব।

শ্রীম চিন্তিত, পাছে তাঁর নামে কলঙ্ক হয়।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — আপনি কিরণবাবুকে (রিসিবারকে) বলবেন, আবার রামলাল দাদাকে, ও আমাদের কেউ নয়! আমরা কিছু জানি না। আমরা বলেও দিই নাই ওখানে থাকতে। আমাদের কাছে বলেও যায় নাই ওখানে! এখানে কিছুদিন কাজ করতো। তারপর যায় ডাক্তারবাবুর (কার্তিক বক্সীর) বাড়িতে। ওখানে একজন substitute (অন্যলোক) রেখে চলে গেছে।

যোগেন কিরণবাবু ও রামলাল দাদাকে এই কথা বলিতে সঙ্কোচ করিতেছেন।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — আমাদের নাম করে বলবেন — আমরা বলে দিয়েছি।

যোগেন — আমি আগে তার ভাল বলেছি। এখন —

শ্রীম — বেশ তো, এমন করে বলবেন — আগে ঐরূপ জানতুম্। এখন তিনি এই বললেন। তারপর যদি থাকতে দেয়, দিক। আমরা কিছু জানি না।

যোগেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিচালক, একজন ব্রহ্মচারী ও কোন সাধুর সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করিয়াছেন। সাধুনিন্দা শ্রীম-র

অসহনীয়। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (তীব্র স্বরে যোগেনের প্রতি) — ওঁদের কি স্বার্থ। আপনি বললেই আপনার কথা নেবো? ওঁরা যে কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা সহ্য করে ঐ কাজটি (কিরণ দত্তকে রিসিবার নিযুক্ত) করেছেন, তাতো আপনি জানেন না। কেন করেছেন? না, যাতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িটি বজায় থাকে। কত বড় কাজে হাত দিয়েছেন। সাধুরা বক্‌লেও চুপ করে থাকতে হয়।

যোগেন (অনুতপ্ত স্বরে) — আমি অন্যায় করেছি না জেনে, আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রীম (প্রসন্নভাবে) — আমাদের কাছে মাঝে মাঝে এলে তবে ধাত ঠিক থাকবে। (স্মিত হাস্যে) দেখেন নাই বেহালার কান মলে মলে ঠিক করে, বেসুরো হয়ে গেলে। হাঁ, মাঝে মাঝে এলে তবে ধাত ঠিক থাকবে।

আর আপনি কিরণবাবু ও রামলাল দাদাকে বলবেন যা বলে দিলাম। তাঁদের বলার পর কালই একখানা পোষ্টকার্ড লিখে জানাবেন।

যোগেন — আজ্ঞে হাঁ। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে। অনুমতি হলে বলি।

শ্রীম — হাঁ, বলুন।

যোগেন — কালীবাড়ির পূজারী ও কর্মচারীরা দেখতে পাচ্ছি পয়সা, প্রসাদ ও দ্রব্যাদির অপব্যবহার ও অপহরণ করে। আমার কি করা উচিত?

শ্রীম — আপনি কিরণবাবুকে জানিয়ে দিলেই হলো। বলবেন, মশায় কর্মচারীরা এই সব করে। তিনি জানলেই হলো — আপনার দায়িত্ব গেল। আপনি যাবেন না এতে। তা হলে মেরে ফেলবে।

প্রণামান্তে যোগেনের প্রস্থান।

এখন অপরাহ্ন ছয়টা। বলাই মল্লিক আসিয়াছেন। ইনি এঁড়েদহের গদাধরের পাটবাড়ির মালিক। দিন কয়েক হয় শ্রীম অন্তেবাসীকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। বলাই মল্লিক প্রণাম করিলে অন্তেবাসী শ্রীম-র সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

তারপর আসিলেন বালিয়াটির জমিদার হরিবিলাস, একটি ওড়িয়া ভক্ত ও বড় অমূল্য। শ্রীম সকলকে লইয়া চারতলার ছাদে গিয়া মাদুরে বসিলেন। এইবার কথোপকথন হইতেছে।

বলাই মল্লিক — আপনি কৃপা করে পাটবাড়িতে চলুন। ওখানে একটা ঘর আপনাকে দিয়ে দিব বরাবরের জন্য। যখন খুশী গিয়ে থাকবেন। ঐ বাড়ি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। ওখানে নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য দাস গদাধর তপস্যা করতেন। ওখানেই দেহ যায়। ওখানেই তাঁর সমাধি।

শ্রীম — এইসব বাড়িঘর কে করেছেন?

বলাই — আমাদের পূর্বপুরুষ। অম্বিকা কালনার ভগবানদাস বাবাজীর আদেশে এইসব হয়েছে। আমি শুনেছি, আমার জন্ম হওয়ার পর আমাকে ভগবানের পায়ে দান করে দিয়েছিলেন বাড়ির লোক।

শ্রীম (বিস্ময়ে) — ও! আপনাকে dedicate (ঈশ্বরে সমর্পণ) করে দিয়েছিলেন বাপ মা। তাই আপনি এরূপ। ইহুদীদের ছিল এই প্রথা। ক্রাইষ্টকে জেহোবার মন্দিরে নিয়ে গিয়ে dedicate (ঈশ্বরে সমর্পণ) করেছিলেন জোসেফ ও মেরী।

আপনাদের ঠাকুরবাড়িটি খুব স্থান। একে গঙ্গা-তীর তার উপর আবার মহাপুরুষের পীঠস্থান। তারও উপর আবার ঠাকুরের যাওয়া-আসা ছিল। দরজার উপরে যে চৈতন্য সংকীর্তনের ছবিটি আছে ওটি দেখতে যেতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে একদিন ঐটি দেখাতে নিয়ে গিছলেন। অমন স্থান আর হয় না! পাশেই বলতে গেলে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি — বর্তমান জগতের মহাপীঠ। ভগবান অবতীর্ণ হয়ে ভক্ত সঙ্গে ত্রিশ বছর ধরে নরলীলা করেছেন ওখানে। আপনি ঐ ঠাকুরবাড়িটির উপর নজর রাখবেন।

তবে একটু ঐশ্বর্য আছে। তা না হলে আবার আজকাল চলে না।

বলাই — অনেক সময় মনে হয় উত্তর দিকে একটি পর্ণ কুটীর করে থাকি। এত সব টেবিল চেয়ার ফারনিচার ভাল লাগে না।

শ্রীম (আনন্দে) — এই দেখুন, ওসব ভাল লাগে না! ঠাকুর

বলেছিলেন একটি অতি গুহ্য কথা। আপনারা ভক্ত লোক তাই বলতে দোষ নেই। এসব কথা যার তার কাছে বলা যায় না। বলেছিলেন, নির্জনে গোপনে ন্যাংটা হয়ে তাঁকে ডাকবে। অর্থাৎ পৃথিবীর কিছুই নেবে না।

যতক্ষণ নিশ্বাস ততক্ষণ sense world-এর (বাহ্য জগতের) সঙ্গে contact (সম্বন্ধ)। সেইজন্য চোখ বুজে ধ্যান করা। চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কিন্তু চোখ বুজলে এদিককার কিছুই দেখা যায় না।

ঈশাণ মুখুয্যে গঙ্গার ধারে ঘর করেছিলেন পুরশ্চরণ করবেন বলে। শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, একি গো হীন-বুদ্ধির কথা! ঈশ্বরকে ডাকবে তাও আবার লোক জানতে পারবে। সাইনবোর্ড মেরে ডাকা। শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঈশ্বরকে ডাকতে হয় নির্জনে গোপনে।

বলাই, হরিবিলাস প্রভৃতি প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

এখন রাত্রি প্রায় আটটা। শুকলাল, বড় জিতেন, বিনয়, জগবন্ধু, বড় অমূল্য, ছোট রমেশ, রমণী, গদাধর, ছোট জিতেন, ভৌমিক প্রভৃতি বসিয়া আছেন। সকলেই মাদুরে বসা, শ্রীমও মাদুরে বসা। একটু পরই বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অমলানন্দ আসিলেন। তাঁহার সহিত মঠের কথা হইতেছে। মঠে গো সেবার জন্য এক নৌকা খড় কেনা হইয়াছে। মঠে নূতন কূপ খনন করা হইয়াছে, এইসব কথা। আবার বৃন্দাবন সেবাশ্রমের একজন সন্ন্যাসী (মনসা) সর্পাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন এই কথাও হইল। রাত্রি অধিক হওয়ায় সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন কিছুকাল একাকী। তারপর, জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেন, ও গদাধরকে ডাকিয়া আনাইলেন।

একজন ব্রহ্মচারী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কিছুকাল ধরিয়া বাস করিতেছেন। কয়েকজন ভক্ত তাহার নামে শ্রীম-র নিকট নালিশ করিয়াছেন। শ্রীম তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — অকৃতজ্ঞ লোক ভাল না। যোগেন

বাবুরা তোমার কত উপকার করেছেন। তোমার তাঁকে কিছু বলা সাজে না।

ব্রহ্মচারী — ওখানে দশজনে খায়। ওঁরা দান করেন। আমিও, খাই।

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — কে তোমায় আলাপ করিয়ে দিলে? উনিই কর্তাদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করে দিয়েছেন। এখন তোমার মুখে একথা বলা ভাল না। অকৃতজ্ঞের মুখ দর্শন করতে নেই, ঠাকুর বলেছিলেন।

মর্টন স্কুল কলিকাতা।
১৯শে মে ১৯২৪ খৃঃ, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল।
ত্রসোমবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ ৫০।৪০ পল।

ষোড়শ অধ্যায়

সদ্ গুরু লাভ হলে নিশ্চিন্ত

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বৈঠকখানা। শ্রীম চারিতলা হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। কীটদষ্ট 'কথামৃতে'র কতকগুলি ফরমা অন্তেবাসীকে দিয়া বলিলেন, "ভালগুলি বেছে আলাদা করতে হবে।" এখন সকাল সাতটা। গ্রীষ্মকাল। আজ ২৫শে মে, ১৯২৪ খৃঃ, বাংলা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল। রবিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি ২০।৪৮ পল।

শ্রীম স্নানাদি সমাপন করিয়া দ্বিতলের গৃহে প্রবেশ করিলেন। দক্ষিণ দিকের পূর্ব দরজার কাছে বেঞ্চেতে বসিয়াছেন উত্তরাস্য। গৃহে বিনয়, লক্ষ্মণ, জগবন্ধু ও মণি মান্না রহিয়াছেন। মণি বিখ্যাত ইতিহাস লেখক কৈলাশ মান্নার পুত্র। সম্প্রতি বিপদে পড়িয়াছেন। অর্থাভাবজনিত দুশ্চিন্তায় তাহার মাথার গোলমাল হইয়াছে। তিনি মর্টন স্কুলে আশ্রয় লইয়াছেন। স্কুল এখন গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ।

শ্রীম অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন নিজের জীবন-চরিত — লক্ষ্য মণি মান্না।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আমার এক একবার কর্ম যেত আর তখন চক্ষে সরষে ফুল দেখতুম। বিয়ে করলে এই মুস্কিল। যারা বিয়ে করে নাই তাদের এই সব হেঙ্গাম পোয়াতে হয় না। ঠাকুরের তখন অসুখ। আমি তখনও বিদ্যাসাগর মশায়ের শ্যামবাজার স্কুলের হেড মাস্টার। তাঁর অসুখের জন্য সর্বদা কাশীপুর যাতায়াত করতে হতো। তাই স্কুলের কাজ তেমন দেখতে পারি নাই। তাতে result (ফল) একটু অন্য রকম হয়। বিদ্যাসাগর মশায় আমাকে বললেন, এবার ওখানে বেশী আনাগোনা করেছ তাই ফল তেমন ভাল হয় নাই। এই কথা শুনে তাঁকে একটা খুব কড়া চিঠি দি। তারপর

কেরমে (ক্রমে) resign (পদত্যাগ) করলাম।

চাকরী যখন গেল তখন একদিন তিন ঘন্টা অর্ধ উন্মাদের মত পায়চারী করেছি। ঠাকুরবাড়ির দোতলার রাস্তার উপরের বারান্দায়। ভাবনা ছেলেদের খাওয়াব কি? অবশ্য বেশীদিন বসে থাকতে হলো না। পনর দিনের মধ্যেই অন্য একটা কাজ হয়ে গেল। হিন্দু স্কুলের একজন টীচার leave-এ (ছুটিতে) ছিলেন। হেড মাষ্টার আমায় ডেকে ঐ কাজটা দিলেন। আর বললেন, তোমার এ পোষ্ট permanent (স্থায়ী) হতে পারে।

তবুও মনে দারুণ উৎকণ্ঠা। আর একদিন ঐরূপ আনমনা হয়ে ঐ বারান্দায়-ই ক্ষুধিতা সিংহিনীর ন্যায় দ্রুত পদক্ষেপে যেন দৌড়াচ্ছি। তখন নিচ থেকে একজন নাম ধরে ডাক দিলে। গিয়ে দেখি জুড়িগাড়ী নিয়ে একজন এসেছে। তার হাতে একখানা চিঠি। পড়ে দেখি, সুরেন বাড়ুয্যে মশায় অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন এই গাড়ীতেই যেতে। তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, আমি শুনলাম আপনি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তাই আমাদের এখানে কাজ করুন। সেই থেকে রিপন কলেজে লেগে গেলাম। কয়েক বছর ছিলাম ওখানে। কিন্তু হিন্দু স্কুলে resignation (পদত্যাগ পত্র) দিতে ভুলে গেলাম। হেড মাস্টার লোক পাঠিয়ে বললেন একটা formal resignation (লিখিত পদত্যাগ পত্র) দাও।

এমনতর চার পাঁচবার হয়েছে। 'অন্ন চিন্তা চমৎকারা কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।' এক একবার চাকরী ছেড়েছি আর দারুণ চিন্তায় পড়েছি। এমনি কাণ্ড!

ঠাকুর তাই একটি ভক্তকে বলেছিলেন, এই রইল তোমার মেটো ঘরটি। শাক ভাত রেঁধে খাবে আর সারাদিন হরিনাম করবে। ঘরটি কিন্তু নিজের হওয়া চাই। শাকভাতের জায়গায় না হয় ডাল ভাত হলো। তা হলেই যথেষ্ট। শুধু ভাতই কটা লোক খেতে পাচ্ছে। তাই মা ঠাকরুণ কামারপুকুরের ঐ ঘরটি বরাবর রেখে দিছলেন।

ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। ছেলেদের স্কুলে পাঠাতেন পায়ে হাঁটিয়ে। বই এক হাতে

আর ছাতা এক হাতে। একটি লোক সঙ্গে যেতো পৌঁছে দিতে। পাঁচখানা গাড়ী ঘরে। কিন্তু ছেলেদের তা চড়তে দিবেন না। হেঁটে চলতে শিখুক। কেন? না ছেলেবেলায় অভ্যাস করলে পরেও ঐরূপ করতে পারবে প্রয়োজন হলে।

চাল বাড়াতে নেই। চালটি ঠিক রেখে দিতে হয়। বিদ্যাসাগর মশায়ের এই মত ছিল। তিনি নিজের চালটি ঠিক রেখেছিলেন বরাবর। তালতলার চটি আর ধুতি চাদর। এটি ছাড়েন নাই। আহার সরল আর ঘরবাড়ি সাদাসিধে। অত টাকা রোজগার করতেন কিন্তু নিজের প্রয়োজন অতি সরল ও সামান্য। মোটা ভাত মোটা কাপড় এই নীতিটি চিরজীবন পালন করেছেন। কিন্তু নিজের উপার্জনের টাকা সব গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিতেন। পড়ার সময় নিজ হাতে ভাত রেঁধে কেবলমাত্র নুন টাকনা দিয়ে ঐ ভাত খেতেন দিনে ভাইদের সঙ্গে। রাত্রে খেতেন একটু অম্বল দিয়ে ভাত।

ডি. গুপ্তের বাড়িতে অত সব চাকর কিন্তু ছেলেরা কাঁধে করে কুঁজোতে (অভিনয় করিয়া) এমন করে জল তোলে তিনতলায়। নিজের ঘর নিজে ঝাড়ু দেয়।

তাই যখন ভাল দিন থাকে গৃহীদের তখন provision (সঞ্চয়) করতে হয় — provision against rainy days (দুর্দিনের জন্য)। যাদের একা শরীর — সন্ন্যাস জীবন তাদের 'যা হয় কপালে' বলা চলে। কিন্তু যাদের ছেলেপুলে হয়েছে তাদের অবশ্য সঞ্চয় করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, পাখী আর দরবেশ সঞ্চয় করবে না। কিন্তু পাখীর ছানা হলে তারও সঞ্চয় করতে হয়। অতএব হেঙ্গাম গৃহস্থাশ্রমে। তাই ঠাকুর ছোকরাদের বলতেন, 'বিয়ে করিস নি'। ঠাকুরের আর একটি মহাবাক্য এই — 'লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার চাইতে কৃপণ হওয়া ভাল'।

অন্তেবাসী কথাও শুনিতেছেন আর 'কথামৃতে'র ভাল ফরমাগুলিও বাছিয়া লইতেছেন। শ্রীম তাহাকে ডাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "শুনছেন জগবন্ধুবাবু, ঠাকুর বলতেন, লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার চাইতে কৃপণ ভাল। টাকাকড়ি খুব cautiously (সাবধানে) ব্যয় করতে হয়।"

বিনয় ও লক্ষ্মণ চলিয়া গেলেন। মণি অব্যবস্থিত চিত্ত, উঠিয়া বারান্দায় গেলেন। মণির অমিতব্যয়িতার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — হাতে পড়লেই টাকা উড়োয়। অভ্যাস ভাল না। বিচারহীন। দেখুন না কেমন লোক। তার বার বছরের ছেলেকে মানুষ করছে তার শালা। সমস্ত পরিবারই শালার কাছে। ছেলেকে বুঝি মামা একদিন কি বলেছে তিরস্কার করে। সে কথা আবার কানে গিয়েছে। বলছিল, পরিবারদের নিয়ে আসবে। তারই দাঁড়াবার স্থান নাই। মাথার এই অবস্থা। ওদের আনলে রক্ষে আছে? আমরা তাই বললাম, ওরা ওখানে থাক্। এখন আনা উচিত নয়। এনে তাদেরও মহাবিপদে ফেলবে। আত্মীয়কুটুম্ব কেন? না, বিপদে সহায় হবে তারা।

বিপদে পড়লে মনে হয়, এরা হয়তো আমায় সাহায্য করবে। অন্য সময় মনে হয়, এরা সামান্য লোক, কি উপকার করতে পারে। 'Hope against hope' (নিরাশায় আশা)।

আপনারা এর একটা কর্ম খুঁজে দিন। কর্মে থাকলে মনটা বসবে। মণিবাবুর ভার আপনার উপর রইল। ওকে নাওয়ান খাওয়ান সব দেখবেন। বিপদে পড়ে মাথাটা বিগড়ে গেছে। ভক্তরা যত্ন করলে ভাল হয়ে যাবে।

আপনারা যে রেঁধে খাচ্ছেন এ বেশ। স্বপাক খুব ভাল। ডাল ভাত হলেই হলো। বিদ্যাসাগর মশায়ের নাতি পরেশবাবু বললেন, সাঁওতালরা শুধু ভাতও খেতে পায় না। তাই ডাল ভাত কি কম! হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়। হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলেন। বন্ধুরা বললেন, চলবে কি করে? উনি উত্তর করলেন, আমি ব্রাহ্মণ তিন মুঠো চাল তিন বাড়ি থেকে ভিক্ষে করে আনবো। তাই ফুটিয়ে নুন দিয়ে খাব। তবুও অন্যের গোলামী আর করবো না।

এখন গ্রীষ্মের ছুটি। আপনারা এই দিক্‌টাকে বেশ একটা আশ্রমের মত করে নিন্। এই ঘরেই রাঁধতে পারেন।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে আজ রাত্রিতে উৎসব। বেলুড় মঠের সাধুরা সেখানে ভোজন করিবেন। মর্টন স্কুলেও নিমন্ত্রণ। শ্রীম নিজে

যাইতে পারিবেন না — ভক্তদের পাঠাইতেছেন। অন্তেবাসীকে বলিয়া দিলেন, আপনারা এই কথা কয়টা শুনুন। প্রথম, সতীশবাবুকে বলবেন, আমার শরীর weak (দুর্বল) ; তাই এই crowd-এ (ভীড়ে) যাওয়া খুব কষ্টকর। দ্বিতীয়, তাই আমাদের পাঠিয়েছেন। তৃতীয়, এখানে যাঁরা সর্বদা আসেন তাঁদের সকলকে বলে নিয়ে যান। চতুর্থ, সতীশবাবুকে বলে ঠাকুরের গলার একটি মালা আনবেন আর সামান্য একটু প্রসাদ। পঞ্চম, অগত্যা একটি unused (অব্যবহৃত) মালা আনবেন। ষষ্ঠ, আর ওকে (শ্রীম-র দ্বিতীয় পৌত্র অজয়কে) সঙ্গে নেবেন। বলুন তো কি কি বললাম? অন্তেবাসী পুনরায় এই ছয় দফা আদেশ আবৃত্তি করিলেন।

বিনয়, মনোরঞ্জন, অজয়, গদাধর, জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীম-র হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সুবিস্তৃত ছাদে বিরাট আয়োজন। বেলুড় মঠের শতাধিক সাধু আসিয়াছেন। স্বামী ধীরানন্দের সুব্যবস্থায় সমগ্র কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। ভক্ত সতীশ মুখার্জীর আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধায়, আর অত সাধু ভক্তের সমাগমে ছাদটি যেন মহাতীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। তার উপর প্রসাদের অতি প্রচুর আয়োজন। মহানন্দে সকলে প্রসাদ পাইলেন। রাত্রি বারটায় ভক্তগণ মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীম তাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। ভক্তরা শ্রীম-র হাতে একটি সুগন্ধি পুষ্পের গড়ের মালা ও প্রসাদ দিলেন। শ্রীম যুক্ত করে মস্তকে ধারণ করিয়া রহিলেন। তারপর উৎসবের সমুদয় বিবরণ লইলেন। কি কি ভোগ হইয়াছিল, সাধুরা কে কে আসিয়াছিলেন, কে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন ইত্যাদি। শ্রীম উৎসবানন্দে ভরপুর।

ভক্তগণ সর্বশেষ একটি দুঃসংবাদও পরিবেশন করিলেন। তাঁহারা ঐ উৎসবক্ষেত্রেই শুনিয়া আসিয়াছেন, আশুবাবু শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীম আর্তনাদের স্বরে বলিলেন, "বলেন কি, কোথায় এ সর্বনাশ হলো? ঈশ্বর তাঁর এত সুবিধা করে দিয়েছেন। চিফ্‌জাষ্টিস্ হয়ে অবসর নিলেন। তবুও এ বুড়ো বয়সে একটা মামলা নিয়ে গিয়ে এ সর্বনাশ হলো। আহা বেনালে এই মহাপ্রাণটা গেল।"

শ্রীম-র উৎসবানন্দ হঠাৎ কিছুকালের জন্য শোকসাগরে নিমজ্জিত হইল, বাংলার এই উজ্জ্বলমণির অন্তর্ধানে। আকাশ ভরা চাঁদের আলো বুঝি অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। শ্রীম ছাদে একাকী দ্রুতপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

২

মর্টন স্কুল। সকাল আটটা। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় পূর্বপ্রান্তে চেয়ারে পশ্চিমাস্য বসিয়াছেন। এখানে পালি ক্লাশ হয়। শ্রীম-র পাশে বেঞ্চেতে বসা জগবন্ধু, বিনয় ও মণি মান্না। আশুতোষ মুখার্জীর শরীর ত্যাগের কথা হইতেছে। গত রাত্রিতে এই দুঃসংবাদ শোনা অবধি শ্রীম ঐ কথা ভাবিতেছেন আর শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভগবান অত সুবিধা করে দিলেন তবুও ঐ করলেন। কত সুবিধা ভেবে দেখ না। ছেলেরা লায়েক। মাসে দু তিন হাজার টাকা আয়ের ব্যবস্থা আছে। তবুও টাকা। অনেক কষ্টে করেছেন কিনা টাকা। তাই টাকা দেখলে আর ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। Contentment (সন্তোষ) বড়ই দরকার। আশুবাবুর গুরু ছিল না? না, থাকলে তিনিই ভেদ বলে দিতেন। এদিককার এসব যে কিছুই না, তা বলে দেন গুরু। গীতায়ও আছে, ‘নাত্মানমবসাদয়েৎ।’

আহা, দেশের কি লোকসান হল! কত গুণ, কত শক্তি, কত বিদ্যা, কত বুদ্ধি। মানই বা কত — হাইকোর্টের চিফ-জাষ্টিস হয়েছিলেন কিনা। ইউনিভারসিটির তো প্রাণ বল্লেই হয়, জন্মদাতা। আবার হৃদয়ও খুব। শুনতে পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে যারা কাজ করতো তাদের সকলের ঘরের খবর সব রাখতেন। গরীব হলে গোপনে সাহায্য করতেন লোক পাঠিয়ে। বড় ক্ষতি হল দেশের।

বেদে আছে নারদের কথা। যত রকম বিদ্যা আছে ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বে সুপণ্ডিত নারদ। আজকালের ভাষায় বলতে গেলে, যত রকম 'logy' অর্থাৎ বিদ্যা আছে সবেতে মাষ্টার নারদ। কিন্তু চিত্তে শান্তি নাই। তাই ঋষি সনৎকুমারের কাছে গেলেন শান্তির জন্য। ঋষি বললেন, বাবা সর্ববিদ্যা লাভ করেছো বটে, কিন্তু তাদের

মর্মজ্ঞান হয় নাই, মূলতত্ত্বের বোধ হয় নাই। শব্দজ্ঞান লাভ করেছো মাত্র। সকল বিদ্যার মূলে ব্রহ্মবিদ্যা। এটি লাভ হলেই শান্তি। তারপর ঋষির কৃপায় নারদের শান্তি লাভ হয় ব্রহ্মজ্ঞানে।

এমনি কাণ্ড। গুরু ভিন্ন সংসারে আর আশ্রয় নাই। গুরুই বলে দেন ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য। তাই তাঁকে ধরে সংসার করলে আর দুঃখ নাই। 'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে'। আমরা ধন্য। অল্প বয়সেই গুরু লাভ হয়েছিল। গুরুর ঋণ শোধ হয় না। অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরু। আমাদের গুণে কি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন? না, তা নয়! এ তাঁর অহেতুক কৃপা। দোষগুণ বিচার করলে কেউ দাঁড়াতে পারে তাঁর কাছে? তিনি ছিলেন 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'। তাঁর তুলনা তিনি নিজে।

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন ঠাকুরের আহার হয়েছে — থালাতে কিছু ভাত ছিল। আমায় বললেন, কুকুরকে দিয়ে এসো এগুলি। আমি থালা নিয়ে যাচ্ছি আর ভাবছি, এ অমৃত কুকুর একা কেন খাবে? তাই আমিও খেলাম। তারপর থালাটি মাজছি গোল বারান্দার কাছে। ঠাকুর দেখে বললেন, বেশ বেশ। এ খুব ভাল। সব রকম অভ্যাস রাখতে হয়। রাঁধা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘরদোর ঝাড়ু দেওয়া, — এসব জেনে রাখতে হয়। শরীর ধারণের জন্য যা যা দরকার এ সবই জানা উচিত। কখন কোথায় কি অবস্থায় থাকতে হয়। মনে কর বিদেশে রয়েছো। তখন কে রেঁধে দেবে? শিখে রাখা খুব ভাল। এসব বিষয়ে যে পরাধীন তার ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

আহা, কি সব কথা! গুরু ছাড়া কে বলে দিবেন এই মুক্তির সন্ধান। মুক্তি মানে সর্ব বিষয়ে মুক্তি। কেবল অবিদ্যার পাশ থেকে মুক্তি নয়। Preliminary (প্রাথমিক) মুক্তি এই সব। দেহ ধারণের জন্য অপরের সাহায্য না নেওয়া। নিতে হলেও যত কমে হয়। সন্ন্যাসী তো নিজের কাজ নিজে করবেই। গৃহাশ্রমে যারা আছে তারাও নিজের কাজ নিজে করবে। সর্ব বিষয়ে independent (স্বাধীন)। কেবল ঈশ্বরে dependent (নির্ভরশীল)। এ ব্যবস্থা যারা

ঈশ্বরের আনন্দ পেতে চায়, শান্তি চায় কেবল তাদের জন্য। যারা সংসারের আনন্দ চায় তাদের জন্য নয়।

কিসে ভক্তরা সর্ব বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, সর্বদা ঠাকুর সেই চিন্তা করতেন। আর সেই শিক্ষা দিতেন। যারা যেতো তাঁর কাছে অন্তরঙ্গরা তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা দিতেন। সকলের এক নিয়ম খাটে না। কিন্তু দেহধারণ সম্বন্ধে সকলের জন্যই এই ব্যবস্থা — নিজের কাজ নিজে করা।

এদিকে তো বললেন, 'ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য'। কিন্তু ব্যবহারিক বিষয়ে কি লক্ষ্য দেখ না। যতক্ষণ দেহত্যাগ না হচ্ছে ততক্ষণ এসব লোক-ব্যবহার মিথ্যা বললে চলবে কি করে? শাস্ত্র গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে, সংসার মিথ্যা মনে মনে জেনে, এসব করা 'অনপেক্ষ' ও 'দক্ষ' হয়ে। দৃষ্টি থাকবে কেবল সত্যে, ঈশ্বরে। তাঁতে মন আগে রেখে তারপর সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হও। তাঁকে আগে আপনার করা চাই।

গুরুর অধীন হয়ে সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হলে শীঘ্র হয়ে যায়। ব্যবহারিক বিষয়ে যে মন দক্ষ, সংস্কৃত, এই মনই পরে ঈশ্বরে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। তাইতো বলতেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। অনলস অতন্দ্রিত মনের দরকার।

কত ভাবনা করতেন ঠাকুর ভক্তদের তৈরী করবার জন্য। অবিদ্যার force-এর (শক্তির) ভিতর থেকে কি করে বিদ্যার force এর (শক্তির) 'আণ্ডারে' আসতে পারে ভক্তগণ তার জন্য সর্বদা ভাবনা ছিল ঠাকুরের।

একবার একজন ভক্তকে বললেন, তুমি এখানকার জন্য একটা ছোট সতরঞ্চি এনো। জানেন ভক্ত অপরকে দিয়ে কেনাবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, নিজে গিয়ে কিনবে। কেন এরূপ বললেন? ভক্তদের কল্যাণের জন্য। তাঁর কি দরকার ও জিনিযের? কত লোক কত জিনিষ দিতে চাইতো কিন্তু তিনি গ্রহণ করতেন না। ভবিষ্যতে ভক্তদের চিন্তার খোরাক মিলবে এই ঘটনাটিতে। ভাববে আমরা তাঁর যৎকিঞ্চিৎ সেবার অধিকার পেয়েছিলাম। ভক্তরা এখন জানে না তিনি কে, কার সেবা করছি।

ঠাকুর সব রকম শিক্ষা দিতেন, ঈশ্বরীয় আবার সাংসারিক সর্ব বিষয়ে। একদিন পিদিমের শলতেটা উসকে দিয়েছি। দেখে ঠাকুর বললেন, আগুনে হাতটা (ডান হাতের বৃদ্ধ ও তর্জনী অঙ্গুলী কয়েক বার আগুনের উপর সংযোগ ও বিয়োগ করিয়া) এমন এমন করে নাও। তাহলে হাত শুদ্ধ হয়ে গেল।

সদ্‌গুরু লাভ হলে মানুষ নিশ্চিন্ত। তিনি সব করিয়ে নেন। ঈশ্বরই গুরু। আবার তিনিই অবতার হয়ে আসেন। এসে সব শিক্ষা দেন। ঈশ্বর দর্শনের পর যদি কেউ আদেশ পান তবে তিনিও গুরুর কাজ করতে পারেন। ঠাকুর বলতেন, যে কাশী দর্শন করেছে সে-ই কেবল কাশীর সংবাদ বলতে পারে।

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দার পূর্বপ্রান্তে উপবিষ্ট। সকালেও এইখানেই ঈশ্বরীয় কথা হইয়াছিল। দ্বিতলটি ভক্তরা একটি আশ্রমের মত করিয়াছেন। সব জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন। তাই শ্রীম বেশীর ভাগ সময় এইখানেই থাকেন। আরামবাগের একজন ভক্ত আসিয়াছেন। বড় অমূল্য, জগবন্ধু, গদাধর, শ্রীম-র পৌত্র অরুণ ও অজয় প্রভৃতিও শ্রীম-র কাছে বসিয়া আছেন। অজয় গতকাল ভক্তদের সহিত বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের উৎসবে গিয়াছিল। বয়সে কিশোর।

শ্রীম (অজয়ের প্রতি) — কাল তোমরা সাধুদের নমস্কার করেছিলে তো? সতীশবাবুকেও করেছিলে?

অজয় — আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু সকলের পায়ে হাত দিয়ে করা হয় নাই।

শ্রীম — জোড় হাতে করেছিলে তো? তা হলেই হলো। অত লোককে এক সঙ্গে একবার নমস্কার করলেও হয়।

নমস্কার করা কেন? না, ভিতরে ভগবান আছেন কিনা! তাই তাঁকে নমস্কার করা। এতেও পূজা হয় তাঁর। গীতায় আছে, 'নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা' (গীতা ৯/১৪)। বেদেও আছে, ঋষিরা বলেছেন, 'যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ'। (শ্বেতা ২/৫)

একদিন একটি ছোকরা ভক্তকে দেখে ঠাকুর বললেন, তোকে

দেখে পুজো করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফুল নেই, থাকলে তোকে পুজো করতাম। বলেছিলেন, আবার মনেও পূজা হয়। সর্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করছেন কি না ঠাকুর — বেদের সত্য ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’। বালক শুদ্ধাত্মা। তাতে বেশী প্রকাশ ব্রহ্ম নারায়ণ। তাই ঐ কথা বললেন। এতে ঐ ভক্তটিরও নিজের উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস বাড়বে। মনে হবে, আমার হৃদয়ে ভগবান নিবাস করছেন। তাঁকেই ঠাকুর পুজো করতে চাইলেন। এই শ্রদ্ধা না থাকলে, নিজের উপর নিজের বিশ্বাস না থাকলে সব পণ্ড। হাজার গুণও নিষ্ফল হয়। ঠাকুরের এই কথায়, তখনকার ও ভবিষ্যতের ভক্তগণ শিখবে মানুষেও ভগবানের পূজা হয়। যদি মাটির, কাঠের, পাথরের, পিতলের কিংবা সোনা-রূপোর প্রতিমাতে ভগবানের পুজো হতে পারে তবে জীবন্ত মানুষ প্রতিমাতে কেন হবে না? তাতে আবার নিষ্পাপ শুদ্ধাত্মা।

ঠাকুর বলতেন, মনে মনে পুজো করা আরও ভাল। সে পুজো হতে পারে একটু অগ্রসর হলে, সাধন পথে। প্রথমে বাহ্য পুজোর দরকার। এতেও আবার বিপদ আছে, এই বাহ্য পুজোর। কর্মকর্তার অভিমান বাড়তে পারে। তাই যা করা অন্তরে তাঁর শরণাগত হয়ে করলে এ সব দোষ হয় না।

গত রাত্রিতে শ্রীম আশুতোষ মুখার্জীর শরীরত্যাগের সংবাদ পাইয়াছেন। তদবধি মাঝে মাঝে আনমনা, কি ভাবেন। যেন মর্মাহত। কখনও আশু প্রতিভার দুই একটি গুণের উল্লেখ করেন। আজ প্রভাতে সংবাদপত্র দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই বড় জিতেন একখানা ‘ইংলিশম্যান’ ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্রের হাতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। একজন ভক্ত পড়িয়া শুনাইতেছেন। সম্পাদক আশুবাবুর সর্বতোমুখী প্রতিভার অতিশয় সুখ্যাতি করিয়াছেন। আশুবাবুকে ‘বেঙ্গল টাইটার’ বলিয়াছেন একস্থলে। শ্রীম-র উহা ভাল লাগে নাই। বললেন, “এটা আমাদের ভাল লাগে নাই। ‘টাইগার’ বলার চাইতে ‘লায়ন’ বলা ভাল।” মাঝে মাঝে আশুবাবুর গুণকীর্তন করিতেছেন আর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, “আহা, কি জীবনটা বেনালে গেল। কত বড় প্রতিভা, কত মূল্যবান জীবন।”

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মহামায়া সব ভুলিয়ে দেন। তাঁর সঙ্গে চালাকি চলে না। তাই ঠাকুর স্বয়ং ঈশ্বরাবতার হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করতেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না মা!' চোখের সামনে দেখতেন কিনা কি কাণ্ডটা চলছে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহামায়ার। তাই লোকশিক্ষার জন্য ঐ প্রার্থনা করতেন।

যে যত ঈশ্বরের নিকটে সেই তত বেশী দেখতে পায় মায়ার এই তাজ্জব কাণ্ড। সব ভেলকী লাগিয়ে দেন। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে বোধ জন্মিয়ে দেন। কি ক'রে মানুষের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি ঠিক থাকতে পারে? সব ওলট পালট করে দেন। তাই সর্বদা শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন। গীতায়ও তাই আছে। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'। প্রার্থনা করলে মা প্রসন্না হন। তাই সর্বদা প্রার্থনা করা বৈ আমাদের অন্য উপায় নেই।

অনন্ত কাণ্ড মহামায়ার। মানুষের বুদ্ধি যত বড়ই হোক — অতি ক্ষুদ্র। এই আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন না আপনারা কি অবাক কাণ্ড চলছে। এই অনন্ত তারাগুলির একটারও খবর মানুষ আজ পর্যন্ত করতে পারছে কৈ। (মোহনের প্রতি) শুনেছি টেলিস্কোপে আজকাল তারার ফটোগ্রাফ নেওয়া হচ্ছে। আমার উহা দেখতে ইচ্ছা হয়। শুনেছি সেন্টজেভিয়ারস্ কলেজে ফটো নেওয়া হয়। যান না আপনারা একদিন। দেখে এসে আমাদের কাছে গল্প করবেন। এসব দেখলে ঈশ্বর কত বড় তার একটা আভাস পাওয়া যাবে। তাতে শীঘ্র হয়ে যায় কাজ। বিশ্বাস হলেই সব হ'ল।

এলে গেলে মানুষের কুটুম্ব। আসা যাওয়া করলে আলাপ হয়। মিশনারীরা খুব ভাল লোক। ললিত মহারাজ বিশপ কলেজে যান। ওঁরাও আসেন গদাধর আশ্রমে। ভারি সুন্দর ব্যবহার তাঁদের। আমরা কখনও রঙ্গ করতাম তাঁদের সঙ্গে। 'আসুন, বসুন' বাংলায় বলে? যান একবার দেখে আসুন। আমার খুব ইচ্ছা ঐ ফটো দেখতে।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। শ্রীম ঠনঠনিয়ায় মা কালীর সম্মুখে বীরাসনে যুক্ত করে বসিয়া আছেন, ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম-র দুই পাশে জগবন্ধু, বড় অমূল্য, গদাধর ও আরামবাগের ভক্ত।

এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের ছাদে বসিয়াছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। বড় জিতেন, বিনয়, মনোরঞ্জন, ডাক্তার বক্সী, জগবন্ধু প্রভৃতি নিত্যকার ভক্তগণ শ্রীম-র সামনে তিনদিকে বসিয়াছেন বেঞ্চেতে। শ্রীম পুনরায় আশুবাবুর গুণকীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অমূল্য জীবনটা গেল। গুরু থাকলে বাধা দিতেন ঐ কাজ নিতে। বলতেন, তোমার এখন আর এইসব কাজ সাজে না। এখন ভগবানের নাম কর। আর করতে হয় নিষ্কাম কর্ম কর খালি। গুরু আমাদিগকে বলে দিছলেন, বাবা, তোমরা এখানকার ভোগ করতে আস নাই। তোমরা ব্রহ্মানন্দের অধিকারী। সেইদিকে লক্ষ্য রাখ। আর জীবনধারণের জন্য ডাল ভাতের ব্যবস্থা কর। ব্যস্। তারপর সৎসঙ্গ কর, ঈশ্বরের চিন্তা কর। এইটেই হলো ভারতীয় সংস্কৃতি — ঋষিজীবন। অত টাকা-কড়ির দরকার কি? ওসব করবে অন্যলোক। তাদের থাক্ আলাদা। একদিন নরেন্দ্র এসেছে, মাথায় বাঁকা টেরি। ঠাকুর আদর করে কাছে ডেকে নিয়ে মাথায় হাত বোলানোর ছলে ঐ টেরি ভেঙ্গে দিলেন। বললেন, বাবা তোমরা মায়ের লোক। তোমাদের অন্য কাজ। এসব তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের দেখে লোক শিক্ষা করবে। ধনজন মনপ্রাণ সব দিয়ে তোমরা ঈশ্বরকে ভালবাস।

সদ্গুরু লাভ হলে বেঁচে গেল। নইলে কর্ম বেড়ে যায়। তাই জন্মমরণ বেড়ে যায়। গুরুকৃপায় হুঁশ কতকটা থাকে। তাও আবার এক একবার আসে যায়! সন্ধ্যার সময়, দেখুন না, হঠাৎ চলে গেলাম ঠনঠনে মায়ের কাছে। কেমন সবেতে একটা বৈরাগ্য হয়ে গেল। আবার যা তাই। একটা ঢিল মারলো। খানিকটা জল দেখা গেল। আবার যে কে সেই। নাচতে নাচতে পানায় এসে সব ঢেকে দিল। লোক দেখছে মানুষ, সব অনিত্য। চোখের সামনে সব মরছে। তখন বাড়িঘর সব পড়ে রইল। তবুও চৈতন্য হয় না। তপ্ত খোলাতে জলবিন্দুবৎ একটু চৈতন্য হয়েই অমনি আবার ঢেকে গেল। যখন পাঁঠা বলি হয় তখন আর্তনাদে অপর পাঁঠাগুলিও একটু চেয়ে দেখে আবার ঘাস খাচ্ছে, সব ভুলে গেল। মানুষেরও এই অবস্থা। কি

করবে মানুষ! মহামায়ার হাতে সব পুতুল। তাই ঠাকুর শিখিয়েছিলেন, ‘তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না মা।’ ‘ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।’ (গীতা ১৮/৬১)।

বড় জিতেন — আপনাদের ছুঁতে পারে না! মায়ের কোলে রয়েছেন।

শ্রীম — না। সবাইকে ভুলায়। তার সঙ্গে চালাকি চলে না। দেখছেন না, ঠাকুর নিজে বলছেন, ভুলিও না মা ভুলিও না। ক্রাইষ্টও বলেছিলেন, 'And lead us not into temptation,' (St. Matthew 6:13 and St. Luke 11:4) এর মানেও তাই — ভুলিও না পিতঃ আমাদিগকে ভুলিও না। ঋষিরাও সর্বদা প্রার্থনা করছেন, ‘রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।’ এই সবে বুঝা যাচ্ছে সবাইকে ভুলায়। হাঁ, তবে তিনি নিজে যাকে ধরে রাখেন তার কথা ভিন্ন। যেমন ঠাকুর। তিনি বলতেন, মা যাকে ধরে থাকেন তার বেচালে পা পড়ে না।

শরীর ধারণ করলে চব্বিশ ঘন্টা এই ভেল্কীর ভিতর থাকতে হয়। তাই চব্বিশ ঘন্টা প্রার্থনা দরকার।

৩

এখন অপরাহ্ন সাতটা। গ্রীষ্মকাল। ২৭শে মে, ১৯২৪ খৃঃ। শ্রীম ঠনঠনের মন্দিরে মা কালীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। পাশে জগবন্ধু, অক্ষয়, পাটনার একটি ছেলে, পরে মনোরঞ্জন। অক্ষয়ের সঙ্গে দৈবাৎ রাস্তায় দেখা হয়। কিছুকাল শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। এবার মায়ের চরণামৃত লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর শিব-মন্দিরে প্রণাম করিয়া ফিরিতেছেন। সঙ্গে ভক্তগণ।

রাত্রি সাড়ে আটটা। মর্টন স্কুল, দ্বিতলের গৃহ। মেঝেতে মাদুর পাতা। শ্রীম আসিয়া মাদুরে বসিলেন পূর্বাস্য। তিনদিকে ভক্তগণ বসিয়াছেন — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, শুকলাল, অক্ষয়, বলাই, মণি, জগবন্ধু, বিনয় প্রভৃতি। বিক্রমপুরের একজন ভক্ত আসিয়াছেন। একটু পর বিনয় প্রণাম করিয়া উঠিলেন। তিনি বাড়িতে যাইতেছেন

গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। জগবন্ধু সঙ্গে গেলেন। কিছুদূর তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া আসিলেন। এতক্ষণ ঈশ্বরীয় কথা হইতেছিল। আশুবাবুর শরীর ত্যাগের কথাও হইল। এখন শ্রীম নিজে গান গাহিতেছেন। স্বর বেশ মধুর — আশাবরী রাগিনী।

গান। প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান্, তু দেওয়ান্, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটি, এক লেঙ্গোটি তেরে পাস্ ম্যায় পায়া।
ভকতি ভাব দে আরোগ, নাম তেরা গায়া॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ;
অবকি বার দে দিদার মেহর কর ফকীরাঁ।।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া।
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া।।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই গানটি নরেন্দ্র গেয়েছিলেন কাশীপুরে। শুনে ঠাকুরের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। আহা, কি মিষ্টি গলা নরেন্দ্রের। ঠাকুরের গলাও মিষ্টি ছিল। এঁদের দুজনের গান শুনে অন্য গান আর ভাল লাগে না। যেমনি মিষ্টি তেমনি গুরুগম্ভীর, তেমনি তার আকর্ষণ। মনকে টেনে নিয়ে একবারে উপরে উঠিয়ে দেয়। সাপ যেমন সাপুড়ের বাঁশী শুনে ফণা তুলে স্থির হয়ে শুনে, তেমনি তাঁদের গান মনকে জাগিয়ে দিত, একাগ্র করে দিত। তারপরই একেবারে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করে দিত। এমন গান আর শোনা যায় না, আর শুনবো না। ঠাকুর শেষের দিকে আর গান গাইতে পারতেন না প্রায় একবছর। ভক্তরা গাইতেন আর নরেন্দ্র। নরেন্দ্রই বেশী গাইতেন। ঠাকুর শুনতেন। ঠাকুরের গলাতে শেষে ছিদ্র হয়ে গেল। একলা বাগানে পড়ে থাকতেন। দিনে কখনও কেউ কেউ যেতো। শেষের দিকে যারা সেবা করতো তারা থাকতো। ঠাকুরের গলা থেকে ডাবর ডাবর রক্ত পড়তো — heart-এর (হৃদয়ের) সব রক্ত। শরীরটা একেবারে skeleton (কঙ্কালসার) হয়ে গিছলো। এই কষ্ট নিজে ভোগ করে দেখিয়ে গেলেন humanity-কে (মানব সমাজকে), দেহধারণ করলে দুঃখকষ্ট হবেই

হবে — নিষ্কৃতি নাই।

ঠাকুরের শরীরের অত কষ্ট কিন্তু এক সেকেণ্ডের জন্যও ভোলেন নাই ঈশ্বরকে। কত ভালবাসা হলে এটি হয়। যেই একটা কথা হ'ল, কি গান হ'ল — যে কোনও ঈশ্বরীয় বিষয় হউক না অমনি দপ্ করে যেন জ্বলে উঠতো ঈশ্বরীয় ভাব। যেন দেশলাই, একটু ঘষা পেলেই জ্বলে ওঠে। তখন মন দেহেতে নেই, ঈশ্বরে নিমগ্ন। 'মা, মা' বলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়তেন। ঈশ্বর যখন মানুষ-শরীর নিয়ে আসেন কেবল তখনই এই অবস্থা সম্ভব। অপরের পক্ষে অসম্ভব। মহামায়া সর্বদা ভুলিয়ে দেন। কেবল মায়াধীশের পক্ষেই সম্ভব মায়াতে থেকেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া। যেমন সাপ, মুখে বিষ কিন্তু নিজে নির্লেপ, বিষমুক্ত।

ভক্তরা মহাপুরুষরা দুঃখে পড়ে কত গান গেয়েছেন। 'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে তরী', 'মাতা তুমি থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি' ইত্যাদি। আবার ঐ বিপদে থেকেই গানে হুঁশিয়ার বাণী শুনাচ্ছেন — 'দুর্গা নাম ভুলো না, ভুলো না ভুলো না ভুলোনা রে মন।'

বিপদে সব ভুলিয়ে দেয়। দেহ-জ্ঞান যেতে চায় না। তাই যেন ভক্তরা প্রাণভরে appeal (প্রার্থনা) করছেন মনকে, আর humanity in infirmity-কে (বিপদগ্রস্ত মানব সমাজকে)। বললেন, ভগবানকে ভুলো না। প্রাণপণ করে তাঁকে ধরে থাক। তাঁকে ছেড়ে দিলে আর রক্ষা নাই। শরীরও যাবে মনও যাবে — সর্বনাশ। তাঁকে ধরে থাকলে মনটাকে অন্ততঃ বাঁচাতে পারবে। শরীরটা যায় যাক্। আর শরীর তো যাবেই একদিন। মন তাঁ'তে থাকলে শরীরের কষ্টও অত বোধ হয় না।

শ্রীম মত্ত হইয়া গাহিতেছেন, সঙ্গে ভক্তরা যোগদান করিলেন।

গান। শ্রীদুর্গানাম ভুলোনা ভুলোনা ভুলোনা ভুলোনা (রে মন)।
শ্রীদুর্গাস্মরণে সমুদ্রমন্থনে, বিষপানে বিশ্বনাথ ম'লনা॥
যদ্যপি কখন বিপদ ঘটে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিও সঙ্কটে
তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার, লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেলনা।।
বিভু নামে এক রাজার ছেলে, যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে,

আসিবার কালে সমুদ্রের জলে   ডুবেছিল তবু মরণ হ'ল না॥

গান থামিল। শ্রীম নীরব। পুনরায় কথাপ্রসঙ্গ চলিল।

শ্রীম (অক্ষয়ের প্রতি) — কোলাব্যাঙ কি পাকা কথাই বলেছে! — রাম, তুমি যখন মার তখন কাকে বলি রক্ষা কর। অপরের মারের সময় চেঁচাই, রাম রক্ষা কর, রাম রক্ষা কর বলে'।

সবই তিনি। আবার সবই তিনি করছেন। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হচ্ছে। চুপ করে সয়ে যাওয়াই ভাল। সওয়াও কি সহজ? তবে চেষ্টা করা। তার ইচ্ছা হলে সইবার শক্তিও এসে যায়।

একজন ভক্তের (শ্রীম-র) হাতে বিচ্ছুতে কামড়িয়েছিল। কি যন্ত্রণা! অসহ্য বেদনা! যেই ঠাকুরের অসুখের কথা মনে হ'ল — তাঁর অসহ্য যন্ত্রণার কথা, অমনি ম্যাজিকের মত instantaneously (তৎক্ষণাৎ) বিচ্ছুকামড়ের দারুণ বেদনা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

একজন ভক্ত (শ্রীম) দিনকয়েক মাত্র ঠাকুরের কাছে আনাগোনা করছে। একদিন সাহস করে ঠাকুরকে বললেন, এ সবই (সংসার) যখন অনিত্য তখন এগুলি (পরিবার) আর কি? এসবও মিথ্যা। আর নিজের শরীরটাও মিথ্যা। সংসার জ্বালায় জর্জরিত হয়ে ঠাকুরের কাছে গেছেন। ঠাকুর ভক্তের মনোভাব — শরীর ত্যাগ করার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তাঁকে অভয় দিলেন। বললেন, বালাই, কেন যাবে শরীর ত্যাগ করতে। হাজার গাঁটওয়ালা একটা দড়ি বাজীকর দশহাজার লোকের সামনে ফেলে দিল। কেউ একটাও গাঁট খুলতে পারল না। তখন বাজীকর এমনি এমনি (হাত নাড়িয়ে) করে সবগুলি গাঁট খুলে ফেললো। তাই বাইবেলে আছে, 'For with God nothing shall be impossible' (St. Luke - 1: 37). ভগবানের অসাধ্য কিছুই নাই।

তারপরই বললেন, তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে! ভাবনা কি? এর মানে, গুরু লাভ হলে সংসারের উত্তাল তরঙ্গ কিছুই করতে পারে না। গুরু রক্ষা করেন। নইলে তলিয়ে যায় অতলজলে। গুরু মানে ঈশ্বর।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন। ভক্তরা তাঁর কাছে গেছেন। বাড়ি ফিরতে চাইছেন। অমনি ঠাকুর বললেন, তুমি আজ থেকে যাও। যদি

বলা হতো বাড়িতে অসুখ বিসুখ, তিনি উত্তর করতেন, তাহ’লই বা। যদি তেমন বিপদ ঘটে পাড়ার লোক দেখবে।

এই কথা শুনে লোক বলবে, কি নিষ্ঠুর আচরণ! কিন্তু ঠাকুর এদিককারগুলি অত দেখতেন না। কিসে শেষের ভাল হবে, অনন্তকালের জন্য সুখী হবে তাই আগে দেখতেন। কিসে মৃত্যুকে জয় করতে পারে, কিসে অমৃতত্ব লাভ হয় তার ভাবনা আগে করতেন।

একবার একটি ভক্ত রাত্রি নটার পর রওনা হয়ে এলেন — কলকাতা যাবেন। ঘোর অন্ধকার। হেঁটে যেতে হবে সারা রাস্তা। ঠাকুর ভারি চিন্তিত হলেন। Next meeting-এ (এরপর দেখা হলে) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি সেদিন ভালয় ভালয় পৌঁছে ছিলে তো? আমার বড় চিন্তা হয়েছিল।’ ভক্তটি উত্তর করিলেন, ‘আজ্ঞে কোনও কষ্ট হয় নাই যেতে। তা হবে না? আপনার এখান থেকে যে গেছি। গেট থেকে বেরিয়েই দেখি একটা গাড়ী। ছ’ পয়সার সেয়ারে একেবারে নিয়ে গেল বিডন স্ট্রীট।’ ঠাকুর শুনে এক ধমক দিলেন। বললেন, ‘তোমার একি হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বর কি লাউ কুমড়ো ফল দেন? তিনি যে অমৃতত্ত্ব হাতে নিয়ে বসে আছেন ভক্তদের দেবেন বলে।’

গিরিশবাবুকেও এক ধমক দিছলেন। গিরিশবাবু বলেছিলেন কিনা, মশায় আপনার চরণামৃত খেয়ে আমার চাকর ভাল হয়ে গেল — ছ’দিনের জ্বর গেল। অমনি এক ধমক। বললেন, ছিঃ কি হীনবুদ্ধির কথা! অসুখ সারানর জন্য তিনি ঔষধ করেছেন, ডাক্তার কবরেজ করেছেন। তা দিয়ে সারাও। ঈশ্বরের কাছে চাইতে হয় কেবল অমৃতত্ত্ব।

তাঁর মহামায়া আমাদের কি দুরবস্থায় রেখেছেন দেখুন না! আমরা সংসারে কিভাবে রয়েছি! একটা জীব আর একটা জীবের মুখে। তবুও বুঝতে পারছে না নিজের এই সঙ্কটজনক অবস্থা। বেশ আনন্দ আহ্লাদ করছে এই মৃত্যুর করাল বদনে থেকে। একজন আর একজনকে খেতে যাচ্ছে। সেও যে অপরের মুখে এবং এই বিশ্ব

সংসার যে মৃত্যুর বিনাশের কবলে এটা বুঝতে দিচ্ছে না তাঁর মহামায়া। আশুবাবুর মৃত্যুতে কেবল এই ছবিটাই মনে উঠছে।

সব ভুলিয়ে দেন তিনি। তাঁর কৃপা হলে কতকটা রক্ষা। তাই দেবতারাও মহামায়াকে স্তব করছেন, 'মা তোমার মায়ায় বিশ্ব সম্মোহিত'। — 'সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ'। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এই precarious condition (দুরবস্থা)। তাই তারপরই বলছেন, 'ত্বং বৈপ্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ' (চন্ডী - দেবী মাহাত্ম্য ১১/৪)। অর্থাৎ তিনি প্রসন্না হলেই এই উৎকট মায়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে জীব। দেবতারাও সর্বদা প্রার্থনা করছেন, মা আমাদের রক্ষা কর এই ভ্রান্তির হাত থেকে।

পরদিন সকালে শ্রীম অন্তেবাসীকে একটা আম ও মধু খাইতে দিলেন। শ্রীম সকাল থেকেই সারাদিন সংবাদপত্রে আশুবাবুর জীবনচরিত পাঠ, আলোচনা ও চিন্তা করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্বে পৌনে সাতটায় ঠনঠনের কালীমাতাকে প্রণাম করিয়া ট্রামে উঠিলেন। অন্তেবাসীও উঠিলেন কিন্তু তাহাকে নামাইয়া দিলেন। শ্রীম একাকী ভবানীপুর যাইতেছেন। হরিশপার্কে শোকসভায় আশু-প্রতিভার গুণকীর্তন শুনিবেন। গদাধর আশ্রমে প্রথম উঠিলেন। তারপর হরিশপার্কের সভা হইতে আশুবাবুর বাড়ি হইয়া মর্টন স্কুলে ফিরিলেন রাত্রি সাড়ে দশটায়। ভক্তগণ — ছোট জিতেন, বলাই, ডাক্তার বক্সী, ছোট রমেশ, বড় জিতেন, মোটা সুধীর, রমণী, জগবন্ধু প্রভৃতি — দ্বিতলের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছেন। স্টুডেন্টস্ হোমের প্রীতিচৈতন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৮শে মে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল।
বুধবার। কৃষ্ণাদশমী।

ভূমিকা*

এবারের নৈবেদ্য চতুর্থ কুসুম-স্তবক। পঞ্চদশ কুসুম-স্তবকে গ্রথিত 'শ্রীম-দর্শন'-রূপ সম্পূর্ণ নৈবেদ্যটি।

পূর্ব তিনটি স্তবকের ন্যায় এবারের স্তবকও চার প্রকারের সুন্দর সুবাসিত প্রসূনে গ্রথিত।

প্রথম প্রসূনটি হইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মপরিবারের ঠাকুর মা স্বামীজী প্রভৃতির বাণী ও জীবনের সংস্পর্শ। দ্বিতীয় প্রসূন — উপনিষৎ ও গীতা, পুরাণ ও তন্ত্র, বাইবেল ও কোরাণ-শরিফ আদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণভাবসম্মত ব্যাখ্যা। 'কথামৃত'-কারের দ্বারা 'কথামৃতে'র ভাষ্য হইতেছে তৃতীয় প্রসূন। আর চতুর্থ প্রসূন — শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবচন ও কথোপকথন।

শ্রীভগবান বারে বারে জীবের সুখ-শান্তি বিধানের জন্য নর-কলেবরে অবতীর্ণ হন। আর কালোপযোগী শান্তি-সুখ-আনন্দ লাভের উপায় উদ্ভাবন করেন।

এবারের উপায় **শরণাগতি**। কারণ, বহু দ্রব্য ও পরিশ্রম-সাধ্য পূর্বের মত উপায় এ সময় অনুপযোগী। এখন মানুষের আয়ু কম, আবার অন্নগত প্রাণ, মন চঞ্চল এবং পার্থিব বিষয়ভোগে সন্নিবিষ্ট।

এ সময় তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বিধান দিয়াছেন 'ফিভার-মিক্‌শ্চারে'র — 'দশমূল পাচন' এখন অচল। সেই ফিভার-মিক্‌শ্চারই হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী — 'নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ, বালক যেমন মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। বলো প্রভো,

---

*এই ভূমিকাটি গ্রন্থকার স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দ্বারা রচিত 'শ্রীম-দর্শন' (চতুর্থ ভাগ) প্রথম সংস্করণে (জন্মাষ্টমী, ১৩৭৩ সাল, ১৯৬৬ খৃঃ) প্রকাশিত হয়।

আমি সাধনহীন, ভজনহীন, ভক্তিহীন, বিবেক-বৈরাগ্যহীন। তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দাও।'

বেদাদি সর্বশাস্ত্রের সার — **'জীবশিব'**। কোনও প্রকারে জীবের এই শিবত্ব স্থাপন করাই কার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে জীবের ভিতর হইতে এই শিবত্বকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন — 'মুঞ্জাদিবেষীকাং'।

যে সহজ উপায়ে শিবত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাই সকলের অবলম্বনীয় — নির্জনে গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন। তপস্যা বিনা শিবত্ব বিকশিত হয় না। তাই এবারের তপস্যা লোকালয়ে, হিমালয়ে নহে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে, দণ্ডকারণ্যে নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচেষ্টা, 'বনের বেদান্তকে ঘরে' আনা, তাই তপস্যার এই স্থান পরিবর্তন। **'বনের বেদান্তকে ঘরে'** আনিতে তিনি কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহার উদাহরণ তাঁহার রচিত কুসুমকুঞ্জের একটি সরস সুন্দর সুবাস কুসুম — শ্রীম-র দেবজীবন। 'শ্রীম-দর্শন' শ্রীম-র 'কথামৃতে'র নূতন ভাণ্ডার।

বর্তমান জগৎ জুড়িয়া জড়-সভ্যতার তাণ্ডব নৃত্যে বিভ্রান্তমনা অনীশ্বরবাদী জনগণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতি ঠিক সেইরূপ, যেরূপ ভগবদ্বিশ্বাসী ভক্তের প্রতি তাঁর প্রীতি।

প্রেমময় পিতার ন্যায় অনীশ্বরবাদী অশান্ত অবিনীত সন্তানকেও তিনি মধুর হিতোপদেশ দিতেছেন —

'এই সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে যদি শান্তি-সুখ-আনন্দের কোনও পথ দেখিতে না পাও, আর দিন দিন ঝলসিত হও, তখন কহিও — এই জগতের পেছনে যদি কেহ থাক তবে আমার সহায় হও। তিনি অবশ্য আসিবেন। তখন সুখ-শান্তি-আনন্দ লাভ করিবে।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও তাহার ভাষ্য-সন্তান 'শ্রীম-দর্শন' শ্রীরামকৃষ্ণের শান্তি-সুখ-আনন্দের উপায় ও বাণী বহন করে।

জীবের শিবত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টার সঙ্গে কি বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির কোন বিরোধ আছে? — মোটেই নয়! বরং একটি অন্যটির পরিপূরক।

বিজ্ঞান material truth (জড়-সত্য) লইয়া ব্যস্ত। আর জীবের শিবত্ব স্থাপন-প্রচেষ্টা ব্যস্ত spiritual truth (পারমার্থিক সত্য) লইয়া। Matter, mind আর spirit (জড়বস্তু, মন ও আত্মা) এই তিনটিই সত্য। একটি হইতে অপরটি অধিকতর সত্য। মূলে যদি বিরোধ না থাকে, তবে বহির্বিকাশে কেন বিরোধ থাকিবে?

ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ্‌গণ দেখিয়াছেন, একটি মানুষের ভিতর এই তিনটি সত্য নিহিত। একটি মানুষই প্রকারভেদে তিনটি শরীরে বিন্যস্ত — The material body, the mental body, the spiritual body — স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-শরীর।

প্রত্যেক মানুষ যদি চক্ষুর সম্মুখে এই তিনটি সত্য রাখিয়া চলে তাহা হইলে কোনও বিরোধ থাকে না। কিন্তু যদি এই তিনটি সত্যকে ভিন্ন এবং বিরুদ্ধ সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলেই যত বিরোধ, বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা জগতে উপস্থিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে এই তিনটি সত্যের সমন্বয় করিয়াছেন, যে প্রকার সকল ধর্মের সমন্বয় করিয়াছেন কঠোর সাধন দ্বারা — 'যত মত তত পথ' এই সনাতন মহা সত্য — 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' — আবিষ্কার করিয়া।

প্রাচীন ভারতে দেখা যায় এই তিনটি সত্যের সমন্বয় পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছিল। ভীষ্ম ও দ্রোণ, কর্ণ ও অর্জুন আদি বীরগণের জীবনে স্থূল সূক্ষ্ম কারণের সমন্বয় হইয়াছিল। তাঁহারা জড়বিদ্যায় যেমন ধুরন্ধর ছিলেন তেমনি ছিলেন অধ্যাত্ম বিদ্যায় বিশারদ — ব্রহ্মজ্ঞানী।

বর্তমান জগতে যদি এই দুটি গৃহীত হয় — matter, mind and soul — স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিনটিই পর পর সত্য — এই তিনটিই এক ব্রহ্মসত্যের নিম্নাঙ্গ সত্য, তাহা হইলে বর্তমান সময়ে মনুষ্য সমাজের বর্তমান অশান্তি ও পরস্পর অবিশ্বাস বিদূরিত হইয়া জগৎময় শান্তস্বরূপ ভগবানের একটি শান্তিময় রাজ্য বা সমাজ গঠিত হইতে পারে।

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে যেমন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানবিদ্গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন তেমনি জড় বিজ্ঞানবিদ্গণও স্থান পাইয়াছিলেন। যেমন ‘দৈবী মানুষ’ কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহপীযূষে ধন্য হইয়াছিলেন তেমনি ধন্য হইয়াছিলেন ভারতের জড় বিজ্ঞানের জনকশ্রেষ্ঠ আচার্য মহেন্দ্রনাথ সরকার।

আবার মনোরাজ্যের উপাসক মহামনীষী দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যসম্রাট মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও অদ্ভুতপ্রতিভাবান বিবেকানন্দও সমানভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবী সংস্পর্শে ধন্য।

দুরন্ত ক্যানসার রোগে আক্রান্ত, ঈশ্বরীয়ভাবে আবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেহজ্ঞান বিসর্জন দিয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চরমে আরোহণ করিয়া ক্রমাগত ছয় সাত ঘন্টা ব্যাপী ঈশ্বরীয় নামগুণকীর্তন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভে সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার প্রস্ফূটিত জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দর্শনে জড়বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পূজারী ডক্টর সরকার স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। ব্যথিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে উপহাস করিয়া বলিতেন, ‘কিগো, তোমার ‘সায়েন্সে’ বুঝি এ কথা নাই?’ জড়-বিজ্ঞানের উপাসক ডক্টর সরকার নির্বাক!

ভারতীয় বিজ্ঞানবিদ্গণ, মনীষীগণ এবং আধ্যাত্ম বিজ্ঞানবিদগণ যদি এই দৃষ্টি রাখিয়া একযোগে নব ভারত সংগঠনে ব্রতী হন তাহা হইলে এই তিনটি সত্যের সমাবেশে সুখ-শান্তি-আনন্দের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে, তাঁহাদের নিজ জীবনে এবং সমাজ-জীবনে।

আর জগতের অন্য দেশেও এই মহাসমন্বয়ের অমিয় বাণী বিতরণ করিয়া এক শান্তি সুখ ও আনন্দের নব জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসীমঠ)
ঋষিকেশ, হিমালয়।
শ্রাবণ পূর্ণিমা, ১৩৭৩

বিনীত
গ্রন্থকার

শ্রীম – দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(চতুর্থ ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চন্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চণ্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

পঞ্চম সংস্করণ
স্নানযাত্রা
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
(৭ই জুন, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬ / ৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(চতুর্থ ভাগ)

শ্রীম - দর্শন ❁ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ৪

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তাকে লিখিত শ্রীম-দর্শনের গ্রন্থকার স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর পত্র (মূল হিন্দী পত্রের বঙ্গানুবাদ)

শুভাশীর্বাদ

পরমকল্যানীয়া শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা,

দেবী, দেবার্চনার অর্ঘস্বরূপ আপনার কৃত 'শ্রীম-দর্শন'-এর (প্রথম ভাগ) হিন্দী অনুবাদ একাধারে অতি সুন্দর, সরল, সাবলীল, প্রাঞ্জল, ভাব-ব্যঞ্জক এবং মূল রচনার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ।

অনুবাদকার্য স্বভাবতঃই নীরস। কিন্তু গ্রন্থের মূল বিষয়-বস্তুর সহিত আপনার একাত্মতা-হেতু এই অনুবাদ অতিশয় সরস ও সুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে।

ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় বৈদান্তিক এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ অতি সুকঠিন কার্য।

'শ্রীম-দর্শন'-এর মূল বিষয়বস্তু ঃ সুখ-দুঃখময় এই সংসারে কি করিয়া বেদবর্ণিত দেব-জীবন লাভ সম্ভব, তাহারই পথ-নির্দেশ।

বেদ-মূর্তি যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষায় বর্তমান জড়-সভ্যতার যুগে আচার্য শ্রীম বনের বেদান্তকে ঘরে আনিয়া মূর্ত করিয়াছিলেন আপনার জীবনে — এই ঊনবিংশ-বিংশ শতকে, ঠিক যেরূপ মূর্ত হইয়াছিল বৈদিকযুগে - তপোবনে ঋষিগণের জীবনে।

'শ্রীম-দর্শন' মহর্ষি শ্রীম-র জীবনের একটি জীবন্ত আলেখ্য, আবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রকাশকও। বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত যুগে, শ্রীম কথিত এই প্রামাণিক মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের মনোমুগ্ধকর সজীব বিস্তৃত বিবরণ ও সটীক ভাষ্য।

আপনি এই পরম আকর্ষণীয় মহাগ্রন্থ (হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া) হিন্দী ভাষাভাষী ভক্তগণের কর-কমলে পরিবেশন করিয়া এক সুমহান জ্ঞান-যজ্ঞ সাধন করিয়াছেন।

দেবী, আপনার এই মহৎ প্রচেষ্টা দেখিয়া স্বতঃই মনে উদয় হইতেছে যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক বিনীত প্রার্থনা — তিনি তাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আপনার দ্বারা 'শ্রীম-দর্শন'-এর অবশিষ্ট সকল ভাগও এইরূপ সরল, সুমিষ্ট, হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ করাইয়া লউন।

ইহাদ্বারা আপনার জীবন হইবে অধিকতর ধন্য ও মধুময় এবং সমাজ-জীবন হইবে অধিকতর উন্নত ও দেবভাব-মন্ডিত। ইতি,

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ঋষিকেশ, হিমালয়। শুভানুধ্যায়ী
দুর্গা-নবরাত্রি, ১৯৬৫ (ইং)। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ
(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)
(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial
(৫) A Short Life of Sri "M"
(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)
(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
Sri Ma Trust
Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
R-899, New Rajendra Nagar
New Delhi -110060

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

সর্বস্ব ঈশ্বরে সমর্পণ দেবত্বের পূর্বাভাস ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৎসকে ধরে থাকলে গাভী আপনি আসে ১৯

তৃতীয় অধ্যায়

যে বিপদে পড়ে নাই সে শিশু ৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরে দোলযাত্রার দিনে শ্রীম ৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

গীতার বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ ৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

মঠ ভক্তদের 'বেঙ্গল ক্লাব' ৯৭

সপ্তম অধ্যায়

আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ১১৪

অষ্টম অধ্যায়

আমেরিকার ফক্স ভগিনীদের দৃষ্টিতে স্বামীজী ১৩৩

নবম অধ্যায়

জড়চেতনভেদ বিলুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে ১৫০

দশম অধ্যায়

চিত্রে কথামৃত ১৬৮

একাদশ অধ্যায়

ট্রামকারের ট্রলি ও শ্রীরামকৃষ্ণ ১৯০

দ্বাদশ অধ্যায়

মন-বিনাশে ব্রহ্মজ্ঞান ২০৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিশ্বাসে অর্ধজীবন্মুক্তি ২২২
চতুর্দশ অধ্যায়
সমাধি মানুষের সহজাবস্থা ২৪০
পঞ্চদশ অধ্যায়
দৈবী আচরণ ২৫৬
ষোড়শ অধ্যায়
সদ্ গুরু লাভ হলে নিশ্চিন্ত ২৭৪

* * *

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

জন্ম ১৮৫৩, মহাসমাধি ১৯২০

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' ' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)

(১৪ই জুলাই, ১৮৫৪ হইতে ৪ঠা জুন, ১৯৩২)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদপুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ (কালী মহারাজ)

জন্ম ১৮৬৬, মহাসমাধি ১৯৩৯

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা

(৩০শে নভেম্বর, ১৯১৫ হইতে ২৬শে মে, ২০০২)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ রচিত

‘শ্রীমদর্শন’ মহাগ্রন্থের প্রকাশিকা

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাজা মহারাজ)

জন্ম ১৮৬৩, মহাসমাধি ১৯২২

স্বামী বিবেকানন্দ (স্বামীজী)

জন্ম ১৮৬৩, মহাসমাধি ১৯০২

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত

রথযাত্রা, ৩১শে আষাঢ়, ১৪১৪ প্রকাশক

১৬ই জুলাই, ২০০৭